বিস্মৃতপ্রায় লেখক সঞ্জীবচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য

ডঃ নীরেন্দ্র হাজরা

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০৭৩

ভূমিকা

একালে রম্যরচনায় আসক্ত কোনো কোনো পাঠক বাংলা গবেষণাগ্রন্থের নাম শুনলে বিরস হয়ে পড়েন। তাঁদের ধারণা, যেসমস্ত ভীমকান্ত গ্রন্থে শুধু তথ্যের সমারোহ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, কোথাও তত্ত্ব নিয়ে বাদানুবাদ চলে এবং সমস্ত ব্যাপারটাই শুষ্ক কাষ্ঠ বুদ্ধির ব্যায়ামে পর্যবসিত হয়, তাকেই বাংলা সাহিত্যের গবেষণা বলে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। রম্যরচনাপ্রিয় সহজিয়া রসের পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, গবেষণাগ্রন্থ তাঁদের জন্য নয়। তত্ত্বানুসন্ধান সিদ্ধান্ত পরিস্থাপনা যে-কোনো গবেষণার উদ্দেশ্য, তা সাহিত্যিকই হোক, আর বিজ্ঞানই হোক। সমস্ত রচনাকর্মটি অবশ্য পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন; যুক্তিতর্কের নিশ্ছিদ্র ব্যূহসন্নিবেশ না থাকলে গবেষণা বিভীষিকায় পরিণত হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো কোনো গবেষণাগ্রন্থে তথ্য-তত্ত্ব-তর্কের অতিরিক্ত একটা স্বাদু উপভোগেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ডঃ শ্রীমান নীরেন্দু হাজরার পি-এইচ. ডি গবেষণালব্ধ 'সঞ্জীবচন্দ্র' গ্রন্থটি একাধারে তথ্যবহ এবং রসস্নিগ্ধ [illegible] পেরেছে [illegible] হিসেবে একথা আমি সানন্দে স্বীকার করি।

[illegible] দৈবী শক্তি থাকলেও বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে ঢিলেঢালা প্রকৃতির ছিলেন। কোনো কাজেই যেন তাঁর বিশেষ কোনো আসক্তি ছিল না। অথচ পরিশ্রমসাধ্য রচনা করেছেন, তথ্যবহ প্রবন্ধও লিখেছেন, দু'খানি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। অপরদিকে বাংলার কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজিতে যে গ্রন্থ লিখেছিলেন তার তথ্য ও ব্যাখ্যা একালেও বিশেষ প্রশংসার বিষয়। সর্বোপরি তাঁর ছিল শিশুর মতো সারল্য ও কৌতূহল, শিল্পীর মতো সৌন্দর্যপ্রীতি, মজলিসী ব্যক্তির মতো গল্প বলার দুর্লভ ক্ষমতা আর তার সঙ্গে সরস কৌতুক। জীবনকে ভালবাসা, "যে পথ দিয়া চলিয়া যাব' সবারে যাব তুষি"—এই ছিল তাঁর প্রকৃতি।

একধরণের অলস আত্মসন্তুষ্টি, বন্ধন-অসহিষ্ণু উদাসীনতা এবং যে-কোনো উপযোগবাদী ক্রিয়াকর্মে তাঁর কোনোপ্রকার আকর্ষণ ছিল না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে জীবিকার্জনের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন, তাতেও তাঁর ছিল প্রবল অনীহা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তাঁর প্রতিভা যতটা ধনী, ততটা গৃহিনী নয়। কথাটা খুবই সত্য। এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ মিল

ছিল। হয়তো অনুসন্ধান করলে চার্লস ল্যাম্বের সঙ্গেও তাঁর কিছু কিছু চরিত্রগত মিল পাওয়া যাবে। তিনি একটু সতর্ক হলে রবীন্দ্রনাথের আগেই বাংলা ছোটগল্পের জনকত্ব দাবি করতে পারতেন। 'জাল-প্রতাপচাঁদ' সম্বন্ধে তিনি আদালতের নথিপত্র ঘেঁটে যে-সমস্ত তথ্য হাতে পেয়েছিলেন তা আর একটু 'খেলিয়ে' লিখলে এক বিচিত্র চরিত্রের কাহিনী রচনা করতে পারতেন। 'লোটাস ইটারের' মতো তিনি ফুলের বাগান করেই অলস মুহূর্ত কাটিয়ে গেলেন, কনিষ্ঠের মতো প্রবল চরিত্র ও পৌরুষ তার বিধিলিপি নয়। শেষজীবনে অর্থাভাব ও অন্যান্য পারিবারিক অশান্তি তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু নয়ন থেকে স্বপ্ন হরণ করতে পারেনি বলে অনুমান করি।

শ্রীমান নীরেন্দু এই গ্রন্থটি রচনা করে বাংলা সাহিত্যের একটি মহৎ উপকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর কোনো লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের সম্বন্ধে ছোট বড়ো কোনো লেখাই লেখেননি। এই গবেষণাগ্রন্থে এই বিচিত্রপ্রতিভাধর লেখক সম্বন্ধে নানা দিক স্পর্শ করে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর জীবনী, গ্রন্থ, সম্পাদকরূপে তাঁর নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে শুধু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উত্থাপিত হয়নি, তার মূল্যায়নও করা হয়েছে—যাতে গবেষকের মার্জিত বিচারবুদ্ধি ও সারস্বত রসবোধ—দুই-ই লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা বাংলা গবেষণাগ্রন্থ সম্বন্ধে নিরুৎসুক, তাঁরা এই আলোচনা পড়লে পূর্বমত পরিত্যাগ করবেন বলে আশা করা যায়। ভালোলাগাই এই গ্রন্থপাঠের একমাত্র ফলশ্রুতি। তত্ত্ব, তথ্য ও জ্ঞানের কথা অনেক আছে, কিন্তু সকলের ওপরে আছে একটি উদার সরস মন—যার ফলে তত্ত্বকথাও হৃদ্য হয়ে ওঠে।

এর প্রধান কারণ এই গবেষক আবার কবিও বটে। তাই রচনা ভঙ্গিমার মধ্যে সহজ আনন্দরস ফুটে উঠেছে। বক্তব্যের মধ্যে গুরুত্ব আপনাআপনি এসে পড়েছে। আমার মনে হয়, এই ধরণের আনন্দ স্নিগ্ধ রচনাই সাহিত্য গবেষণার বাহন হওয়া উচিত। গবেষণা বললেই যে ধরণের বিরস বিকট গাম্ভীর্য এবং নীরন্ধ্র তথ্যের ব্যূহসজ্জা বোঝায় তার পরিবর্তন হওয়া উচিত। ড. নীরেন্দু হাজরা সে ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন, তা যে-কোন সচেতন পাঠক স্বীকার করবেন। তাঁর এ গ্রন্থ জনপ্রিয়তা অর্জন করবে কিনা বলতে পারব না, কারণ জনপ্রিয়তা একালে হাটের পণ্যে নেমে এসেছে। বাঙালীচেতনায় ভাটার টান শুরু হয়ে গেছে তিন দশক আগেই। এখন "জীবনের স্রোত জাহ্নবীসম বহু দূরে গেছে সরিয়া, এ শুধু উষর মরুভূধূসর মরুরূপে আছে পড়িয়া।" এখন কি এলিয়টের মতো বলতে হবে—"Are you alive, or not? Is there

nothing in your head?" আমরা কি শূন্যগর্ভ মানুষ? বাঙালি কি জুলু-বান্টু-হটেনটটে পরিণত হবে? না কি যাদুঘরের কুলঙ্গিতে ধুলিধুসর অস্তিত্ব রক্ষা করবে? নীরেন্দুর 'সঞ্জীবচন্দ্র' পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, হয়তো এখনও এ-সাহিত্য ও মননের প্রাসঙ্গিকতা আছে। চারিদিকে শুষ্ক শীর্ণ কত-কালের শোভাযাত্রার মধ্যে মাঝেমাঝে নবজাতকের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। নীরেন্দুর এই গবেষণা তার প্রমাণ।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

ব্যক্তি সঞ্জীবচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব একই বিধাতার সৃষ্টি। এই প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব বৈঠকী-খোস্ গল্পে, আড্ডায়, হাসি তামাশায় ও রঙ্গ-রসিকতায় সে-যুগের সারস্বত সমাজে ছিলেন বিশিষ্ট ও সমাদৃত। বঙ্কিমযুগে স্বল্প জীবনকালে (১৮৩৪-৮৯) নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা স্মরণ করে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। প্রবন্ধকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও ভ্রমণ সাহিত্যের স্রষ্টারূপে তিনি তাঁর প্রতিভাকে যে ভাবে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তা বিচিত্র ও অনন্য।

বাঙালী জাতির স্বভাব অন্যমনস্কতা। আমরা এক জন্মেই সব ভুলে যাই আর সঞ্জীবচন্দ্র তো প্রায় দেড়শো বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেন। তা-তো রীতিমত পুরাতনকাল। সেই পুরাতন কালের ইতিহাস বিবৃত করে বিস্মৃত প্রায় একজন শক্তিশালী লেখকের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপিত করাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁর জীবন ও সাহিত্য কর্মের সঙ্গে একালের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করি।

ব্যক্তি জীবনের সূত্র লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত করে। প্রথমে তাই সঞ্জীব-জীবন প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্জীবন ব্যাখ্যাত হয়েছে। তারপর সমকালীন যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় সঞ্জীব সাহিত্য কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়েছি। পূর্ববর্তীকালের ধারার সূত্র ধরেই সমকালীন লেখক সাহিত্যিকগণের মধ্যে থেকে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে এই প্রয়াস। সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের সহধর্মিতা লক্ষ্য করা হয়েছে। তাঁর প্রথম যৌবনে ইংরাজীতে লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ "Bengal Ryots and their-liabilities". বাংলা ভাষায় লেখা না হওয়ায় সাধারণ পাঠক সমাজ এই অমূল্য গ্রন্থটির তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারেননি। তাই চাষীদের স্বার্থ সংক্রান্ত এই পুস্তকখানির মূল্যায়ণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেছি।

তাঁর 'যাত্রা', 'বাল্যবিবাহ', 'সংকার', ও 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রভৃতি দুর্লভ প্রবন্ধগুলি ছাড়া আরো প্রায় ২০।২২টি দুষ্প্রাপ্য রসগর্ভ অথচ মননশীল প্রবন্ধ

যথাক্রমে 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর' ও 'প্রচার' পত্রিকার ছেঁড়াপাতা থেকে উদ্ধার করে তার মূল্যায়ণ করা হয়েছে। তাঁর 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' রচনা দুটির মধ্যে ছোটগল্পের বীজ লক্ষ্য করা হয়েছে। 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা' ও 'জাল-প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসে লেখকের সাহিত্য কৃতির অন্তরালে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ভ্রমণকাহিনী 'পালামৌ'-এর আলোচনাও বিষয় বস্তুর অঙ্গীভূত। সম্পাদক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের অবদান আদৌ কম নয়—তা স্বীকৃত। সমকালীন বিভিন্ন সমালোচকদের দৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্রের শিল্পীমানসের যে বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাও আলোচনার বহির্ভূত নয়।

পরিশেষে লেখকের ও লেখক পরিবারের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রতিকৃতি এবং পাণ্ডুলিপি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বিস্মৃতপ্রায় লেখক সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণার জন্যে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আমার গবেষণা পত্রখানি পাঠ করে একটি মূল্যবান ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। তাঁকে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই।

উৎসর্গ

প্রাতঃস্মরণীয়

বাবা-মাকে

সূচীপত্র

চন্দ্রনাথ বসু

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(বসুমতী-কার্য্যালয়)

কলিকাতা

১১২।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা

১৩১২

সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদ

গ্রাম্য পাঠ নং ২।

বাল্যবিবাহ।

ভ্রমর পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।

CALCUTTA,

Printed and Published by Radha Nath Banerjee

Johnson Press.

1882.

মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রণীত প্রথম প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহ' -এর প্রচ্ছদ পত্র
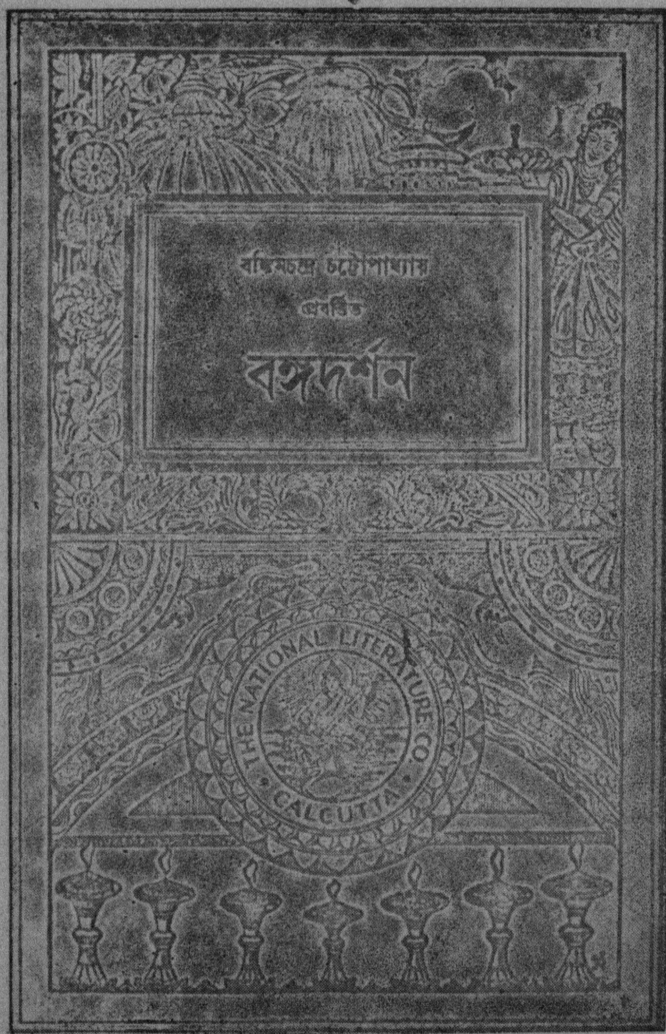
বঙ্গদর্শনের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ—১৩৪৩ বঙ্গাব্দ-এর
নমুনার প্রতিলিপি

ভ্রমর

ভ্রমর পত্রিকার প্রচ্ছদ

প্রচার।

মাসিক পত্র।

প্রচার পত্রিকার সূচীপত্র

'পদোন্নতির পন্থা' পাণ্ডুলিপির অংশ

'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির অংশ

সঞ্জীবচন্দ্রের ইংরাজীতে লেখা ডায়রীর একটি পাতা

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী

[জন্ম, বংশপরিচয়, বাল্যজীবন, শিক্ষা, কর্মজীবন ও সাহিত্যসাধনা, শেষ জীবন ও মৃত্যু।]

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সঞ্জীবচন্দ্র বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। পালামৌ গ্রন্থ রচনার আগে প্রভূত পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় 'Bengal Ryots : their rights liabilities'— গ্রন্থখানি ইংরাজিতে রচনা করেন। গ্রন্থখানি রচনার সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২৮।২৯ বছর। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, সঞ্জীবচন্দ্রের বয়স তখন ৩০ বছর। গ্রন্থখানি তখনকার উচ্চশিক্ষিত সমাজে খুবই পরিচিতি লাভ করে। বিশেষতঃ হাইকোর্টের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল-মোক্তারদের হাতে হাতে পুস্তকখানি ঘুরত। কিন্তু তাঁর এই জনপ্রিয়তা একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র তা বুঝেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে মাতৃভাষা বাংলায় 'আইনুগ প্রকাশিকা'[১] নামে একটি বড়ো প্রবন্ধ রচনা করেন ব্যাপক পাঠক সমাজের সুবিধার জন্য।

কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। 'বঙ্গদর্শনে. (১২৭৯) প্রথম তাঁর 'যাত্রা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। যদিও এর আগে কৈশোরে কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর'[২] পত্রিকায় তিনি দু-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শে ১২৮১ বঙ্গাব্দ থেকে তিনি 'ভ্রমর' পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। এই সময়ে 'ভ্রমর'-এ প্রকাশিত হয় তাঁর সামাজিক সমস্যাজড়িত প্রবন্ধ ও উপন্যাসগুলি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'সৎকার'', 'স্ত্রীজাতি বন্দনা', 'বাল্যবিবাহ', 'ভারত ভাণ্ডারী', 'একঘরে', 'কীর্তন' প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। জীবিতকালে তাঁর 'যাত্রা সমালোচনা' (প্রবন্ধ-১৮৭৫) 'সৎকার' (প্রবন্ধ-১৮৮১), 'বাল্যবিবাহ' (প্রবন্ধ-১৮৮১) প্রভৃতি প্রবন্ধের পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হয় এবং 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'কণ্ঠমালা' (ভ্রমরে প্রকাশিত), 'জাল প্রতাপচাঁদ' ও 'মাধবীলতা' (বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) উপন্যাসগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর চার বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'পালামৌ' (ভ্রমণকাহিনী), 'দামিনী' (পূর্বে ভ্রমরে প্রকাশিত), 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—'সঞ্জীবনী সুধায়' প্রকাশ করেন। এছাড়াও, সঞ্জীবচন্দ্রের এমন কতকগুলি সমৃদ্ধ রচনা 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর' ও 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়—যা ইতিপূর্বে তাঁর রচনা বলে পাঠক জানতেন না। যেমন 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম', 'বঙ্গদর্শনের পরাধীনতা', 'গৃহসন্ন্যাস', 'চাকরীর পরীক্ষা' ও 'বৈজ্ঞিকতত্ত্ব' প্রভৃতি ভ্রমরে প্রকাশিত—'ভূতের সংসার',

'অকাতরে বিবাহ' 'বাহুবল', 'ভ্রমরের আত্মকথা' প্রভৃতিও 'প্রচারে' প্রকাশিত 'পরকাল', 'বিবাহের ঘটকালি', প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি সামাজিক ও ঐতিহাসিক মননজাত। তিনি তাঁর সাহিত্যসাধনাকে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল।

দুই

সঞ্জীবচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে (১২৪৫ বঙ্গাব্দে) কাঁটালপাড়া গ্রামে। তিনি যাদবচন্দ্রের [৩] দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর পূর্বপুরুষের আদিবাস ছিল হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রাম। প্রপিতামহ রাজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরে কাঁটালপাড়া নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের মেয়েকে বিয়ে করে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঐ স্থানেই বসবাস করেন। তাঁর পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের পিতামহ। পিতা যাদবচন্দ্রের ৪ পুত্র—(১) শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (২) শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯), (৩) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৮-১৮৯৪), (৪) শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২)। যাদবচন্দ্রের দুটি বিয়ে। প্রথমা নিঃসন্তান মারা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র (১৭৯৪-১৮৮১) দীর্ঘজীবী ছিলেন। ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং সৌম্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, পৌরুষদীপ্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি আরব্য ও পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সেই নিজের প্রচেষ্টায় কটকের যাজপুরে নিমৃকি দারোগা হন (পুলিসের দারোগা নন)। নিজের কাজের পুরস্কারস্বরূপ ডেপুটি কালেক্টর পদটি পেয়েছিলেন রিকেটস্ সাহেবের কাছ থেকে। এই পদটি পেয়েই তিনি মেদিনীপুরে বদলী হন। সঞ্জীবচন্দ্রের মা ছিলেন করুণাময়ী; শান্ত শিষ্ট নম্র ছোটোখাটো কৃষ্ণবর্ণা বাঙালী রমনী। নাম—দুর্গা দেবী।

অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অনুজ সঞ্জীবচন্দ্রের পড়াশুনার জন্য ব্যারাকপুরে District Govt. School-এর Junior Scholarship পরীক্ষার জন্যে ভর্তি করে দেন। অগ্রজের স্নেহধন্য সঞ্জীবচন্দ্রের পড়াশুনায় এখানে প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু পরীক্ষার আগে নিদারুণ অসুস্থতার জন্য তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরবর্তীকালে যখন বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র Spl. Sub-Registrer হয়েছিলেন তখন শ্যামাচরণ প্রায়ই তাঁর বাসায় যাতায়াত করতেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র দিদি হলেন নন্দরাণী। এঁর স্বামীর নাম শশীকান্ত মুখোপাধ্যায়। যাদবচন্দ্র একমাত্র কন্যা নন্দরাণীর বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ীর কাছেই কন্যা-জামাতার জন্য পৃথক বাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলেন। তবে শশীবাবু বাঁকিপুরে (বিহার) চাকরি করতেন। নন্দরাণীর পুত্রের নাম কৈলাসচন্দ্র। এঁর দুটি সন্তান—নরেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র। ভাগিনেয় কৈলাসবাবু, চাটুজ্জ্যে-মুখাজ্জী পরিবারের বড়ো ছেলে। তাই তিনি বাড়ির বড়দা বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাপরায় (বিহারে) কাজ করতেন। দিদি নন্দরাণী সঞ্জীবচন্দ্রকে খুবই স্নেহ করতেন। শেষজীবনে ঋণভারে জর্জরিত সঞ্জীবচন্দ্র কিছু দিন (বাঁকিপুর, ছাপরায়) দিদির কাছেই আশ্রয় নেন। এই বাঁকিপুরে থাকার সময়ই 'মাধবীলতা' উপন্যাসের শেষার্ধ লেখেন এবং সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা'[৪] প্রেসে Manuscript পাঠিয়ে দেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেজ ভাই, তাঁর সাহিত্যসাধনার উৎসস্বরূপ। কৈশোরে অনুজ বঙ্কিম মধ্যমাগ্রজকে ভীষণ ভালবাসতেন। সঞ্জীব পড়াশুনা করতেন না বলে মাকে বলে দিতেন। 'বানর' ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে পড়াশুনা নষ্ট হতে দেখে সঞ্জীবকে সাবধান করে দিতেন। বঙ্কিম ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় ভাল তো ছিলেনই, সবচেয়ে বড়ো কথা বঙ্কিমচন্দ্র সব বিষয়ে আত্মসচেতন ছিলেন। সঞ্জীবের পড়াশুনা হচ্ছেনা দেখে নিজে উপযাজক হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে সঞ্জীবচন্দ্রকে 'Law class'-এ ভর্তি করে দিয়েছিলেন। 'Law class'-এ ভর্তির তখন কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। যে কেহ ভর্তি হতে পারত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল হৃদ্য। সঞ্জীবের একমাত্র পুত্র জ্যোতিষকে বঙ্কিমচন্দ্র পুত্রস্নেহে পালন করেন। সঞ্জীবের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্রই জ্যোতিষকে পরিচালনা করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের পুস্তকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা ও পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাতে জ্যোতিষের হাতে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতেন। জ্যোতিষের সংসারের সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি ছিলেন তৎপর। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি 'সঞ্জীবনী সুধা' পুস্তকখানি লিখে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। এই পুস্তকখানি হতেই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের খুঁটিনাটি পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই। তিনিও জীবনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডেপুটিপদ অলংকৃত করেন এবং বঙ্গদর্শনের লেখক ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী' 'শৈশব সহচরী' (১২৮২-৮৪), বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব', 'আর্য্যদর্শন' পত্রে পূর্ণচন্দ্রের রচনা প্রশংসিত হয়েছিল। পূর্ণচন্দ্র সঞ্জীব-চন্দ্রের চেয়ে ১২ বছরের ছোট ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

তিন

গ্রামের পাঠশালাতেই সঞ্জীবচন্দ্রের পড়াশুনা সুরু হয়। কাঁটালপাড়ায় যাদবচন্দ্রের গৃহে একটি পাঠশালা বসতো। এখানে সব জাতের ছেলেমেয়েরা পড়ার জন্য আসত। পড়াশুনা কতখানি হত তা বলা বাহুল্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের উপরিপাওনা ভালই ছিল। পড়াশুনা হচ্ছেনা দেখে পিতা যাদবচন্দ্র পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরে নিয়ে যান। যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেকটর। সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে মেদিনীপুরের স্কুলে ভর্ত্তি হন। মনে হয়, সময়টা ১৮৪২।৪৩ সাল। কিন্তু কিছুকাল পরেই দুই ভাইকে কাঁটালপাড়ায় ফিরে আসতে হয় এবং হুগলী কলেজে সঞ্জীবচন্দ্র ভর্ত্তি হন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে ক, খ শেখাবার জন্য রামপ্রাণ সরকারকে[৫] নিযুক্ত করা হয়। সঞ্জীবচন্দ্র এঁর কাছেও ৮।১০ মাস শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু শিক্ষা বলতে কিছুই লাভ হয়নি। বরং এই মহাত্মার কাছ থেকেই মুক্তির জন্য দুই ভাই আকুল হ'য়ে ওঠেন।

আবার, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্রের বয়স যখন বছর দশেক, তখন তাঁর পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে যান এবং মেদিনীপুর ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এখানে বছর চারেক ছিলেন এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ভালো ছেলেদের মধ্যে নিজেকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু Junior Scholarship পরীক্ষা (এখনকার দশম শ্রেণী) দেওয়া হল না। কারণ, পরীক্ষার কিছুকাল পূর্বেই সঞ্জীব ও বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুর ছেড়ে কাঁটালপাড়ায় ফিরে আসতে হয়েছিল। এই টানাপোড়েনে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে শিক্ষাবিভ্রাট ঘটে গেল। সঞ্জীবচন্দ্র আবার হুগলী কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু Junior Scholarship পরীক্ষা দিতে দেরী ছিল। তাই সঞ্জীবচন্দ্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয়। বয়ঃ-সন্ধিকালে কিশোরদের জীবনে যা ঘটে, সঞ্জীবচন্দ্রের তাই ঘটল। অকালপক্ক ছেলেদের পাল্লায় পড়েন। পরীক্ষার নির্ধারিত দিনে না যাওয়ায় পরীক্ষা আর দিতে পারেন নি। সঞ্জীব class-এ উঠতে পারলেন না। মন ভেঙে যাওয়ায় তিনি স্কুল-কলেজের পড়া ছেড়ে দিলেন। পিতা যাদবচন্দ্র তখন বর্ধমানে

ডেপুটি কালেক্টর। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে নিজের কাছে বর্ধমানে নিয়ে যান। সঞ্জীব স্কুল-কলেজের পড়া বিসর্জন দিলেও পাঠ্যপুস্তকের বাইরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রচুর পড়াশুনা চালিয়ে যান।

সঞ্জীবচন্দ্রের পড়াশুনার আগ্রহ দেখে বড়দাদা শ্যামাচরণ তাঁকে ব্যারাকপুরে Govt. স্কুলে Junior Scholarship৬-এ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। পরীক্ষার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে সুরু করেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হন। ফলে পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ডিগ্রী জীবনে পেলেন না, বোধহয় সরস্বতী তাঁর প্রতি বিমুখ ছিলেন। মন ও শরীর খারাপ নিয়ে দিন কাটে। এই সময় তিনি ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ইতিহাস পাঠে মনঃসংযোগ করেন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ও কৌতূহলী মন সাহিত্য-জীবনের ভিত রচনা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানচর্চার যে আকুলতা দেখা গিয়েছিল, যা চিত্তের মুক্তি আনে, তা সঞ্জীবনী দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। দেখা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র ছাত্রজীবনে অনেকগুলি স্কুলে পড়াশুনা করেছেন, অনেকগুলি স্কুল বদলেছেন। কারণ পিতা যাদবচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ উভয়েই চাকুরির জন্যে বাইরে বাইরে থাকতেন, তত্ত্বাবধান ঠিকমতো হত না। তাছাড়া, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাড়ীতে না থাকার ফলে বালক সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ীর কর্তা—'Lord of himself' অনুজ বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবের চেয়ে বছর চারেকের ছোট ঠিকই, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। তাছাড়া বঙ্কিম শৈশব থেকে এত বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন যে, তিনি কেবল নিজের ভালই ভাবতেন না, অগ্রজের ভালমন্দের কথাও ভাবতেন। তাই অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে অনেক সময় সাবধান করে দিতেন। কু-সংসর্গে পড়ে দাদার জীবনটা গোল্লায় যাবে, এমনটা ভাবতেই পারতেন না। তাই মাকে অগ্রজ সঞ্জীব সম্পর্কে সমস্ত কথাই বলতেন কিন্তু কার্যত কোন ফল হয়নি।

কারণ সঞ্জীবচন্দ্র শুধু বাড়ীর কর্তাই ছিলেন না, পাড়ার ছেলেদের নেতাও ছিলেন। তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো ছেলেরা তাঁকে ঘিরে থাকত। তাঁদের সঙ্গে জমিয়ে সতরঞ্চ খেলতেন। কাজেই বিদ্যাচর্চার ব্যাঘাত ঘটবেই তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে, অনেক দুশ্চিন্তা ভুলে থাকা যায়, তাই পিতা যাদবচন্দ্র বিবেচনা করে পুত্র সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্ধমান কমিশনের অফিসে একটি

কেরানীর চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু অনুজ বঙ্কিম বাদ সাধলেন। তিনি অগ্রজের কেরানীগিরির চাকরীটা ছাড়িয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সীতে 'Law class-এ ভর্তি করেন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, দু'বছর 'আইন' পড়াশুনা করেও সফল হতে পারলেন না। হয়তো, অদৃষ্টের পরিহাস। সঞ্জীবচন্দ্রের এই ব্যর্থতা আত্মীয়স্বজনদের হতাশ করেছিল, কিন্তু সঞ্জীব নিজেকে পুষ্পোদ্যান তৈরীর সাধনায় নিমগ্ন রাখেন।

চার

সঞ্জীবচন্দ্রের কর্মময় জীবন ছিল পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর। অন্যান্য সহোদরের তুলনায় তাঁর কর্মজীবন নিষ্প্রভ মনে হলেও তাঁর সাফল্যও কিছু আছে। আসেসর, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, স্পেশাল সাব-রেজিষ্ট্রার হিসাবে তাঁর কাজের সাফল্য ও দক্ষতা অনস্বীকার্য। খোদ ইংরাজ Officer বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি যত্নশীল, নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। তাঁর ২০।২১ বছরের কর্মময় জীবন সুখ দুঃখের স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। পরিবারের প্রতি কর্তব্য তাঁর আদৌ কম ছিলনা। আসলে তিনি সংসারে ও সাহিত্যে কিছুতেই গুছিয়ে নিতে জানতেন না, তিনি আজন্ম সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই অন্যান্য সহোদরদের মতো প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি রসজ্ঞ ও সমঝদার। পিতার চেষ্টায় প্রথম জীবনে একটি কেরানীর চাকরি জুটিয়ে নেন বর্ধমানের কমিশনের অফিসে সম্ভবত ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি বেশিদিন চাকরি করেননি। কারণ অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপুত নয় এ চাকরি। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। তাই এ কেরানীগিরির চাকরির ভবিষ্যৎ থাকলেও, বঙ্কিম সঞ্জীবচন্দ্রকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে 'Law class-এ' ভর্তি করিয়ে দেন। তিনিও তখন 'Law class'-এর ছাত্র।

কিছুদিন পরে পিতা যাদবচন্দ্রের চেষ্টায় সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি আসেসর-এর চাকরী যোগাড় করে দেওয়া হল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উইলসন সাহেব নতুন Income Tax বসিয়েছিলেন। জেলায় জেলায় আসেসর নেওয়া হচ্ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলার জাহানাবাদে (বর্তমান আরামবাগ) কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে "আসেসরের" কাজ চালিয়েছেন। তাঁর উপরওয়ালা হুগলীর কালেক্টর Mr. A. V. palmer তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে

নিম্নের মন্তব্যগুলি করেন—

"I strongly recommend that the native assessor Baboo Sunjib Chunder Chatterjee now entertained be continued on his present salary or if that impossible that be may be allowed 200 Rs. pr menseum".

Baboo Sunjib Chunder Chatterjee assessor have acquiatted himself creditably."

(Annual Business Statement for 1861/62)[৮]

সঞ্জীব কর্মোপলক্ষে জাহানাবাদে যখন ছিলেন তখন গড়-মান্দারণের কিংবদন্তীটি শোনেন। সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ীতে এসে বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের কাছে গড় মান্দারণের গল্প করেছিলেন। বঙ্কিম সেই কাহিনীটি 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের উপাদান হিসাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। মোটকথা, সঞ্জীবচন্দ্র জাহানাবাদে ভালই ছিলেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আসেসর পদ উঠে যায়। স্বভাবতঃ সঞ্জীবচন্দ্রের বেকার জীবন কাটাতে হয়। এই সময় পারিবারিক আঘাত তাঁকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, তাঁর সাধের পুষ্পোদ্যানের উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ঔষধ হিসাবে পড়াশুনায় আত্মমগ্ন হন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের লেখা—'Bengal Ryots their Rights and liabilities' পুস্তকখানি তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে উক্ত বইখানি প্রকাশিত হয়। Revenue Board-এর স্বয়ং চাপমান সাহেব বইখানির 'Calcutta Review'-তে সমালোচনা করেন। বড় বড় সাহেব মহলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর সাহেব বইখানি পড়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ উপহার দেন। চাকরিতে ঢুকেই সঞ্জীবচন্দ্র যোগ্যতার পরিচয় দেন। Mr. E. Grey, নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর পুলিশ Report (১৮৬৪)-এ সঞ্জীব সম্পর্কে লিখেছেন —'A very good officer, He is painstaking intelligent, his natural self-reliance and independence of character ought to make invaluable judicial officer.'[৯]

সঞ্জীবচন্দ্রের বরাবরই পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ছিল। ডেপুটি পদটি

পেয়েই যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি আশংকাও ছিল, এ পদটি রাখতে পারবেন কিনা। পদটি পেয়েই বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি চিঠি লেখেন—"ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়, আমি কখনও পরীক্ষা দিতে পারি না; সুতরাং এ চাকরী আমার থাকিবে না।"[১০] সঞ্জীবচন্দ্রের এ অনুমান বাস্তবে পর্যবসিত হয়েছিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৬৯ খ্রীঃ-এর ৫ই জুলাই পর্যন্ত তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বহাল ছিলেন। এই অধ্যায়টি তাঁর জীবনে মোটা-মুটি স্মরণীয় কাল। কৃষ্ণনগরে থাকার সময় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। তাছাড়া, সাহিত্যানুরাগী বন্ধু বান্ধবদের সান্নিধ্যে তাঁর দিনকাল ভালই চলে যাচ্ছিল। ১৮৬৫ সালের শেষার্ধে ও ১৮৬৬ সালের প্রথমার্ধে তিনি ছোটনাগপুরে বদলী হন। তিনি সেখানে বেশীদিন থাকতে পারেননি। তিনি বিনা ছুটিতে বাড়ী ফিরে আসেন। কিন্তু এই বদলীর ফলে তাঁর অমর সৃষ্টি 'পালামৌ' রচিত হয়। 'পালামৌ'-র স্রষ্টাকে সাহিত্যানুরাগী পাঠকেরা কোনদিন ভুলতে পারবে না। ছোটনাগপুর থেকে যশোরে বদলী হন (১৮৬৭-৬৮ সালে)। কিন্তু এখানে তাঁর শরীর ধাতস্থ হয়নি, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া তাঁকে রুগ্ন করে তোলে। সপরিবারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮৬৮ সালে আলিপুরে বদলী হন। আলিপুর থেকে পাবনায় বদলী হন। যশোরে, আলিপুরে, পাবনায়—যেখানেই তিনি ছিলেন, সেখানেই তিনি কাজের দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তার ও পারদর্শিতার পরিচয় দেখিয়েছেন। ১৮৬৫ সালে যখন তিনি নদীয়া থেকে (কৃষ্ণনগর) বদলী হয়ে ছোটনাগপুরে যান,—তখন Mr. H. L. Dampier (কমিশনার, প্রেসিডেন্সী বিভাগ) তার পুলিশ-রিপোর্টে লিখেছিলেন—"His loss is very much regretted in the District" (1865)[১১]

ছোটনাগপুরে যে কয়েকটি মাস ছিলেন, সেই সময়ও তিনি তাঁর কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতা ঈর্ষ্যার যোগ্য। Colonel Palmer—কমিশনার, ছোটনাগপুর, লিখেছিলেন—'Zealous and intelligent Officer' (Revenue Report, 1865-66)[১২]

যশোরে ডেপুটিপদে থাকাকালে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তিনি কাজের গাফ্‌লতি করেননি। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর সৌজন্যবোধে অফিসের কর্মচারীরা খুবই খুশী ছিলেন। Mr. Manro, (কালেক্টর, যশোর) সঞ্জীবচন্দ্রের সুখ্যাতি করে লিখেছিলেন—'An officer of ability and promise, intelligent and willing'.[১৩]

সঞ্জীবচন্দ্র যখন ডেপুটি ছিলেন, তখন তিনি যতই যোগ্যতার পরিচয় দিন না কেন, তাঁকে চাকুরি হারাতে হয়েছিল ১৮৬৮ সালের ৫ই জুলাই। এই প্রসঙ্গে মহামান্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাগুলি স্মরণ করা যাক।

"সঞ্জীবচন্দ্র খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়ে ডেপুটিগিরিটি যায়। সঞ্জীববাবু তখন প্রবেশ-নারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪?[১৪] সালে ডিস্ট্রিক টাউন্স অ্যাক্ট্ পাশ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে। টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে। সংকল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজসাহেব বলিলেন—"আরও ৭৫ টাকা চাই, বাঙ্গালা নামগুলো কে বুঝিবে? ওগুলো ইংরেজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে। 'বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in Laws Lane' বলিতে হইবে।' জজসাহেবের কথায় উপস্থিত সদস্যদের কারো মনঃপুত হয়নি। জজসাহেব বারংবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করায় সঞ্জীবচন্দ্র মুখ খুললেন, বলেছিলেন— '৭৫ টাকায় হবে না, ৩০০ টাকা দরকার।' জজসাহেব সঞ্জীবের কথায় খুশী হয়ে বললেন—'কেন? তখন সঞ্জীববাবু একটু রসিকতা করেছিলেন। রসিকতাটি এই—'সঞ্জীববাবু বলিলেন—আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুণ কালীপদ বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black-footed friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে। সকলে হো হো করিয়া হসিয়া উঠিলেন। জজসাহেব মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন— সঞ্জীব, ভাল কাজ করিলে না। বাড়ি গিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস; সঞ্জীববাবু তিনদিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন। সাহেব দেখা করিলেন না।"........

"সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল জজসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন-চারবার পরীক্ষা দিলেন কিছুতেই পাশ করিতে পারিলেন না। তাহার নাম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল।"

(নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২)

অনুজ বঙ্কিমচন্দ্র এই রসিকতার ব্যাপারটা জানতেন না বোধহয়। তাহলে তিনি উল্লেখ করিতেন। তবে তিনি যতটুকু জানতেন তা সুন্দরভাবে 'সঞ্জীবনী সুধা'য় উল্লেখ করেছেন—"ডেপুটিগিরীতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারলেন না। কর্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন কর্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে একথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম, জানানও হইয়াছিল, কিন্তু ফলোদয় হয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আমরা একটি স্পষ্ট চিত্র পাই যে, যে কোন কারণেই হোক সঞ্জীবচন্দ্র দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি এবং ডেপুটি পদটি হারাতে হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটিগিরী আর পাইলেন না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরী দিলেন। বারাসতে তখন একজন সোশিয়াল সাব্-রেজিষ্টার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।"[১৫]

প্রথমে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর 'officiating Special Sub-Registrar' হিসাবে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন (১৮ই অক্টোবর, ১৮৬৯)। শ্রীউমাচরণ গাঙ্গুলীর ডেপুটিশন পদে পূরণার্থে তাঁকে officiating করতে হয়। তারপর, ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭০ সালে তাঁকে পাকাপোক্তভাবে 'Special Sub-Registrar' হিসাবে নিয়োগ করেন লেফ্টান্যাণ্ট গবর্ণমেণ্ট। তখন বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের সচিব ছিলেন এইচ. এস. বিডন সাহেব। নিয়োগপত্রটি এরূপ ছিল—'Sir, I am directed to inform you that the Leiutenant Governor has been pleased to appoint you to be special sub-Registrar of Assurance of Barasat".[১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র আরো লিখেছেন—"যখন তিনি বারাসতে, তখন প্রথম সেন্সস্ হইল। একার্যের কর্তৃত্ব Inspector General of Registration-এর উপরে অর্পিত। সেন্সসের অংক সকল ঠিক ঠিক দিবার জন্য হাজার

কেরানী নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।" এর কিছুদিন পরেই হুগলীতে Spl Sub-Registrar হিসাবে বদলী হয়ে এলেন। এখানে বদলী হতে তিনি খুবই খুশী হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই বর্ধমানে বদলী হন। বারাসত থেকে তিনি হুগলীতে বদলী হয়ে এলেন। যেমন কৃষ্ণনগরে যখন তিনি ডেপুটি ছিলেন, বেশ সুখে শান্তিতে ছিলেন ও আনন্দে দিন কাটাতেন, তেমনি হুগলীতে এসে মেজাজেই ছিলেন। বাড়ী থেকে অফিস যাতায়াত করতেন। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা বের করতে শুরু করেন। সঞ্জীবের 'যাত্রা' নামক প্রবন্ধটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ পায়। তাছাড়া, তখন তিনি পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'Administration Report'-এ তাঁর কাজের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ আছে—'Babu Sunjib Chunder Chatterjee deserves credit for the menner in which he supervised his office'. (Administration Report of the Registration Department for 1871-72, para 46).'[১৭]

"কিছুদিন পরে হুগলীর সবরেজিষ্টারী পদের বেতন কমানো গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্রের বেতন লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বর্ধমানে প্রেরিত হইলেন।"[১৮] বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র সুখে শান্তিতে ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সখ্যতা প্রকাশ্যভাবে ঘটে। আত্মীয়স্বজনরা তাঁর বর্ধমানের বাসায় যেতেন। বহু সাহিত্যিকের আগমনে তাঁর বাসগৃহ মুখরিত হয়ে উঠত। বিখ্যাত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, বহরমপুরের সাবজজ দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সঞ্জীবচন্দ্রের বাসায় জমাটি আড্ডা বসত। মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় গেলে আবার আরো জমজমাট হয়ে উঠত। অথচ কর্তব্যে তিনি মোটেই অবহেলা করতেন না। অফিসের কাজের চুলমাত্র এদিক-ওদিক হত না। অফিসের একঘেয়েমি পরিবেশকে তিনি হাসিমুখে প্রাণবন্ত করে রাখতেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' রচনার উৎস বর্ধমানের মহারাজ পরিবার। এখানে থাকার সময় তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন উপন্যাসটি লেখবার জন্য।

বর্ধমানে থাকাকালে তাঁর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর সম্পাদনায় 'ভ্রমর' (১৮৭৪-৭৫)-এর ১৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তিনি এইসময়ে সমকালীন কালের অভিজ্ঞতালব্ধ সামাজিক সমস্যাপূর্ণ প্রবন্ধ 'সংকার', 'বাল্য-

বিবাহ', 'স্ত্রীজাতি বন্দনা' প্রভৃতি রচনাগুলি লেখেন। তাছাড়া, 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'দামিনী', 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসগুলি ধারাবাহিকভাবে 'ভ্রমর'-এ প্রকাশিত হয়। এত কাজের মধ্যে তাঁর রসগর্ভ আলোচনা 'যাত্রা সমালোচনা' পুস্তিকাটি (১৮৭৫ খৃঃ ১০ জুলাই) প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। মৃত 'ভ্রমর' পত্রিকাটি বাঁচানর চেষ্টাও করেন। ১৮৭৬ সালে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যথাক্রমে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। একই সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' চালনা সম্ভব নয়। 'ভ্রমর' বন্ধ করে দেন। কিন্তু তাঁর বুকে এক বেদনাবোধ ছিল। ডেপুটির চাকরি হারানোর কষ্ট ভুলতে পারেননি। তাই তিনি শেষবার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন। ১৮৭৮-এর নভেম্বর মাসে বর্ধমানের রেজিষ্ট্রারকে দিয়ে "Inspector General of Burdwan"-কে একটি চিঠি লেখান। কিন্তু Inspector General, চিঠির প্রত্যুত্তরে জানালেন—লেফটেনাণ্ট গবর্ণর একবার যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলে অপসারিত করেছেন, পুনরায় তাঁকে সেই ডেপুটি পদে পুনর্বহাল করা যায় না। যাই হোক, এর কিছুদিন পরেই সঞ্জীবচন্দ্র যশোরে বদলি হলেন।

বঙ্কিম বলেছেন—"বর্ধমানের শোসিয়াল সব রেজিষ্ট্রারের বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামক একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া আসিল। যে কালেক্টর, সেই রেজিষ্ট্রার। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙালী কর্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই করা। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন।"[১১]

যশোরে বার্টনের অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিখুশীর মধ্যে দিয়েই অফিসের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। প্রৌঢ়ত্বে সংযম ও গাম্ভীর্য তাঁর ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ মহিমা দান করেছিল। ১৮৮০ সালেও তাঁর ধৈর্য্য ও স্থিতধী চরিত্র লক্ষণীয়। Administration Report-এ তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—"The Special Sub-Registrar Babu Sanjib Chunder Chatterjee has been of the most material assistance to me, He takes a throughly intellegent interest in the work". (Extract from the Administration

Report of the District Jessore No. 1287, dated 18th May 1880)[২০]

সব রেজিষ্ট্রার হিসাবে তাঁর যোগ্যতার মন্তব্যগুলি রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে সংগ্রহ করে সঞ্জীব কাগজে লিখেছিলেন। তা এখনো ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। এই বার্টন সাহেবের অসৌজন্যবোধ সঙ্গীবচন্দ্রের আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। তিনি ১২৮০ সালের শেষার্দ্ধে ছুটি নিয়ে চলে আসেন কাঁটালপাড়ায়। এরপর আর চাকুরীতে ফিরে যান নি। এখান থেকেই তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্রটি (১৮৮১ সালের ১৫ই এপ্রিল) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন—"From this date I am no longer in the service, my leave expired yesterday and I sent my resignation on that day."[২১]

এখানেই সঞ্জীবচন্দ্রের কর্মময় জীবনের শেষ। ১৮৬৯ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত টানা দীর্ঘ ১২ বছরের Special Sub-Registrar-এর চাকুরিজীবন তিনি আত্মমর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন।

পাঁচ

সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার সূচনা কৈশোরে। কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর' পত্রিকায় নাকি তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তা-ও আবার প্রবন্ধ। তিনি কবিতা আদৌ লিখেছিলেন কিনা জানা নেই। 'বঙ্গদর্শনে' 'যাত্রা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর ইংরেজি রচনাও খুবই বলিষ্ঠ, সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সঞ্জীবচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস বা প্রবন্ধাবলী চাকুরি-জীবনে রচিত হয়েছে। শুধু ইংরাজীতে লেখা 'Bengal Ryot their Rights and liabilities' গ্রন্থখানি (১৮৬৪) আসেসরের চাকুরিটি চলে যাওয়ার পরই রচনা করেন। দু'বছর প্রচুর পরিশ্রম করে 'Law' পড়ার পরিশ্রমটি কাজে লাগিয়েছিলেন এই পুস্তকখানি প্রণয়নে। কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে ইংরাজীচর্চার খুবই প্রচলন ছিল। পিতা যাদবচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ, অনুজ বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালই ইংরাজী জানতেন। সঞ্জীবচন্দ্র কোন ডিগ্রিলাভ করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু চোস্ত ইংরাজী জানতেন। 'Bengal Ryot' লিখে তিনি তার প্রমাণ করেছেন। যাই হোক প্রজাদের মঙ্গলসাধনে বইখানির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বইখানি সম্পর্কে লিখেছেন

"এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন।"

বইখানির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র মুখবন্ধে বলেন—'The following Compilation is presented to the public in the hope that it will supply a desideratum. There are many valuable works on the law of Landlord and Tenant in Bengal but, while giving ample details of the procedure, it was not within the scope of any of them to refer to the principles which have guided legislation on the subject, or to the historic changes which have, in process of time, revolutionised the legal and social relation between two of the most important sections of the Community". (28th April' 1864-Author's preface)…. অর্থাৎ প্রজাদের হিতসাধনের জন্যেই তিনি এই আইন সংক্রান্ত পুস্তকখানি রচনা করেছিলেন, যদিও সেই যুগে এই বইখানি হাইকোর্টের জজদিগের হাতে হাতে ঘুরত। এই মূল্যবান বইখানি কোলকাতা, ডি, রোজারিও এণ্ড কোং, ৮, ট্যাংক স্কোয়ার হতে ১৮৬৪ এ প্রকাশিত হয়। বইখানি এতদিন (১১২ বছর) পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নে পুস্তকখানির গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। বইখানির মূল বিষয় ছিল: ১) বাংলার প্রজাদের পূর্বেকার অবস্থা, ২) ইংরেজ আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে সমস্ত রচিত আইন, ৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার ৪) প্রজাদের উন্নতির জন্য কি করা কর্তব্য।

'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর'-এর সূত্রে তিনি বাঙলার প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি উদার ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। পিতার ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা মাতার করুণাই তাঁর চরিত্রে দাগ কেটেছিল। বঙ্কিম যেমন দারুণ রাসভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র তেমন ছিলেন না। নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যারা তাঁর প্রত্যক্ষে এসেছিলেন, তাঁরা তার পরিচয় দিয়েছেন সুন্দরভাবে। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের মননের ও রচনার নিখুঁত চরিত্র খুঁজে পাব।

সঞ্জীবের সাহিত্যসাধনা তাঁর ব্যক্তিমানসেরই উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে যে কয়টি কথা বলেছেন তা একরকম—"বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত, আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম, সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতে-ছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।"

লেখার মধ্যেও এই কথা বলার অজস্র আনন্দধারা ঝর্ণার মতো তিনি বইয়ে দিয়েছেন।

তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"যাহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দ বেগে লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া, এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটি লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।[২৩]

তার রচিত 'যাত্রা সমালোচনা' (১৮৭৫), 'সংকার' (১৮৮১), 'বাল্যবিবাহ' (১৮৮২), প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর আরও যে সমস্ত প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে, যেমন—'বৈজিকতত্ত্ব', 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম', 'পদোন্নতির পন্থা', 'কীর্তন', 'স্ত্রীজাতি বন্দনা', 'একঘরে', 'বাহুবল'—সমস্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁর ব্যাপক সহানুভূতি, ব্যঙ্গ মিশ্রিত লঘু পরিহাস-রসিকতা লক্ষণীয়।

এই রসদৃষ্টি প্রসঙ্গে আমরা ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন—'সঞ্জীবের রসদৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির কিছু মিল পাওয়া যায়। রচনারীতিও দৈবাৎ সঞ্জীবকে রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত বলা চলে।"[২৪]

সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' (১ম সংস্করণ) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ও ২য় সংস্করণ ১৮৮৬-এ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসখানি মাধবীলতার পরিশিষ্ট। দ্বিতীয় সংস্করণে সঞ্জীব নিজ হাতে কণ্ঠমালার অনেক অংশ পরিবর্তন করেন।

এই উপন্যাসের নায়িকা শৈল। নারীর স্বভাবদোষে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কি পরিণাম ঘটতে পারে তারই ইঙ্গিত কণ্ঠমালায় চিত্রিত হয়েছে। সঞ্জীব প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—'শৈলের চরিত্র কতকটা প্রকৃতিমূলক। যেমন সচ্চরিত্রের আখ্যান উপকারী, তেমন অসচ্চরিত্রের কথনেও উপকার আছে।······ সেই উদ্দেশ্যেই গল্পটির কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। পরে বাঙ্গালার কোন শ্রেষ্ঠ লেখক সেই লিখিত অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি পড়িয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন যে, গল্পটির যদি শত দোষ ঘটে, তথাপি এই এক পরিচ্ছেদের গুণে সে সকল দোষের মার্জনা হইবে।"[২৫]

'বাংলার কোন শ্রেষ্ঠ লেখক' বলতে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই বলা হয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রচুর পরিশ্রম করে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন—'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮২)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙালীর ইতিহাস' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্রবন্ধটি এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"জাল প্রতাপচাঁদ নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনা সংস্থান প্রমাণ বিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকেনা—কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র।" শুধু কি অপব্যয় মাত্র? শুধু ইতিহাস নয়, স্বাদেশিক মনোভাব যা ইতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, সঞ্জীবচন্দ্র 'জাল প্রতাপচাঁদ' কাহিনীর মধ্যে ও মামলার মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'ফৌজদারী ও দেওয়ানী' বিচারের ইতিহাসের প্রহসন লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে সঞ্জীবচন্দ্রের মাধবীলতা প্রকাশিত হয়েছে। 'মাধবীলতা' 'কণ্ঠমালা' প্রকাশের ৮ বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। 'মাধবীলতা'র পরে রচিত ও প্রকাশিত হলেও এটি কণ্ঠমালার প্রথমাংশ। 'মাধবীলতা'য় অনেক জটিল ব্যাপার আছে, অনেক ষড়যন্ত্র' ঘটনার জাল বয়ন ইত্যাদির নানা কলাকৌশল আছে, কিন্তু মূল কাহিনীটি বহুস্থলেই ঢিলেঢালা হয়ে আছে।"[২৬]

'দামিনী' সঞ্জীবচন্দ্রের একটি ক্ষুদে উপন্যাস। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮৯৩ খ্রীঃ) ৪ বৎসর পরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সঞ্জীবনী সুধা' সংকলন প্রকাশ করেন। তবে গল্পটি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভ্রমর'-এ প্রকাশিত হয়। এটি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা বলে মনে হয়। প্রতিবেশীদের স্বার্থপরতা,

ভীরুতা, কাপুরুষতার চরিত্র-চিত্রণ হয়তো সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল. তাই তিনি এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি রচনা করেন।

'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনীটি (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—সঞ্জীবনী সুধা) সঞ্জীবচন্দ্রের অমর সৃষ্টি। পর্যবেক্ষণশক্তি ও বর্ণনাক্ষমতার এমন শিল্পী সত্যিই বিরল। 'পালামৌ' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্যদৃষ্টির অপূর্ব পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। বনফুল যথার্থই বলেছেন—"পালামৌ বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য গ্রন্থ। ইহার জোড়া বই বাংলাভাষার আর একটিও নাই। প্রত্যেক সার্থক কবি-সৃষ্টির মূল রহস্যই তাহার অনন্যতা। অনেক প্রথিতযশা লেখক, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও, ইহাকে ভ্রমণকাহিনী বলে চিহ্নিত করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভ্রমণকাহিনী বলিলে ইহার প্রতি সুবিচার করা হয় না। ইহা কবি সঞ্জীব চন্দ্রের কবিমানসের আলেখ্য।"[২৭]

সঞ্জীবচন্দ্রের নামহীন কতকগুলি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলিও সমাজদর্পণের প্রতিফলন। যেমন—'চাকরীর পরীক্ষা', 'গৃহসন্ন্যাস', 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' (বঙ্গদর্শন প্রকাশিত—১৮৮০)। প্রচার-এ প্রকাশিত 'পরকাল' (১৮৮৫), 'বিবাহের ঘটকালি' (১৮৮৬) প্রবন্ধ সমাজমনস্ক শিল্পীর অসাধারণ সৃষ্টি।

প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক বিষয় বর্ণনায় তিনি সেই কালের চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। তাঁর চিন্তাধর্মী কথা অস্বীকার করবার মত নয়। হয়তো চিন্তাশক্তির প্রগাঢ়তায় তাঁর ধার ছিল না, কিন্তু হৃদয়রসে জারিত করার মত পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল, যেমন ছিল শরৎচন্দ্রের। তিনি বাইরে থেকে হৃদয়কে দেখতেন না, ভিতর থেকেই ভিতরের অমূল্য শক্তিকে দেখতে পেতেন। তাই তিনি আত্মনিষ্ঠ শিল্পী, বস্তুনিষ্ঠ পারঙ্গম শিল্পী হতে পারলেন না। তাঁর আলাপচারিতায় অনেকেই মুগ্ধ হন। তিনি মূলত কথক; আলাপী ব্যক্তি।

সঞ্জীবসাহিত্যে হাস্যরস তাঁর ভক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন প্রসন্নতা হতে উৎসারিত। তাঁর হাস্যরস অনায়াসলব্ধ, কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতো সহজাত। সঞ্জীবচন্দ্রের চলতি ভাষায় কোন রচনা নেই সত্যি, কিন্তু তার ভাষা চলতি ভাষার মতো প্রাঞ্জল। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রখ্যাত লেখক ও সঞ্জীব-সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য অনস্বীকার্য—'তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়' ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ, সরল, নিষ্ঠ,

কারুকার্যহীন, আর এই যে বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীব ইহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন, তাঁহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন।"[২৮]

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার বিষয়বস্তু, হাস্যরস, রচনারীতি ও ভাষা, শিল্পীর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত। তিনি অনাগত কালের জন্য রেখে গেছেন তার রসসিক্ত হৃদয়টি. যার স্পর্শে সেকালের ও একালের পাঠক মাত্রেই সমান মুগ্ধ ও সঞ্জীবিত।

ছয়

সঞ্জীবচন্দ্রের শেষজীবনে অর্থকষ্টের ছাপ খুবই লক্ষিত হয়। দোল-দুর্গোৎসব, পূজা পার্বণ প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য পরিবারের জীবনধারার বনিয়াদ ভেঙে পড়েছিল। যাদবচন্দ্রের ঋণগ্রহণ করবার প্রবণতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পিতার প্রবণতা সঞ্জীবচরিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি তাঁর ভ্রাতাদের মতো তীক্ষ্ণ ছিলনা। ফলে, তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা কোনদিনই জোটেনি। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমোদপ্রিয় ও ভোগবিলাসী ছিলেন। আজীবন ঋণের বোঝা থাকার ফলেই শেষজীবনে তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে অবিন্যস্ততা ও উদভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়।

পিতা যাদবচন্দ্র দেহরক্ষা করেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, আর সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন একই বছরের এপ্রিল মাসে। অবসর নিয়ে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ঋণগ্রস্থ সঞ্জীবচন্দ্র পারিবারিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গদর্শন প্রেসকে কাঁটাল-পাড়ার বাড়ি থেকে কোলকাতায় এনে বড়ো করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সালের ৩০শে মার্চ পনেরশো টাকা ধার করেন। সেই ঋণপত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে যাদবচন্দ্রও সহি করেছিলেন। ঐ ঋণ তামাদি হয়ে গেলে পাওনাদার কুমার-টুলির ব্যবসায়ী মথুরা মোহন রায় চার ভাইয়ের নামে নালিশ করেন। বঙ্কিম সহ চার ভাই-ই মামলায় জড়িয়ে পড়েন। যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর ঋণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হন। ১৮৮২-১৮৮৫ পর্যন্ত মামলা চলার পর পাওনাদার মামলায় জিতে যায়। সঞ্জীবচন্দ্র ঋণশোধ করতে না পারায় তাঁর উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয় ও বাড়ীর জিনিষপত্র ক্রোক করা হয়। ঋণভারে জর্জরিত সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে ভাগলপুরে জ্ঞাতি-ভাইপোর কাছে চলে যান। ভাগলপুরে গিয়ে পুত্র জ্যোতিষকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন,

তাতে একজন ছন্নছাড়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের মর্মন্তুদ জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। চিঠিখানি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার লেখা হয়—

"প্রাণাধিকেষু,

কল্য বৈকালে চুচুড়া হইতে রওনা হইয়া অদ্য ভাগলপুরে পৌছিয়াছি। তুমি আপত্তি করিবে বলিয়া তোমায় পূর্বে সম্বাদ দিই নাই। এখানে কীর্তির নিকট শুনিলাম, হাজার টাকার অধিকমূল্যের ডিগ্রি হইলেও moveables ঘটি বাটি ক্রোক নীলাম হইতে পারে। অতএব সাবধান। আলিপুরে তোমার রাধানাথ জেঠাকে পাঠাইয়া সম্বাদ জানিবে। যে পর্যন্ত তাহা নিশ্চয় জানা না যায়, সে পর্যন্ত সদর দরজা বন্ধ রাখিবে। আমি এখানে অল্পদিন থাকিয়া ফিরিয়া যাইব। রাধানাথদাদাকে বলিবে এবং এই পত্র দেখাইবে যেন ফরাসডাঙায় একটা সামান্য ঘর দেখিয়া রাখেন। গৃহস্থের বাটি হইলে ভাল হয়, অল্প খরচে হইবে। আমি মোটে ১৫।২০ টাকায় তথায় চালাইব।....

চিরণ, অনিল আমার জন্য না আবদার করে। তাহাদের খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিবে।"[২৯]

এই চিঠি পড়েই জানা যায়, জীবনের শেষপ্রান্তে সঞ্জীবচন্দ্র খুবই অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করে বসবাসের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।

তখন পর্যন্ত জ্যোতিষ চাকরি পান নি। জ্যোতিষের কয়েকটি ছেলেপুলে হয়েছে। চিঠিতে জ্যোতিষের ছেলেমেয়ের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহের সুর অনুভব করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র এই সময়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় সঞ্জীবকে নিয়মিত সাহায্য করতেন। শেষপর্যন্ত তাঁর একান্ত চেষ্টায় সঞ্জীবচন্দ্র ও তাঁর পুত্র ঋণমুক্ত হন। বস্তুতঃ সঞ্জীবচন্দ্র আজীবন অমিতব্যয়ী ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা চালানোর মধ্যে তাঁর সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় যেমন অনায়াস লক্ষণীয়, তেমনি ঋণ গ্রহণ করে একমাত্র ছেলে জ্যোতিষের জাঁকজমক করে বিয়ে দেবার ব্যাপারটির মধ্যে তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার লক্ষণ স্পষ্ট। ইতিমধ্যে ৫০০০ টাকার মত ঋণ সঞ্জীবচন্দ্র গ্রহণ করেছেন। তবু ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্র পিতা যাদবচন্দ্রের পরামর্শে ১৬০০ টাকা ঋণ করে মাত্র ১৪ বছরের কিশোর জ্যোতিষচন্দ্রের জাঁকজমক করে বিয়ে দেন। তখন তিনি হুগলীর স্পেশাল সাব-রেজিষ্টার। তাই ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্জীবচন্দ্র পিতার মত যাতে ঋণ গ্রহণ না করেন তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে একটি

চিঠি লেখেন (১৮৭৪ খ্রীঃ ১৫ই নভেম্বর)—

"আপনি যদি এই ঋণ বৃদ্ধি করেন, তবে যতীশের (জ্যোতিষ) যাবজ্জীবনের জন্য যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন, বলা যায় না। যতীশ সে সবেরই দায়িক। যেদিন সে প্রথম উপার্জন করিতে শিখিবে, সেইদিন হইতে এই ঋণের ভার তাহার মাথার উপর চাপিবে। আর হইজন্মে তাহা নামাইতে পারিবে কিনা বলা যায় না। আপনাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরসা হয়না যে কখনও উদ্ধার পাইবে। যাহার স্কন্ধে ঋণের ভার চাপে, তাহার অপেক্ষা অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই।"[৩০]

বলা বাহুল্য, সঞ্জীবচন্দ্র আজীবন ঋণগ্রস্ত ছিলেন। জীবনে কোন ঋণ তিনি পরিশোধ করতে পারেননি। তবে যৌবনে তাঁকে ঋণের দায়ে বিমর্ষ হ'তে দেখা যায়নি, বরং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতায়, ঠাট্টা-মস্করায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতেন। নিজেকে ভুলিয়ে রাখা মানুষের একপ্রকার ক্ষমতা। সঞ্জীবচন্দ্রের সেই ক্ষমতা ছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রীতিপরবশ, উদার, বন্ধুবৎসল ও ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। জীবনটাকে তিনি ব্যঙ্গ হিসাবেই দেখেছিলেন। তাই তাঁর কথাবার্তায়, আলাপ-আচরণ ও আড়ম্বরের মধ্যে পরিমিতিবোধের অভাব লক্ষ্য করা যায়। জীবনের শেষার্ধে তাই তাঁকে কষ্ট পেতে হয়। তিনি অভাবের তাড়নায় সন্ন্যাসগ্রহণে ব্রতী হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ ৪ মাসের রিটার্ণ টিকিট করে শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র—তিন ভাই একসঙ্গে উত্তর ভারত তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী ফিরে আসেন আগেই। সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ী না ফিরে এলাহাবাদে থেকে যান ও চুল-দাড়ি রেখে সন্ন্যাস গ্রহণে মনস্থ করেন। ফলে সঞ্জীবচন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্র পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা খুবই উদ্বিগ্ন হন। অবশ্য কার্যত তিনি সন্ন্যাসধর্মগ্রহণ করেননি। ৪ মাস পরে ১৮ই জুলাই পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনের সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসেন। সঞ্জীবচন্দ্রের শৈশবাবধি সন্ন্যাসজীবনের প্রতি আগ্রহ ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের পিতাও একবার সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসী চরিত্রের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়।

দেখা যায়, চাকরি ছেড়ে দেবার পর থেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের রাগ ও অভিমান একটু বেশী পরিমাণে প্রকটিত হয়। পুত্র জ্যোতিষের চাকরী ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। স্বভাবতঃ, তিনি সামান্য কারণেই

বিচলিত হয়ে পড়তেন। শারীরিক পীড়া, মাথার পীড়া ও মানসিক কষ্টে সঞ্জীবচন্দ্রের মেজাজটি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ছেড়ে দেবার দীর্ঘ ৬ বছর পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুত্র জ্যোতিষ নদীয়া জেলায় মেহেরপুরে পুলিশ-ইনস্পেক্টরের চাকরি পেলে সঞ্জীবচন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। জ্যোতিষের চাকরির Permanent হওয়ার খবর এলে সঞ্জীবচন্দ্র আনন্দে যে চিঠিখানি লেখেন তাতে তার পিতৃহৃদয়ের মমতাতুর সত্তাটি উদ্ঘাটিত হয়েছে।

"প্রাণাধিকেষু,

সকলে ভাল আছি। অনিল ও কিরণ উত্তম লেখাপড়া করিতেছে। গতকল্যর পত্রে তোমার Permanent হওয়ার বার্তা জানিয়া সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আহ্লাদে তোমার প্রসূতি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছেন। এতদিনে স্থির হইল, তুমি আর অন্নকষ্ট পাইবে না। Uncles-দের রূঢ় কথা শুনিতে হইবে না।...

তোমার ছুটির পরামর্শ পরে হইবে। এখন সকলে দুইদিন আহ্লাদ করুক। নিত্য আমার পীড়ার কথা কেন লেখ বুঝিতে পারি না। যখন যেমন থাকি, তাহা লিখিয়া থাকি। পীড়াই বা কি? বুড়া বয়সের পীড়া মাত্র; কখন থাকে, কখন যায়। ছেলেরা সকলে ভাল আছে।"[৩১]

এই চিঠির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের আবেগকম্পিত পুত্রস্নেহের ও বাৎসল্যরসের উৎসটি বিশেষ লক্ষণীয়। তাছাড়া, এই চিঠির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, সন্তানের চাকরিতে স্ত্রীর আনন্দে সঞ্জীবচন্দ্র শিশুর মতই খুশীতে উচ্ছল। সন্তানের চাকরি হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্র নিজের অসুখ-বিসুখ ও মানসিক কষ্টও ভুলতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীর প্রতিও তাঁর অনুরাগ সিঞ্চিত।

সঞ্জীবচন্দ্র অর্থকষ্ট ভোগ করলেও তিনি পরিবারের সকলেরই মমত্বের কারণ হয়েছিলেন। পিতা যাদবচন্দ্রের সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি অন্ধ অপত্যস্নেহ ছিল। জ্যোতিষের চাকরি হলেও সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। কারণ জ্যোতিষের মাসিক মাহিনা মাত্র ১০০ টাকা ছিল। তাতে জ্যোতিষের সংসার নির্বাহ সম্ভব ছিল না। বঙ্কিম পিতার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবচন্দ্রকে পিতার মতই দেখাশুনা করতেন চিঠিতে তার প্রমাণ আছে।[৩২]

"শ্রীচরণেষু,

জ্যোতিষের নিজ পরিবার…প্রতিপালন, কিন্তু আপনার ভার তাহার উপর দিবার ইচ্ছা নাই।….

স্বর্গীয় কর্তা মহাশয় জীবিত থাকিতে তাঁহার (১) আহার (২) পরিধেয় (৩) চিকিৎসা এই তিন প্রকারের ব্যয় আমরা নির্বাহ করিতাম। আপনার সম্বন্ধেও আমি তাহাই করিতে চাহি।"….

অগ্রজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দায়-দায়িত্ব ও মমত্ব আজীবন অটুট ছিল। "সঞ্জীবের কাছে লেখা চিঠিগুলো বঙ্কিমের পরিবার-পরিবেশের পরিচয়ের দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি বাংলা সাহিত্যের এই দুই বিশিষ্ট পুরুষের সম্পর্কের প্রকাশ বলেও মূল্যবান।"৩৩

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় যখন জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ সেরে উঠেছিল, তখনই সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। দাদার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং জ্যোতিষকে চিঠিতে লেখেন—

'তোমার পিতা কেমন আছেন? তাহার সম্বন্ধে লিখিবে। রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। খরচপত্রের অকুলান হইলে আমাকে লিখিবে।"

উক্ত পত্রাংশ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমের যে ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে তা অনায়াসলক্ষণীয়। তাঁর ভালোবাসার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পৃক্ত হলেও তা বঙ্কিম পালনীয় বলে বিশ্বাস করতেন। পিতার মৃত্যুর পর বঙ্কিম সঞ্জীবচন্দ্রকে পিতৃবৎ বলে মনে করতেন। এরূপ ভ্রাতৃপ্রেম বিরল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আসলে সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভ্রমর ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক।

সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্কিমচন্দ্রকে যে খুবই স্নেহ করতেন, তারও যথেষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন। পিতা যাদবচন্দ্র নিজের বিষয়সম্পত্তি উইল করে পুত্রদের পৃথকান্ন করে দেন। যাদবচন্দ্রের উইল অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র পৈতৃক বসত বাটি থেকে বঞ্চিত হন। স্বভাবত শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হন। তখন সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বাড়ির অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের একটি অংশে বাস করতেন। সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রীতিপরবেশ ও উদারতা তাঁর চরিত্রের একটি বড়ো গুণ হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। আরো লক্ষণীয় যে, তাঁর পরিবারের যারা শত্রু, যারা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ও বিরুদ্ধাচরণ করেছে,

সেই সব অনিষ্টকারীদেরও তিনি বাড়ীতে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কাঁটালপাড়া নিবাসী প্রতিবেশী রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ ভট্টাচার্য যাদবচন্দ্রকে জাল সাজ বলে, এই দুই মোড়লের প্ররোচনায় প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁদের ৪ ভাইয়ের নামে মিথ্যা মামলা রুজু করে। বঙ্কিমচন্দ্র যাদের ক্ষমা করেননি, সঞ্জীবচন্দ্র সেই সমস্ত বদলোকেদের অসময়ে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে উদারতার পরিচয় দেন। একদিন রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে তার পুত্রবধু ঝাঁটা দিয়ে মারতে আসে তখন সে গলায় ছুরি দিতে যায়। সঞ্জীবচন্দ্র তাকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করে বাড়ীতে স্থান দেন, যদিও ঘৃণায় ও মনোকষ্টে আশ্রিত রামকৃষ্ণ সাতদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে প্রধান ধর্মই ছিল পরোপচিকীর্ষা।

"তুমি কাহারও হিংসা করিবে না, কাহারও অনিষ্ট করিবে না, কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তুমি সাধ্যমত তাহার উপকার করিবে, তোমার বামগণ্ডে চড় মারিলে, তুমি দক্ষিণগণ্ড বাড়াইয়া দিবে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিবে, সকল ধর্মের এই একরূপ উপদেশ।"[৩৪]

পরিবারের সমস্ত ছেলেমেয়েদের প্রতি যেমন তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা, দরদ ও স্নেহ ছিল, তেমনি কর্মচারীদের প্রতি তাঁর সমান দরদ ও অনুকম্পা ছিল। বঙ্গদর্শনের ম্যানেজার উমাচরণ ও বাড়ীর সাধারণ কর্মচারী উমেশের প্রতি তাঁর সমমমত্ব লক্ষ্য করার মত। জ্যোতিষকে লেখা একটি চিঠিতে সেই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"উমেশ দুইদিনের ছুটি চাহিয়াছিল। তাহা দিতে বিলম্ব করিবা না। উমেশ পরিশ্রমী, তাহাকে যত্ন দেখাইবা।"

"তোমার উমাচরণ দাদার বড় কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমি কি করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কোনরূপ যে সাহায্য করিতে পারি, এমন উপায় দেখিতেছি না।"

একথা অনস্বীকার্য যে, সঞ্জীবচন্দ্রের মতো সরল ও উদার সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষ খুবই দুর্লভ। তিনি মনে করতেন—'অর্থদান, অনুদান প্রভৃতি সৎকার্য এই সংসারের জন্য, দয়াদাক্ষিণ্য এখানেই উপকারক।'[৩৫]

অভাব-অনটন রোগশোক হাসি অশ্রু চুকিয়ে তাঁর জীবনাবসান হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।

মৃত্যুর ৩/৪ বছর পূর্বে 'পরকাল' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ বঙ্কিম-জামাতা

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'পরকাল' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এই প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেন—সদ্বৃত্তিই জীবনের মূল কথা। সদ্বৃত্তি থাকলেই পরকাল ভাল হয়। হয়তো তাই। সঞ্জীবচন্দ্রের সদ্বৃত্তিগুলি তাঁর জীবকোষের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত ছিল, তাই তাঁর দেহনাশের একশো বছর পরেও তিনি জীবিত আছেন। "সদ্বৃত্তি না থাকিলে দেহনাশের সঙ্গে আমরা নষ্ট হই, সেই দেহনাশই আমাদের যথার্থ মৃত্যু। আর সদ্বৃত্তি থাকিলে আমরা দীর্ঘায়ু হই, দেহনাশের পরেও জীবিত থাকি।"[৩৬]

বাস্তবিক, সৎপ্রবৃত্তির জন্যই সঞ্জীবচন্দ্র মৃত্যুকে জয় করেছেন।

নির্দেশিকা

১। বঙ্কিমজামাতা কপালীপ্রসন্নর পরামর্শমত তিনি 'আইমুগ প্রকাশিকা' প্রবন্ধখানি রচনা করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের অপ্রকাশিত ডায়েরীর পাতা থেকে এই তথ্য জানা যায়। তাতে লেখা আছে—"15th April-'81)—"on the suggestion of Kopaliprassanna drew out a notification for 'আইমুগ প্রকাশিকা'। (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

২। 'সঞ্জীবনী সুধা': বঙ্কিমচন্দ্র। 'শশধর' পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য।

৩। "তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম। যাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণার্থে ইহা লেখা আবশ্যক যে, তাঁহার জন্মকালে, তিনি গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু, তঙ্গী এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত।"—সঞ্জীবনী সুধা। বঙ্কিমচন্দ্র।

৪। পরিশিষ্টে প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

৫। সঞ্জীবনী সুধা—বঙ্কিমচন্দ্র

৬। ঐ

৭। সঞ্জীবনী সুধা। বঙ্কিমচন্দ্র।

৮। এই সমস্ত তথ্যের original কাগজপত্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

৯। এই সমস্ত তথ্যের original কাগজপত্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

১০। সঞ্জীবনী সুধা : বঙ্কিমচন্দ্র।

১১-১৩। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় এই সমস্ত তথ্য রক্ষিত আছে। পরিশিষ্টে প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

১৪। ১৮৬৮ সালে ডিস্ট্রিক্ট টাউন্স অ্যাক্ট পাশ হয়।

১৫। বারাসতে তিনি পূর্বেকার মতই কৃতিত্বের সঙ্গে চাকরি করেন। বারাসতে যখন থাকেন তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের Registrar (No. 94 of the 7th May 1870-এর চিঠির অংশ) উল্লেখ করা যেতে পারে—I desire to notice among special Registrar Baboos and Sunjib Chatterjee for the energy and care they have displayed."

১৬। চিঠিখানি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

১৭। চিঠিখানি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

১৮। সঞ্জীবনী সুধা : বঙ্কিমচন্দ্র।

১৯। সঞ্জীবনী সুধা : বঙ্কিমচন্দ্র

২০। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় এই তথ্য আছে। প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২১। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় এই তথ্য আছে। প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২২। জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ—প্রসঙ্গ : বঙ্কিমচন্দ্র।

২৩। আধুনিক সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ।

২৪। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন।

২৫। গ্রন্থকারের ভূমিকা—সঞ্জীবচন্দ্র (১ম সংস্করণ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭)।

২৬। সঞ্জীবচন্দ্রের ভূমিকা—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৭। পালামৌ গ্রন্থপরিচিতি—ওরিয়েন্ট সংস্করণ—বনফুল।

২৮। সঞ্জীব সাহিত্য সমালোচনা। চন্দ্রনাথ বসু।

২৯। কীর্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়—সঞ্জীবচন্দ্রের জ্ঞাতি ভাইপো।
চিরণ—চিরঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষের পুত্র।
অনিল—অনিল সুন্দরী, জ্যোতিষের কন্যা।
রাধানাথ—রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক

৩০ চিঠিখানি ঋষি বঙ্কিম পাঠাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

৩১। চিঠিখানি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

৩২। বঙ্কিমচন্দ্র কোলকাতা থেকে ২৭।১২।৮৭ তারিখে সঞ্জীবচন্দ্রকে এই চিঠি লেখেন।

৩৩। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত: চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৫৭।

৩৪। সঞ্জীবচন্দ্র: ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম, বঙ্গদর্শন (বৈশাখ, ১২০৭)

৩৫। ঐ

৩৬। সঞ্জীবচন্দ্র: পরকাল (প্রচার, মাঘ, ১২৯২)।

সমকালীন দেশ ও কালের পটভূমিকায় সঞ্জীবচন্দ্র

(সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ)

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকাল। এই কালসীমার মধ্যে (উনবিংশ শতাব্দী) বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় জীবনে কি বিপুল রূপান্তর ঘটেছিল, তা পিছনের ইতিহাসের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রসারের ফলে বাংলার জনজীবনে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব (১৭৫৭-২৩শে জুন) থেকেই এই রদবদল দেখা দিয়েছিল। গ্রামীণ জীবন থেকে নাগরিক ও বণিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায়, বিদেশী পণ্যের আমদানী ও দেশীয় কাঁচামালের রপ্তানীর ফলে, বিভিন্ন বিদেশী বণিকের কুঠি প্রতিষ্ঠা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভে (১৭৬৫) আমাদের দেশের এযাবৎকালের অর্থনৈতিক কাঠামো পাল্টে যায়। সমাজে নতুন শ্রেণী জন্ম নেয় এবং শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই সময়ে রাজস্ব আদায় ও উপভোগ—দুইই পুরাদমে চলে। জনগণ অকথ্য-রূপে শোষিত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের'[১] (১১৭৬, ইং ১৭৭৮) ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যায়। দেওয়ানী কর্তৃক তৈরী কর্মচারীদের অর্থলিপ্সা বেড়েই চলে। ব্রিটিশ কর্মচারীগণ সমকালীন বাঙালিদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসই সর্বপ্রথম বিদেশী শাসকদের দেশিভাষা শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী এন. বি. হ্যালহেড "A Grammer of the Bengali Language" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণের প্রকাশ উপলক্ষেই বাংলা মুদ্রণযোগ্য অক্ষরের প্রথম পত্তন করেন স্যার চার্লস উইল্কিনস্।

আবার স্যার উইলিয়াম জোন্সের সময় থেকেই ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারলাভ করে এবং এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৭৪) স্থাপিত হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। তাঁরই আমলে সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড

ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যে নবযুগের সূচনা লক্ষিত হয়। ঐ সময়েই শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামপুর মিশনের উদ্দেশ্য ছিল— এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী ও বিদেশী ভাব ও ভাষার জ্ঞান সঞ্চারিত করা। তাছাড়া এইসময় বাইবেলের বাংলা অনুবাদ (ম্যাথিউএর মঙ্গল সমাচার) প্রকাশিত হয়।

এই সময়ের (১৮০১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরী বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। এদেশীয় ভাষা, ইতিহাস ও আচার ব্যবহার জানাও ফোর্ড উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের আবশ্যক হয়েছিল। কেরীর[২] চেষ্টায় গদ্যরচনার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়।

ফোর্ড উইলিয়ম কলেজের বাংলা গদ্য লেখকদের মধ্যে প্রথম ছিলেন—রাম রাম বসু। বাংলা গদ্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ—'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' তাঁরই রচনা। গ্রন্থখানি ফোর্ড উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়।

এই সময়েই কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকে। বাংলা লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রচিত ৪ খানি পুস্তকই ফোর্ট লইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়। (১) বত্রিশ সিংহাসন ১৮০২ খ্রীঃ, (২) হিতোপদেশ ১৮০৮ খ্রীঃ, (৩) রাজাবলি—১৮০৮ (৪) প্রবোধচন্দ্রিকা—১৮১৩ খ্রীঃ। বিদ্যালংকারের 'রাজাবলি' ভারতীয়দের রচিত প্রথম আধুনিক ইতিহাস। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রকাশের একবছর আগে কবি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২ খ্রীঃ) জন্ম হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরেই আলোচ্য যুগে বাংলা গদ্যের গঠনে 'স্কুল বুক সোসাইটির' কথাও স্মরণীয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ জন বিদেশী আর ৮ জন দেশীয় সদস্যকে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। বিদেশী সদস্যদের মধ্যে কেরী, আর দেশীয় সভ্যদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র এবং রামকমল সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন প্রধান। ফোর্ড উইলিয়ম কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের মূল্য এত বেশী ছিল যে দেশীয় ছাত্রদের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না, তাই 'স্কুল বুক সোসাইটি' যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে পাঠ্যপুস্তকের প্রণয়ন ও প্রচার করার ব্যবস্থা করেন।

এইসময় মধ্যবিত্ত সমাজে শিক্ষায়দীক্ষায় নতুন আলোড়ন সূচিত হয়। নতুন আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত

হয়। কিছু দিন পরেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'স্কুল সোসাইটি' স্থাপিত হয়। দেশের নানাস্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই সোসাইটির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সময়েই (১৮১৮ খ্রীঃ) শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের প্রতিষ্ঠা ও 'দিগদর্শন' (মাসিক) 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক), 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। এই পর্বকেই বাংলা গদ্যে সাময়িক পত্রের যুগ বলা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (১৮২০ খ্রীঃ) জন্মের পরের বছরে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কর্তৃক 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ'-এর হিন্দু বিরোধী প্রচারের বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী'র আবির্ভাব। রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেই আন্দোলনের প্রতিরোধের জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সামাজিক আলোড়নের মধ্যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের গদ্যপ্রচেষ্টা থেকে আরম্ভ করে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' পর্যন্ত মানবিকতাবোধের পরিধি যেমন অনায়াস-স্বীকার্য, তেমনি সাময়িকপত্রের আবির্ভাবের ফলে সামাজিক জীবনের গতিশীলতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং আরও পরে অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সংস্কারের ফলে ব্যক্তির আত্মবোধ আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে (মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র) ব্যক্তির সৃষ্টিধর্মী অনুরাগের দিক উদ্ভাসিত হয়। নাট্যসাহিত্যে ব্যক্তির (মধুসূদন-দীনবন্ধু) একক জীবনের সংকট অপেক্ষা সমাজজীবনের সংকটই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

আরও লক্ষ্যণীয় যে, যাত্রার প্রভাব উনিশ শতকের প্রথম থেকেই মানব-জীবনের নিবিড় সংস্পর্শে এসে পড়েছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা' ও 'নল দময়ন্তী'র যাত্রা' অভিনয় সমকালীন জনচিত্তকে আকৃষ্ট করে। অবশ্য ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে দিয়েই যাত্রার পটভূমি বিবর্তিত হয়।

সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪ খ্রীঃ) জন্মের কয়েকবছর পরেই রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সালেই তিনি 'ব্রহ্মোপসনা' ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রচনা করেন।

ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। (এক)

স্বজাতি ও স্বজনদের অন্ধ সংস্কারে আঘাত দেওয়া, (দুই) বিদেশী ধর্মযাজকদের হিন্দুধর্মের প্রতি অকারণ কটাক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। রামমোহনের — 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' রচনায় সহমরণ নিবারণার্থে তাঁর যুক্তির প্রাচুর্য লক্ষণীয়।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিংক আইনের দ্বারা 'সহমরণপ্রথা নিরোধ বিল' পাশ করায় সমাজজীবনে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক সমাচারপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ গুপ্ত কবি তাঁর জাতিপ্রেম নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র বলে চিহ্নিত হয় এটি। সেকালের সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কারে এই পত্রের অবদান ছিল সমধিক। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক সাময়িক পত্র 'জ্ঞানোদয়'। এর সম্পাদক ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। আলোচ্য পত্রিকাটি সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'বিজ্ঞানসেবধি' প্রকাশ করেন হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র গঙ্গাচরণ সেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও হিন্দু কলেজের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় জ্ঞানের পরিধি সর্ববিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনচিন্তায় উদ্দীপ্ত করে তিনি ছাত্রদিগকে ধর্ম, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পড়াশুনা করবার উপদেশ দিতেন। বলা বাহুল্য, এই সময় থেকেই নতুন সমাজ গঠনের কাজ সুরু হয়েছে। ব্রিটিশ বণিকতন্ত্রের অন্তরালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবাহিত হয়। একদিকে পুরাতন সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তি, অন্যদিকে ব্যক্তিমনের অবাধ স্বাধীনতার স্পৃহা নতুন চেতনার বাস্তব প্রকাশ। এই পরিবেশে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেন্টিংক-এর আদেশে ইংরাজি ভাষাশিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতিলাভ করে। এদেশের মানুষকে ইংরেজ-আচার আচরণ, রীতি-নীতি ও শিক্ষাদীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং গণমানসে ইংরেজ চেতনা প্রবেশ করানোর চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়।

অন্যদিকে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়। সপ্তাহে তিনটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সালেই পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জন্মলাভ করেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আকার ধারণ করে। এই সালেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে 'তত্ত্ববোধিনী' সভা স্থাপিত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশি হয়। এই পত্রিকাটি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষা ও ব্যক্তিত্বকে একত্রে সংবদ্ধ করেছিল।[৩]

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষরা পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই পুস্তকটি ছাপেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ সুধাংশু' প্রকাশিত হয়। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সর্বাগ্রগণ্য,[৪] ছিলেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্টিত হয়। এইটিই বাংলায় প্রথম স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে রাজেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র সেই যুগে আর এক স্মরণীয় গদ্যলেখক ছিলেন। এই সময়েই ইঙ্গভারতীয় সামাজিক ব্যবধান প্রকটভাবে দেখা যায় এবং শ্বেত-কৃষ্ণ বৈষম্য সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে একটি নক্সা রচিত হয়—বিদেশিনী লেখিকা হানা কাথেরীনা মলেন্‌স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। এছাড়াও আলোচ্য খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' ইংরেজি আদর্শে লেখা সর্বপ্রথম কমেডি।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ও হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র ঘোষের নাকটটি শেক্‌স্‌পীয়রের 'Merchant of Venice' অবলম্বনে লেখা।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে সহজ ভাষায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের সূচনার পূর্বেই বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা গদ্যে গতি ও ভাবমাধুর্য সঞ্চার করেছিলেন। তাছাড়া, এই সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক ও রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' এবং তারাশংকর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হয় এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি 'বিধবা বিবাহ' প্রকাশিত হয়। 'বিধবা বিবাহে'র বৈপ্লবিক চেষ্টার প্রতি কেবল নিষ্ক্রিয় নৈতিক সমর্থন নয়—সক্রিয় উদ্যমে আকুল হয়েছিল তাঁর সমগ্র রচনা। বাংলার

নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে (১৮২৫-১৮৫৭) বাংলা নাটকে দেশীয় সমাজধর্ম ও রাজনৈতিক দুরবস্থা ও সমস্যা, সামাজিক কুপ্রথা অনাচার, রুচির বিকার ও নব্যশিক্ষার উচ্ছৃংখলতা সমকালীন যুগের প্রতিচ্ছবি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ সুরু হয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের এই ব্যাপকতার যুগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' মুদ্রিত হয়। এই সময় থেকেই শিক্ষিত বাঙালি তথা জাতীয় জীবনে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠে। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে ও উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভিক্‌টোরিয়া ভারত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোম-প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ) 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' দেশীয় লোকের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি স্পৃহা ও মনোবল বাংলার রাজনৈতিক পরিসরে আলোড়ন এনেছিল।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুতে একটি ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত যুগের অবসান। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সার্থক মুক্তি ঘটেছিল মধুসূদনের হাতে। তিনি লিখলেন সেই সময় 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। অন্যদিকে নীলবিদ্রোহ প্রবলাকার ধারণ করে। ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক জাগরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অবশ্য স্বীকার্য। মনে হয় সমকালীন যুগের নীল হাঙ্গামা সঞ্জীবচন্দ্রকে গোপনে সচেতন করেছিলো। এই সময়েই দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিসাহিত্যিকগণ যুগচেতনায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। বস্তুত, কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথমে ঈশ্বর গুপ্ত[৫] ও পরে মধুসূদনের মধ্যে জটিল সমাজপ্রবাহ মূর্ত হয়। সমকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় ছাপ এই যুগের কাব্যে সুস্পষ্ট। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবি মধুসূদনের 'তিলোত্তমা' সম্ভব কাব্য, দুখানি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'[৬] এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। এই সময়ের অধিকাংশ নাটকই সমাজ জীবনের সংকট ও সমকালীন যুগের অন্তর্দ্বন্দ্ব চিহ্নিত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রকাশিত এবং তাঁর রচনায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়

লক্ষণীয়। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। এই বৎসরেই রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন ও মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে যেমন একদিকে গদ্যসাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নকসা' প্রকাশিত হয়, তেমনি অন্যদিকে বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতি-কবিতা সংগ্রহ 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশিত হয়। 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র মধ্যে বাংলা উপন্যাসের পূর্বাভাস সূচিত হয়। বিহারীলালের মধ্যে কবির মন্ময়ভাবনার স্বভাবমুক্তি আভাসিত। প্যারীচরণ সরকার কলকাতায় ১৮৬৩ সালে সুরাপানের কুফল প্রচার করেন এবং উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় বাঙালী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময়ে (১৮৬৪) সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম ইংরেজিতে লেখা 'বেঙ্গল রায়ত' নিয়ে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। রায়তদের উপর অত্যাচার সঞ্জীবকে বিচলিত করেছিল। সঞ্জীব-বঙ্কিম সমকালীন যুগে শিক্ষিত পণ্ডিতের পক্ষে বাংলাচর্চাকে হীনবৃত্তি মাত্র বলে গণ্য করতেন। সম্ভবত সঞ্জীবচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন বলেই 'বেঙ্গল রায়ত' ইংরেজিতে লেখেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য বাংলা উপন্যাসের উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথ 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই সূচিত হয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজও এই গ্রন্থে স্বীয় মানসের পরিচয় আবিষ্কার করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়। হিন্দু-মেলার প্রথম অধিবেশন সুরু হয়। স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করা হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। এই মেলার মধ্য দিয়ে দেশের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের আভাস উদ্ভাসিত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধসাহিত্যের জন্ম-পীঠ 'বঙ্গদর্শন'। ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি রচনাসমষ্টি এই যুগের মানসিক আলোড়নের ফসল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনাবসান ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় (ঢাকা) 'বান্ধব' পত্রিকা, রাজনারায়ণ বসুর যুগপ্রসিদ্ধ 'সেকাল ও একাল', অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর আখ্যান-

কাব্য—'উদাসিনী কাব্য'[৭] রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটক প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ও নাটকে সাহিত্যিকগণ সমকালীন যুগের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার' (১ম), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশলাভ করে। এই সালে রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু মেলার উপহার' কবিতাপাঠ উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্র একই সালে 'বঙ্গদর্শনে' 'যাত্রা', প্রবন্ধটি লিখতে শুরু করেন। ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ও রাজনৈতিক সচেতনতা হেমচন্দ্রের কাব্যে চিহ্নিত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যে বাংলার পরাধীনতার ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুই অঙ্গীভূত হয়েছিল। বাঙ্গালীর স্বজাতিত্ববোধ ও হিন্দুত্ববোধে তিনি সমার্থক ছিলেন। এই বছরেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সালেই নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণকল্পে Dramatic performance control Act বিধিবদ্ধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীসহ জীবনী প্রকাশ করেন। এই সময়েই সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ দেশনায়কগণ ব্রিটিশ সরকারের পতন ঘটাতে প্রতি-শ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর গৃহে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ দেশনায়কেরা মিলিত হয়েছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'কণ্ঠমালা' প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রজনী' লেখেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্র (১২৮৪, বৈশাখ) 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়েই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমঅবনতি চরমে পৌছোয়। বাংলা বিহার তথা সমগ্র ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। একদিকে ঘরে ঘরে হাহাকার, অন্যদিকে দিল্লীর দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সাম্রাজ্ঞী' উপাধিদানের সমারোহ লক্ষণীয়।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল কাব্য' প্রকাশিত হয়। সারদা তাঁর কাছে 'কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' প্রকাশিত হয়। 'আনন্দমঠ'[৮] উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার বাস্তবচিত্র এবং সমাজবিপ্লব ও বিদ্রোহের কাহিনী অনুস্যূত হয়েছিল। ঐ সালেই রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' লিখে বাংলাসাহিত্যের

আসরে রোমান্টিক হাওয়া নিয়ে উপস্থিত হলেন। এইসময়ে হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Principles of Sociology VII II' ও 'Data of Ethics' গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাব পরিলক্ষিত।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ চেতনার সীমাবদ্ধতা থেকে বিশালতার প্রাঙ্গণে মুক্তিলাভ করলেন 'প্রভাত সঙ্গীতে'। একই সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র দশম সংস্করণ এবং সঞ্জীবচন্দ্রের বিখ্যাত ইতিহাস-আশ্রিত আখ্যায়িকা 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রকাশিত হয়। এই সময়েই 'নব্যভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র সমকালীন পরিবেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র অঙ্কনে সার্থকশিল্পী।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মচিন্তার সঙ্গে স্বদেশচিন্তা তাঁর 'জীবনবেদে' ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই সালেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের ১ম ও ২য় সংস্করণের প্রকাশ লক্ষণীয়। ঐ সময়ে তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কমলাকান্ত' প্রকাশিত হয় এবং বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেশবচন্দ্র-বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার সঙ্গে স্বদেশচিন্তার প্রভাব সমকালীন যুগকে আপ্লুত করেছিল। সঞ্জীবচন্দ্রও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধটি তারই প্রমাণ।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ লাভ হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে জনচিত্ত জ্ঞানভক্তিকর্মের একটি সমন্বয়ী সত্তা লাভ করেছিল। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তখন একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্কিম-সঞ্জীবচন্দ্র এব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এই সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত' (প্রথমভাগ) ও নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' ও রবীন্দ্রনাথের 'কড়িওকোমল' প্রকাশিত হয়। এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রের 'পরকাল' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'প্রচার' পত্রিকায়। ব্যক্তিমনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজমানসও এই যুগে বিস্তৃতিলাভ করে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। এই সালেই রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক গ্রন্থে তাঁর মনীষা ও গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। এই সময়েই শ্রেয়োবোধের

তাড়নায় সমাজকে চঞ্চল করেছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' ভক্তিরসের নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ অনুশীলন প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের 'পরকাল', 'বিবাহের ঘটকালি' প্রভৃতি প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন জীবনের ছায়া পড়েছে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের 'সাধের আসন', কবি কামিনী রায়ের 'আলোছায়া' ও গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'—সামাজিক নাটক প্রকাশিত হয়। এই সময়টা চলছিল বঙ্কিমপ্রভাবের যুগ। এই বছরেই বঙ্কিমযুগের অন্যতম সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই হলো সঞ্জীবচন্দ্রের সমকালীন যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিণতির পরিচয়। সঞ্জীবচন্দ্রকে জানতে হলে বাংলা সাহিত্যের এই বিবর্তনের লক্ষণগুলি উন্মোচিত করা একান্ত অপরিহার্য। যদিও এই বিবর্তনের ইতিহাস এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার এরূপ সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবু এইকালে কিভাবে সামাজিক আলোড়নে বাংলা কাব্য, শিল্প ও নাট্যসাহিত্যের দ্রুত বিকাশসাধন লাভ করেছিল তা বিস্ময়কর। কারণ 'রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সামাজিক বা নাগরিক অধিকার, সমাজবিন্যাসের ভিত্তি, ধর্মাচরণের যৌক্তিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক সুবিধা আদায়ের আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থসমৃদ্ধির সহায়তা করিলেও, পরোক্ষে ইহা এমন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যাহার সৃষ্টিধর্মী প্রভাব গণজীবনেও অনুভূত হয়।"[৯] সঞ্জীবচন্দ্র সমকালীন এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে-ওঠা এক শিল্পী।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর উল্লিখিত সমস্ত ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে আমরা সেই যুগের যেমন সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক চিত্র খুঁজে নিতে পারি, সেইসঙ্গে শিক্ষা ও ধর্মক্ষেত্রে যে মানসিক আলোড়ন এসেছিল, তারও পরিচয় পাই। বিশেষ করে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের ফলে দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, 'সমাচারচন্দ্রিকা,' 'বঙ্গদূত,' 'সংবাদ প্রভাকর,' 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এই কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এই সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে তৎকালীন সামাজিক, অর্থ নৈতিক পটভূমিকা উদ্ভাসিত হয় এবং গদ্যের সহায়তায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষাবিদদের বিচিত্র প্রবন্ধ বা উপন্যাস। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকে বলা হয় যুক্তির যুগ ও গদ্যের যুগ। দেখা যায়, এই

যুগেই রামমোহন, অক্ষয়কুমার, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ধর্ম ও সমাজসংস্কারকগণ তাঁদের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষামূলক রচনাগুলি লেখেন। এই যুগেই লক্ষণীয় যে বিধবাবিবাহ রদ আইন প্রবর্তন হয়। এই যুগেই ইংরাজ আগমনের সুফল ও কুফল সিপাহী বিদ্রোহ, নীল হাঙ্গামা, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি রাজনৈতিক আবর্তনে উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রামের মানুষদের গ্রামীণ থেকে নাগরিক ও বণিক হওয়ার আকাংক্ষা দেখা যায়; বিদেশী পণ্যের আমদানী ও দেশীয় কাঁচামালের রপ্তানী, বিভিন্ন বিদেশী বণিকদের কুঠি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে এদেশে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে গিয়েছিল। তাছাড়া, ধর্মের ক্ষেত্রে নবজাগরণ লক্ষণীয়; ইংরাজদের খৃষ্ট ধর্মপ্রচার, হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা, ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ও প্রভাব দারুণ আলোড়ন এনেছিল। ১৮৩৫ খ্রী: মেকলের চেষ্টায় ইংরেজি ভাষা একমাত্র সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতিলাভ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে তার গ্রহণ ও বর্জন নিয়ে জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। চিন্তায়, ভাবনায়, ধ্যান-ধারনায়, আত্মনিরীক্ষায়, বুদ্ধিমত্তায় গ্রামীণ সমাজ যখন নাগরিক সমাজে উন্নীত হচ্ছে, মধ্যবিত্ত চাকুরেশ্রেণী ইংরেজী শিক্ষিত হয়ে নানা বৃত্তিমূলক জীবিকার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছে, সাময়িকপত্র ও গদ্যের উদ্ভব ঘটেছে, ব্যক্তিমানস স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে যখন, তখনই সৃষ্টি হয়েছে প্রবন্ধ ও উপন্যাস। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ আত্মমগ্নতার যুগ। তখন বাঙালী হিন্দুসমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে পাশ্চাত্যজাত রোমান্টিক ভাববিলাসিতা বর্তে ছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টিয় শাসনব্যবস্থার প্রতি শিক্ষিত সমাজের আস্থা কম ছিলনা। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে এই শতাব্দীর জীবন-জিজ্ঞাসার সার্থক প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় আরো অনেকের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের কথা ভুললে চলবে না। বিংশ শতাব্দীর ধর্মআন্দোলন সাধারণ মানুষের মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারও দলিল তিনি রেখে গেছেন তাঁর 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, বৈশাখ)। বাংলার কৃষকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল প্রগাঢ়, রায়তের প্রতি ইংরেজ শাসনের অবিচার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল, কৃষক-কুলের দুরবস্থা এবং প্রজারা যাতে সুবিচার পায় তারই জন্য ৩০ বছর বয়সে অনলস পরিশ্রম করে রচনা করেন—'Bengal Ryots their Rights and Liabilities', এই পুস্তকখানি সঞ্জীবচন্দ্রের শুধুমাত্র সামাজিক চেতনার ফসল

নয়, রাজনৈতিক চেতনারও ফল এই পুস্তকে অগণিত কৃষকদের জমিজমা সংক্রান্ত অবিচারের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসককে অবহিত করা ও ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার ব্যবস্থার ফল বর্ণনা করা হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের 'Bengal Ryot, বইখানি উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সংক্রান্ত দলিল বললে অত্যুক্তি হবেনা। সমালোচকের ভাষায়—"The author made extensive use of official records and judicial pronouncements. He analysed the provisions of the great Rent Act of 1859 and its impact on the peasantry". [১০]

বস্তুতঃ, তাঁর 'Socio-Economic history' চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীকে আশ্রয় করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের প্রহসন বর্ণনা করেছেন 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এর কাহিনীতে। কিন্তু 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এর মামলায় পরাজয়ের কাজ—'ধর্মবোধ'। তিনি 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে এক জায়গায় (পৃঃ ২২০) উল্লেখ করেছেন—"ধর্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম মিথ্যা।"[১১] এই প্রসঙ্গে তাঁর "ভবিষ্যৎ হিন্দু ধর্ম" প্রবন্ধটি উল্লেখ করতে পারি। তিনি ঐ কালের বিভিন্ন ধর্মের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে বোধহয় এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সেই যুগের ধর্মসাধক ও সংস্কারকের কার্যপ্রণালী সঞ্জীবচন্দ্র সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেছিলেন; তাঁর ভাবনার মধ্যে যে ভারতীয় ধ্যানধারণা উদ্ভাসিত হয়েছিল তা শুধুমাত্র বাঙালীর সংকীর্ণ ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি, ধর্মের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল; অনুকরণপ্রিয় ছিলেন না তিনি, তাঁর নিজস্ববোধ ছিল। তিনি 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম'[১২] প্রবন্ধে বলেন—"মনুষ্যের ভিতর মনুষ্য আছে, এই অনুভব ভারতবর্ষে প্রথম উত্থাপন হইল। উত্থাপিত হইবামাত্রই নতুন এক ধর্ম স্বতঃউপস্থিত হইল। মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে, এই অনুভবের সঙ্গে ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ নরক পাপ পুণ্য আনুষঙ্গিক কথা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল. একে একে তাহা সমুদায় অনুভব হইয়া নতুন ধর্মের উৎপত্তি হইল। যে ব্যক্তি আত্মাবাদ স্বীকার করিল, তাহাকেই সেই নতুন ধর্ম গ্রহণ করিতে হইল। পৃথিবীর যাবতীয় বিচক্ষণ জাতি প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া একে একে সকলেই এই আত্মমূলক নতুন ধর্ম গ্রহণ করিল।"[১৩]

—উদ্ধৃতিটি সঞ্জীব প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই যুগে প্রচলিত ধর্মে বিচ্ছিন্নতা-বাদ দেখে তিনি আরও বললেন—"এই সংস্কারের সংস্কারক নাই। এবারকার কে চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর নাই। কোন পরামর্শ নাই, যত্ন নাই, উদ্যোগ নাই অথচ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্মযাজক নাই ধর্মপ্রচারক নাই কোন গ্রন্থ নাই অথচ ইহার কার্য হইতেছে।"[১৪]

সঞ্জীবচন্দ্রের বিশ্লেষণশক্তির সার্থকতা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

সঞ্জীবচন্দ্র সমাজমনস্ক লেখক ছিলেন। সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও উন্নতিকল্পে তাঁর মনোভার স্পষ্ট ছিল। বক্তব্যপ্রকাশের ঋজুতা ও অকুণ্ঠতা তাঁর রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। 'যাত্রা' 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে মানুষের রুচি ও কুরুচি বিষয়ে তাঁর মুক্তচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রা প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের উন্নত সাহিত্যরুচি ও জীবনদৃষ্টির পরিচয় মেলে। বাংলা নাটক সম্পর্কে তাঁর মনোভাব—"একালের পুঁজি কেবল নাটক। তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, তাহা যে কিছুই নহে, একথা কেহ এখন বুঝিবে না, কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপযোগী। মূলকথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উত্তর-প্রত্যুত্তর নহে, উপন্যাস নহে, যাহা লইয়া নাটক তাহা বাঙ্গালীর অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজা কার্যকারিতা, সে কার্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, তাহা জাতিগত ও সমাজগত। সে কার্যকারিতাশক্তি আমাদের কই"?[১৫] 'কণ্ঠমালায়' যাত্রাপ্রসঙ্গে বিনোদের মুখ দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"কেহ বলিয়াছেন বাল্যবিবাহ মহাপাপ কেউ বলেন ইহা মহাপুণ্য ইহাতে গৌরীদানের ফল হয়"।[১৬] তিনি আরো বলেন—"ইংরেজি বিবাহের সহিত তুলনাই এই দলাদলির মূল বলিয়া বোধ হয়।"[১৭] তিনি মনে করতেন—ইংরাজদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহাই এদেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলে মনে হয় না। তিনি 'বাল্যবিবাহ এর পক্ষে মত পোষণ করেন, কারণ, এদেশে মেয়েরা সাধারণত ১৩-১৪ বছর বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। যথাসময়ে বিয়ে না দিলে কুপথে যেতে পারে' তার ফলে সমাজের ক্ষতি হয়। তাই বিজ্ঞ ইংরাজদের সমস্ত কিছু নিয়ম-কানুন জোর করে এদেশের সমাজের বুকে চাপিয়ে দিলে তা মঙ্গলকর হয় না।

'ভ্রমর'-এ প্রকাশিত 'একঘরে' (১২৮১, শ্রাবণ) সমকালীন সামাজিক

জীবনের দর্পণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের মানুষেরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক হয়েছিল, তারই চিত্রণ আলোচ্য প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়। তিনি সেই যুগের সমাজের জ্বলন্ত চিত্র অংকন করেছেন। লেখকের বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—'আমাদের যে দূরদৃষ্টি নাই। আমাদের দৃষ্টি কেবল আপনার উপস্থিত স্বচ্ছন্দতার প্রতি, কেবল আপনার ঘরের প্রতি।' কিন্তু যখন "কোন জমিদার বা নীলকর আমাদের প্রতিবাসীকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেলে অথবা অন্যপ্রকার পীড়ন করিলে, আমরা কোন কথাই কহিনা।"[১] প্রকৃতপক্ষে এই অর্থে আমরা একঘরে। জমিদারদের শোষণ, নীলকরদের অত্যাচার সেই যুগকে পীড়ন করত, তারই কথা বলা হয়েছে; অথচ আমাদের একতা ছিলনা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার। তাই তিনি বলেছেন—"একতা এবং পরস্পরের সহায়তা সমাজের মূল। একতা না থাকিলে বলিষ্ঠও দুর্বল।"[১৯] (একঘরে)

'দামিনী' গল্পে[২০] সঞ্জীবচন্দ্র সামাজিক দুর্দশার কথা উলেখ করেছেন। গ্রামের মানুষের পরস্পরের সহানুভূতি, অনুকম্পা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে ইংরাজ আগমনে। সাধারণ মানুষ স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল এই কালে। প্রতিবাসীরা নিজের ভালমন্দে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফলে বাংলার 'বাসগৃহতল' প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল, একথা অস্বীকার করার নয়। 'দামিনী'-তে লক্ষ্য করা যাবে অদিতি ভট্টাচার্যের পুত্রবধূকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে ফৌজদারের পুত্র কিন্তু প্রতিবেশীরা এতটুকু উৎকণ্ঠা বোধ করে না, দুঃখ নেই, পরের ঘরে আগুন লাগলে নিজের ঘরও পুড়ে যায়' এমত বোধ হয় না পাড়াপড়শীর। সঞ্জীবচন্দ্রের বেদনাবোধ সেখানেই—"পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল। গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল—হিন্দুর হিন্দুত্ব যায়, সকলে উঠ, সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। অদিতি ভট্টাচার্যের সর্বনাশ হয়, একবার সকলে উঠ ......

"কেহই উঠিল না। কেহ বলিল—'যাউক শত্রু হতে পারে, কেহ বলিল—পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে? কেহ বলিল—অদিতির সর্বনাশ হয় যদি, তাহাতে আমার কি ক্ষতি"? একটি পরিবারের সর্বনাশের মধ্যে সামাজিক জীবনযাত্রার অধঃপতনের চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১২৮৮ ভাদ্র) সঞ্জীবচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা'

নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল। নাম না থাকলেও লেখাটি সঞ্জীবচন্দ্রের। সঞ্জীবচন্দ্র যখন বারাসতের সাতক্ষীরায় Special Sub-Registrar, বোধহয় সেই সময় সেখানে থাকাকালীন এটি লেখেন। প্রবন্ধের মধ্যে দুটি দিক স্পষ্ট হয়েছে—(১) তিনি মনে করেন ইংরাজ রাজার অধীনতাকে দেশের পরাধীনতা না বলে দেশের আভ্যন্তরীণ পরাধীনতাই দেশের পরাধীনতা। (২) দেশের বস্ত্র ও লবণ সংকট এই কালে ভয়ানক দেখা দিয়েছিল। লবণ তৈরী করলে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতেন। এই সময় অর্থনৈতিক সংকট প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বলেন—"বস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গলার পরাধীনতা ঘটিয়াছে। লবণ সম্বন্ধে বাঙ্গালা পরাধীন। সহস্র সহস্র বৎসর অবধি বাঙালীরা সমুদ্রের জল হইতে লবণ বাহির করিয়া লইত। সমুদ্র তাহাতে রাগ করিত না। কেহ কথা কহিত না। এখন কথা কহিবার লোক দাড়াইয়াছে।" (বঙ্গদেশের পরাধীনতা)

তখন গ্রামে গ্রামান্তরে অর্থনৈতিক বনিয়াদ কিভাবে ভেঙে পড়েছিল সঞ্জীবচন্দ্রের মুখেই তার নিদারুণ চিত্র তুলে ধরা হল। "একদিন (এক ব্যক্তি) দেখিল সন্তানেরা শুধু অন্ন খাইতে পারিতেছে না, অন্ন ক্রোড়ে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে, একটু লবণ পাইলে তাহারা অন্ন খাইতে পারে, কিন্তু লবণের পয়সা নাই।"

—"সন্তানদের চক্ষের জল মুছাইয়া সে ব্যক্তি বাহির হইল। কলাগাছের কতকগুলা শুষ্ক বাস্না সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিল, তাহার ভস্ম একপ্রকার ক্ষার—শেষ তাহাই আনিয়া লবণ বলিয়া সন্তানদের দিল।

"কিছুদিন পরে পুলিশ এ সম্বাদ পাইয়া দরিদ্রকে গ্রেপ্তার করিল। সকলে বলিতে লাগিল—আহা; কেন তোর এ বুদ্ধি ঘটিল? কেন তুই কলার বাস্না পোড়ালি? কেন তুই লবণ করিলি?"[২১]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রণ অতি বাস্তবসম্মতভাবে একটু ব্যঙ্গের স্পর্শ সহ প্রতিফলিত হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র অতি দরদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরনির্ভর মনোভাব থেকে সঞ্জীবচন্দ্র মুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়না। কারণ তিনি সেই যুগের ইংরেজ সরকারের শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি তাঁর 'গৃহসন্ন্যাস' প্রবন্ধে (১২৮৭ চৈত্র) বলেন—

'ভারতবর্ষ অন্তাপি স্বাধীন। সকল দেশের অপেক্ষা স্বাধীন। ক্ষুদ্রেরা এক কথায় হাসিবে, রাজা দেশী কি বিদেশী এই লইয়া তাহারা স্বাধীনতার মীমাংসা করে।"[২২]

সঞ্জীবচন্দ্রের এই ধরনের চিন্তা অবশ্য স্বীকার্য যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে এ ধরনের চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। আধুনিকদের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র হয়তো বিতর্কিত ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হবেন, কিন্তু তিনি স্পষ্টবাদী। কারণ তিনি মনে করতেন—'স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ধন'।[২৩] প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন জিজ্ঞাসার কথা যেন এখানে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ (১২৮৫, চৈত্র, বঙ্গদর্শন)। এই প্রবন্ধটির মধ্যেও সঞ্জীবচন্দ্র উচ্চাকাঙ্খী মানুষের কৌশলের কথা বর্ণনা করেছেন এবং সেই বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অভি-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

'স্ত্রীজাতি বর্ণনা' (ভ্রমরে প্রকাশিত) প্রবন্ধটির মধ্যে উনিশ শতকের নারীমুক্তি চিন্তা লঘু পরিহাসে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রবন্ধের ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে সমকালীন প্রভাব তেমন বিস্তমান নয়। সামাজিক প্রভাব কিছুটা থাকলেও অর্থ নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রভাব কদাচিৎ চোখে পড়ে। 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা', 'দামিনী', 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে সমাজের প্রতিবেশীদের স্বার্থপরতার চিত্রণে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এ তাঁর ইতিহাসপ্রীতি লক্ষণীয়। কিন্তু তাঁর 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চেতনা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজবিবর্তনমূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সঞ্জীবচন্দ্রের আগে কেহ লেখেন নি বলে বোধ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হার্বাট স্পেন্সার (The Principle of Biology) ও ডারউইনের (Variation of Animals এবং Origin of Species) প্রভাব এদেশেও প্রতিফলিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের অপরিসীম আগ্রহ ছিল বলেই তিনি প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের বংশধারা উদ্ধার করেন এবং সেই সঙ্গেই বাংলাদেশের কৌলীন্য প্রথা ও জাতি ও শ্রেণীভেদকে প্রজননবিস্তার সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। 'বৈজিকতত্ত্ব' সমাজবিজ্ঞানজাত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থ। সমাজবিজ্ঞানীদের এরূপ সহায়ক গ্রন্থ বাংলায় প্রথম লেখা হয়। সবদিক থেকে বিচার করলে সঞ্জীবচন্দ্রকে সমসাময়িক দেশ ও কালচেতনায় অনন্যপুরুষ বলে চিহ্নিত করা যায়।

নির্দেশিকা

১। 'Indeed, the misery of the people began not with the reign of inhuman Surajudoula····, but with the transfer of these provinces to the English'.

—The peasantry of Bengal (1874), R.C. Dutta page—42

২। S. K. De : '19th Century Bengali Literature (Ed. 2).

৩। Every great writer of this period of transition was of necessity a politician, a social reformer or a religion enthusiast. (Bengali Literature in the 19th Century, Dr. S.K. Dey, page 57).

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

৫। 'No renowned poet appeared in Bengali in the first half of the present century, and Iswar Chandra (Gupta) was the reigning king of the literature world in his day'

—Literature of Bengal, R.C. Dutta.

৬। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে নীলবিদ্রোহ নদীয়া, যশোর, বারাসত, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর ও আরো অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। তারই পটভূমিতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ সীটন কারের নেতৃত্বে নীল কমিশন গঠিত হয়।

৭। 'উদাসিনী' কাব্যের মূল পরিকল্পনা সেকালের বহুপ্রচলিত ইংরাজী কাব্য আখ্যায়িকা পার্নেল-এর 'হার্মিট' কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত।

—ডঃ ভূদেব চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, পৃঃ ৩২১

৮। রমেশচন্দ্র দত্ত আনন্দমঠ উপন্যাসের বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে বলেন 'The general moral of the Ananda Math, then, is that British rule and British education are to be accepted as the only alternative to Musalman oppression ; But acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu kingdom of India'····Encyclopedia Britanica.

৯। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার। বঙ্কিমমানস।

১০। Dr. A. Banerjee & B.K. Ghosh Editor : Bengal Ryots & their Rightst, liabilities'.

১১। সঞ্জীবচন্দ্র : জাল প্রতাপচাঁদ

১২। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। ১২৮৪ বৈশাখ। (সঞ্জীবচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

১৩। সঞ্জীবচন্দ্রের 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম'।

১৪। ঐ ঐ ঐ ।

১৫। সঞ্জীবচন্দ্র—'যাত্রা'।

১৬। সঞ্জীবচন্দ্র—'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধ।

১৭। ঐ — ঐ ঐ

১৮। সঞ্জীবচন্দ্রের 'একঘরে' প্রবন্ধ।

১৯। ঐ ঐ ঐ।

২০। সঞ্জীবচন্দ্রের 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১ শ্রাবণ প্রকাশিত।

২১। সঞ্জীবচন্দ্র : 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা'।

২২। ঐ : গৃহসন্ন্যাস।

২৩। সঞ্জীবচন্দ্র : গৃহসন্ন্যাস।

পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের ধারা ও সঞ্জীবচন্দ্র

বাংলা রেনেসাঁস যুগের বয়ঃসন্ধিক্ষণে ও যৌবনশক্তিলগ্নে সঞ্জীবচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় না জানলে সঞ্জীবচন্দ্রকে জানা যাবে না।

চর্যাপদকে নিয়ে (দশম-একাদশ শতাব্দী) বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু। কিন্তু আধুনিক বাঙালীর ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টা বাংলা গদ্যের প্রাঙ্গণে গতি সঞ্চার করে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের যে চেহারা মিলেছে—তার ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া আর কোন তাৎপর্য নেই বলে বোধ হয়। গদ্যভাষার বিবর্তনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীদের ও শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের অবদান অবশ্যই স্মর্তব্য। তারপরেই বাংলা গদ্যে রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের কথা স্মরণ করতে হয়। রামমোহন তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিতর্কে ও চিন্তায় সুবিন্যস্ত করে উপস্থিত করলেন। ফলে বাংলা গদ্য আধুনিক মনের উপযোগী হয়ে ওঠে তাঁরই প্রয়াসে। কিন্তু তাঁর এ প্রয়াস শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস নয়। বস্তুত তিনি কর্মযোগী পুরুষ ছিলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যরস সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ ও বিতর্কের বাহন হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। মূলত বাংলা 'লেখ্য' গদ্যের ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা যথার্থই পথিকৃৎ-এর মতো। তিনিই বাংলা গদ্যের নির্ভুল নিজস্ব শরীর গঠনটি আবিষ্কার করেন এবং গদ্যরচনার উৎকর্ষ সাধনে দেশের মননশীল লেখনীসমূহকে অগ্রসর হতে উত্তেজিত করেন। বস্তুত, রামমোহনই জ্ঞানমূলক প্রবন্ধসাহিত্য রচনার পথিকৃৎ। তিনিই আপন ব্যক্তিত্বের আরোপনে বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম নিজস্ব স্টাইলের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তারপর তাঁর হাতে তৈরী কঠিন পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসেছেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া রামমোহনের সমকালীন সাময়িক পত্রগুলির প্রভাব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই যুগের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সমস্যা সাময়িক পত্রে মর্মরিত হয়। তারপরেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুজন দিকপাল আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন (১) অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। এঁদের অধিকাংশ

গ্রন্থ বা রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের অবদানকে অস্বীকার না করে একথা বলা যায় যে এই যুগে বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবিস্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁর বিশেষ পরিচয় আছে। দেশের শিক্ষাপ্রসারকল্পে মৌলিক রচনা থেকে অনুবাদের জন্য তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করলেও তাঁর রচনায় যুক্তি তথ্য বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার প্রয়াস তাঁর রচনায় প্রথম দেখা যায়। মৌলিক পুস্তক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১মঃ ও ২য় খণ্ড—১৮৫৫), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১মঃ খণ্ড ১৮৭১, ২য়-১৮৭৩); এবং 'বিদ্যাসাগর চরিত্র' (জীবনচরিত), 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' সাহিত্যকর্ম হিসাবে স্বীকৃত। এছাড়া ছদ্মনামে তাঁর লেখা ১) 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩) ও 'ব্রজবিলাস' প্রভৃতি রচনাগুলি রঙ্গব্যঙ্গের তির্যক আক্রমণে অপূর্ব সৃষ্টি। এই ধরণের উচ্চাঙ্গের রসিকতা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্তে তার প্রমাণ মেলে।

—"এত অল্প বুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না : হতভাগার বেটা কি শুভক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই পৃথিবীতে অনেকের বুদ্ধি আছে, কিন্তু খুড়র মত ঘোশসৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে খুড়র আপদ বালাই লইয়া এই দণ্ডে মরিয়া যাই, খুড় আমার অজর-অমর হইয়া চিরকাল থাকুন।"—('আবার অতি অল্প হইল')।

বাস্তবিক তাঁর গদ্যের কাঠামো নির্মাণে, যতি সন্নিবেশে, পদ বন্ধে, শব্দ-বিন্যাসে বাংলা ভাষাকে লিখনমণ্ডিত করার প্রয়াস অনায়াস স্বীকার্য। আধুনিক কালে গদ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে ; কিন্তু বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে নতুন কোন পথ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

তথাপি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ সাধু গদ্যরীতির বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিদ্রোহ বিস্ময়কর। ভাষাগত ও ভাবগত বিশেষ কৌলীন্য হয়ত তেমন এই গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিমানসে প্রতিদিনের পথ-চলা পরিমণ্ডল উদ্ভাসিত। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনের

মধ্য দিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' পর্যন্ত মানবিকবোধের বাস্তবচেতনা ক্রমপরিণতির সমাজপ্রবাহের লক্ষণীয় দিক। এদিক ছাড়া কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত ও পরে মধুসূদনের মধ্যে জটিল সমাজপ্রবাহ মূর্ত হয়ে ওঠে। নবজাগরণের যুগেই বাস্তব জীবনচেতনা বাংলা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে প্রসারিত। এর আগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'নাটক' আদি-রসাত্মক বা উপদেশাত্মক অথবা নকসা ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত হত। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের পূর্বে (১৮৬০ সালের পূর্বে) রচিত, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক', মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি নাটকগুলির মধ্যে সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনের সংকট যেমন আছে, তেমনি সমাজজীবনের সংকট রূপায়িত হয়েছে এই সমস্ত নাটকে। বস্তুত নাট্য রসের বিচারে এই সমস্ত নাটকের গৌরব যতখানি, তার থেকেও বড়ো কথা হল এই যে, নাটকগুলি কালের ধারায় সঞ্চরণশীল।

তারপরই বঙ্কিমযুগ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশককে বলা হয় বঙ্কিমযুগ। বাঙালীর মনন ধ্যানধারণা, যুক্তি সংস্কার, স্বদেশবোধ, ইতিহাস-চেতনা নিঙড়ে জাতির জীবনে নতুন আলোড়ন তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একাধারে সমালোচক ও স্রষ্টা। প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক এবং বাংলাহিত্যের তিনি যথার্থ প্রথম ঔপন্যাসিক (প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮)-এর কথা মনে রেখেও)। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা, ঐতিহ্যচেতনালব্ধ সামাজিকতাবোধ, রাজনৈতিকচিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছিল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' শুধু মাসিক পত্রিকা নয়, বাঙালীর সমাজদর্পণ। এই বঙ্গদর্শনের মাধ্যমেই তিনি তৈরী করেছেন একটি লেখকগোষ্ঠী।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৮৯) বঙ্গদর্শনগোষ্ঠীরই লেখক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও প্রতিবেশীমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার উপর খুব বেশী অনুভূত হয় না, তবে উভয়ের চিন্তাধারা ও জীবনপর্যালোচনা প্রণালীর মধ্যে কতকটা ঐক্য আছে।"[১] বাস্তবিক শুধুমাত্র প্রভাবশালী অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়েই তাঁর পরিচয় নয়। আপন পরিচয়েই তাঁর আসল গৌরব।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগণের প্রভাব সঞ্জীবচন্দ্রের উপর কতখানি বর্তেছিল তা আলোচনা করবার পূর্বে তাঁর সমসাময়িক ও প্রতিবেশীমণ্ডলীর পরিচয় জানা দরকার এবং সেই কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। অবশ্য আমাদের আলোচনা 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত।[২]

সঞ্জীবচন্দ্রের যখন 'যাত্রা সমালোচন (১৮৭৫) ও দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (গল্প—১৮৭৭) প্রকাশিত হয়েছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[৩] তখন বাংলাদেশের পাঠকসমাজ বঙ্কিমের গল্পরসে বুঁদ হয়ে পড়েছেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলেই তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। মাসে মাসে বঙ্কিমের উপন্যাস 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হচ্ছে; কিন্তু গল্পরসে আকণ্ঠ নিমগ্ন পাঠকেরা তাতেও তৃপ্ত হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেছেন।[৪]

সেই সময়ে রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।[৫] মুঘল পাঠান মারাঠাগণের বীরত্ব ও প্রেমের রোমান্স বাঙালীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। অজ্ঞাত পরিচিত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) পাঠক-পাঠিকাকে বহু বিনিদ্র রজনীর সঙ্গী করেছিল। পরন্তু বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ থেকে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬) কবি ও প্রাবন্ধিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রাজকৃষ্ণের অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়। রূপককাব্য যৌবনোত্থম্ (১৮৬৮), মিত্রবিলাস ও অন্যান্য কবিতা (১৮৬৯) 'কাব্যকলাপ' ও গদ্যগ্রন্থ 'রাজবালা' (১৮৭০) প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ বঙ্গদর্শনের পাতায় নিয়মিত ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'নানা প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলন করেন। ১২৮৯-এর বঙ্গদর্শনের কার্তিক সংখ্যায় রাজকৃষ্ণের 'মেঘদূত' পদ্যানুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসখানি তাঁকে উৎসর্গ করেন।

এই সময়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় রামদাস সেন-ও 'বঙ্গদর্শনে' পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে নাম করেন। রামদস সেনের (১৮৪৫-৮৭) প্রবন্ধগুলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ঐতিহাসিক রহস্যের'[৬] ১ম (১২৮১), ২য় (১৮৮২), তৃতীয় (১২৮৫) খণ্ডে ও 'রত্নরহস্য' (১২৯০) পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত

ম্যাকস্মূলার[৭] রামদাস সেনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইতালীর ফ্লোরেনটিনো একাডেমী রামদাসকে ডক্টর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। এবং বঙ্কিম তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' বিখ্যাত গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন। বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা-পূর্ব নব্যশিক্ষিত লেখকদের মধ্যে রামদাস সেন অগ্রগণ্য।

সঞ্জীবচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) বঙ্গদর্শনের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। বঙ্গদর্শনে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্রের লেখা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'উদ্দীপনা' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর বিরোধিতার সূত্রপাত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'তুলনীয় সমালোচনা' প্রবন্ধটির মধ্যে প্রকাশ পায়। অক্ষয়চন্দ্রের রচনাতেই কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের রচনাপ্রণালীর পূর্বাভাস মেলে। 'গ্রাবু' প্রবন্ধটি তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। অক্ষয়চন্দ্রের রচনারীতি সমসাময়িক সাহিত্যিকদের লেখায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে তাঁর প্রভাব লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র জগদীশনাথ রায়কে লিখিত একটি ইংরাজী পত্রে অক্ষয়কুমার সরকারের[৮] সাহিত্যপ্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। লেখকের সমাজ-সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধটি ১২৮১-র বঙ্গদর্শনে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের সমালোচনা বিভাগের তিনি একজন সমালোচক। 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে নিজেই তা স্বীকার করেছেন।[৯] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়েই হয়তো প্রাপ্তগ্রন্থের 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগের দায়িত্ব অক্ষয়কুমার সরকারের উপর ন্যস্ত করেন। বঙ্গদর্শনের উন্নত সাহিত্যিক মানরক্ষায় বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। তিনি নতুন ও পুরাতন লেখকদের যোগসূত্র রক্ষা করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও (১৮৫৩-১৯৩১) বঙ্কিমযুগের অন্যতম লেখক। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধের নাম 'ভারত মহিলা' (১৮৮১)। বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বর্ষের পর থেকে প্রতিবৎসরই নিয়মিত হরপ্রসাদের রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তুলনামূলক সমালোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেই যুগে হরপ্রসাদের মননশীল গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ অনেককে আকর্ষণ করে এবং এখন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধগুলি পাঠকের কাছে সমাদরণীয়।

বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতির আবিষ্কারক রূপেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচিত নন। তিনিই একমাত্র বঙ্গদর্শনের নিয়মিত সৃজনশীল ও মননসমৃদ্ধ রচনার লেখক হিসাবে পাঠকসমাজে স্বীকৃতিলাভ

করেছিলেন। 'কাঞ্চনমালা' তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১২৯০ সালে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত। বিষয়বৈচিত্র্য, রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য ও ভাষার দিক থেকেও তিনি বহুদর্শী ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধসাহিত্য, স্মৃতি, পুরাণ ব্যাকরণ, অলংকার, কাব্য, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি তাঁর বিষয়-ব্যাপ্তির কথা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। সারস্বত ক্ষেত্রে সদাব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যে তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। একটি জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্যাপ্ত।[১০] সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বাঙালী রায়তদের পক্ষে লেখকের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। 'খাজনা কেন দিই'[১১] এবং 'নূতন খাজনার আইন' সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ-এর মত'[১২] প্রবন্ধ দুটিতে রিকার্ডোর রেণ্ট বিষয়ক মতবাদ প্রাঞ্জলভাষায় আলোচিত হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের যেমন রায়তদের জন্য সহানুভূতি 'Bengal Ryot' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রায়তদের জন্যে সমবেদনা সমপর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া, গবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্যের ভারে তাঁর রসিকসত্তা চাপা পড়েনি।

বঙ্গদর্শনের যুগে আরো যে সমস্ত লেখক ও কবিবৃন্দ বাংলা সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২)। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবুকে সহায়তা করতেন। তিনি বাঙলার এক মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা। তাঁর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) বহুকালাবধি বঙ্গীয় যুবকদিগকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। চন্দ্রশেখর ছিলেন সুরসিক মনের মানুষ।

এসমস্ত ছাড়া, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র বসু, লালমোহন বিদ্যানিধি, রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবন্ধকার তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র যেহেতু বঙ্গদর্শনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সম্পাদনা যাঁর নেশা ছিল তিনি নিশ্চয় সেই যুগের অনেকেরই লেখা মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন এবং নবীন ও প্রবীণ লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতেন।

তিন

বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শনের এই সাহিত্য পরিবেশে বঙ্কিমের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের আবির্ভাব। বঙ্গদর্শনের প্রথম রচনাটির নাম—'যাত্রা'। প্রথমাংশটি

১২৭৯-র পৌষে ও অবশিষ্ট অংশটি ১২৮০-র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ লেখক সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্কিমের হাতে। যদিও সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৪ বৈশাখ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ সম্পর্কে লিখলেন—'বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদনায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন।"[১৩]

বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করেই সত্যিকারের সাহিত্যগোষ্ঠি গড়ে উঠেছিল। সেকালের লেখকদের ওপর কিভাবে এবং কতখানি প্রভাব বিস্তার করত তার নিদর্শন বঙ্গদর্শনের সমালোচনাগুলি। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবিকই সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে সেকালের সাহিত্য ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—'রচনা ও সমালোচনা এই উভয়কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এত দ্রুত পরিণতি লাভ করতে সক্ষম হইয়াছিল।" অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে সহজ হতে পারেনি, কারণ বঙ্কিমের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শানানো তরবারির মতো তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়াতো। তখন বঙ্গদর্শনার্থীর দল পাশের ঘরে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে অনেক বেশী স্বস্তি পেতেন। গল্প-গুজবে, আড্ডায় বৈঠকখানায় মশগুল হয়ে উঠতেন। বৈঠকখানা বিলাসী ও সঙ্গলোভী সঞ্জীবচন্দ্র সাহিত্যের আসর জমিয়ে তুলতেন এবং সঞ্জীবচন্দ্র সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন আপন প্রতিভায়। সে প্রতিভা যত সামান্যই হোক বাঙলা ভাষার সেবার জন্য সঞ্জীব একজন বিশিষ্ট সেনাপতি। সঞ্জীব পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের ধারা বিশ্লেষণ করলে বক্তব্যে ও ভাষায় তাঁর ব্যঙ্গ মিশ্রিত লঘু পরিহাস ও রসিকতা পূর্বসূরীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৌলিক রচনাগুলি। সবচেয়ে আশ্চর্য—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার মধ্যে যেমন পরিমার্জিত শব্দ সংযোজন ও পরিহাস রসিকতা লক্ষ্য করা যায় অনুরূপ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখায় যেমন অশ্লীলতা নেই, সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় তেমনি অশ্লীলতা দোষ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাংলা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে (১২৮৫) টেকচাঁদি ভাষার ('আলালের ঘরের দুলাল') প্রশংসা করেছিলেন ও বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুরাগী ভাষার নিন্দা করেছিলেন।[১৪] কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের যা ছিল আদর্শ ভাষা, তা বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত ভাষাধারা, কখনো প্যারীচাঁদের নয়। সঞ্জীবচন্দ্রের নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব যে তাঁর পরিহাস রসিকতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বাগবৈদগ্ধ্যের তীব্র সুর বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির ধারায় অনুসৃত। 'স্ত্রীজাতির বন্দনা'-র কিছু অংশ পাঠ করলে তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে—"গৃহিনীরা ইদানীং সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব একচেটে করিয়া লইয়াছেন—ব্যয়, ভূষণ, লৌকিকতা, সামাজিকতা সকলই এখন আমাদের হাতে। বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্তা। পুরুষ ঘটকেরা অন্দরমহল যায় না। সুতরাং আর ঘটকালি পায় না। কাজেই তাহাদের সে ব্যবসা ছাড়িতে হইয়াছে। তাহাদের পরিবর্তে এখন স্ত্রীলোক ঘটক।"

যে বাংলা গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরের হাতে পরীক্ষিত, তারই ধারা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখনীতে অনুসৃত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের 'ব্রজবিলাস' মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে রচনার ভাষার দ্রুত তাল ও সহজ রীতির একটি নমুনা দেওয়া হল। সঞ্জীব মনে প্রাণে কতখানি বিদ্যাসাগরের রীতিকে অবলম্বন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচের উদ্ধৃতিটিতে—"যদিও যুগমাহাত্ম্য, আদি-পুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে কিছু তো থাকিবে। তিনি একপদে সমস্ত আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা কি তাহার বংশধর তিলক হইয়া আকাশ মণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারিব না। অবশ্য পারিব। আর ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি যাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাঁদ নহেন, নদীয়ার চাঁদ। নদীয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত কেলুদা বাহাদুরের পক্ষে নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য বলিয়া বোধ হয় না।" (ব্রজবিলাস)

বিদ্যাসাগরের রচনার প্রাণস্পন্দন সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার মধ্যে অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখকই বঙ্কিম-চন্দ্রের Style কে অনুসরণ করেছেন। ভাষায়, বক্তব্যে, বাক্যগঠনে এমনকি বঙ্কিম জীবনাদর্শে। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সহজ প্রসন্নতায় শান্ত। বৃদ্ধবয়সের নিঃসংগতাবোধ, দেশের পরাধীনতার জন্য মর্মভেদী হাহাকার, প্রতিবেশীদের প্রবঞ্চনার প্রতি ধিক্কার মিশ্রিত ব্যঙ্গ পাঠককে আঘাত দেয়।

না, বরং পাঠক সঞ্জীবচন্দ্রকে সহৃদয়রূপে কাছে পেতে চান। তাঁর লেখনীর Style টি সহজবোধ্য। তিনি লিখেছেন: "বস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালার পরাধীনতা ঘটিয়াছে। লবণ সম্বন্ধে বাংলা পরাধীন। সহস্র সহস্র বৎসর অবধি বাঙালীরা সমুদ্রের জল হইতে লবন বাহির করিয়া লইত। সমুদ্র তাহাতে রাগ করিত না। কেহ কথা কহিত না। এখন কথা কহিবার লোক দাঁড়াইয়াছে। (বঙ্গদেশের পরাধীনতা)[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের মত সঞ্জীবচন্দ্র সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। সূক্ষ্মরসবোধ, তীক্ষ্ণবিচারশক্তি ও বিস্ময়কর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে তাঁর রচনাকে রসোজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের গদ্য নিঃসন্দেহে কথারীতির উপর আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তাঁর মনের ঝোঁক ছিল কথ্য-রীতির দিকে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—"তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে লেখাগুলি কথা-কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে জমাইয়া যাওয়া।"[১৬]

বিদ্যাসাগর নির্মিত ভাষার রাজপথ ধরেই তিনি পথে নেমেছিলেন। তাঁকে বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বললে ভুল হবে না। নিম্নের ছত্রগুলিতে তাঁর চমৎকার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

"তিনি শতলোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধহয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেইরূপ প্রসন্নব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাহার নাম উঠিয়াছিল। তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম।" (পালামৌ)

সঞ্জীবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো শব্দ প্রয়োগে বা বাক্যবিন্যাসে তৎসম, ইংরাজী, ফরাসী, দেশী—সর্বপ্রকার শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

আগেই বলা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর উপর খুব বেশী অনুভূত না হলেও উভয়ের চিন্তাধারা ও জীবন পর্যালোচনা প্রণালীর মধ্যে কতকটা ঐক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেশ, যে জাতি ও যে কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সেই দেশের ইতিহাস, সেই জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্মকে উদ্ধার করা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রেরও জীবনাদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের

অনুরূপ।[১৭] তিনি দেশ-কাল-সমাজ-ধর্মের মঙ্গলার্থে সাহিত্যসেবায় মনসংযোগ করেন।

নির্দেশিকা

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। সঞ্জীবচন্দ্রের সমকালীন লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণীয় ভাষণে জানা যায়—"যাঁহারা তাঁহার (বঙ্কিমের) সহিত একযোগে বঙ্গদর্শন চালাইয়া ছিলেন ও বাংলাভাষার সেবার জন্য একটা মজলিস তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র গিয়াছেন, অক্ষয়বাবু গিয়াছেন, রাজকৃষ্ণবাবু গিয়াছেন, চন্দ্রনাথবাবু গিয়াছেন, হেমবাবু গিয়াছেন, যোগেন্দ্রবাবু গিয়াছেন, ঈশানবাবু গিয়াছেন, রামদাস সেন গিয়াছেন, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় গিয়াছেন, লালমোহন বিদ্যানিধি গিয়াছেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়াছেন, জগদীশনাথ রায় গিয়াছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়াছেন, আরও অনেকে গিয়াছেন, থাকিবার মধ্যে আছে শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর আমি।"

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই ভাষণ—
৪ঠা আগষ্ট, ১৩২৯)

৩। দুর্গেশনন্দিনী — ১৮৬৫, কপালকুণ্ডলা — ১৮৬৬, মৃণালিনী — ১৮৬৯ বিষবৃক্ষ — ১৮৭৩, ইন্দিরা যুগালঙ্গুরীয় — ১৮৭৪, চন্দ্রশেখর — ১৮৭৫, কমলাকান্তের দপ্তর — ১৮৭৬, রজনী — ১৮৭৭।

৪। 'বিষবৃক্ষ' প্রথম প্রকাশনায় ১২৭৯ বৈশাখে। শেষ প্রকাশ ১২৮৯ চৈত্র (৯ মার্চ)। —"বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা কেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া, গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি ; তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।

(জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ)

৫। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকংকণ (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৭)।

৬। বঙ্গদর্শনে ১২৮১ জ্যৈষ্ঠতে রামদাস সেনের ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথমভাগ সমালোচিত হয়েছিল। এই প্রকারের প্রবন্ধের বই প্রথম বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়।

৭। রামদাস সেনকে লেখা ম্যাকসমুলারের পত্রটি উদ্ধৃত হল :—'Take all what is good from Europe only, do not try to become Europeans, but remain what yon are, sons of Manu, children of a beautiful soil, seekers after truth, worshippers of the same unknown God, whom all men, ignorantly worship and whom all very truely and wisely serve by doing what is just and good."—সাহিত্যসাধক চরিতমালা।

রামদাস তাঁর ঐতিহাসিক রহস্য প্রথম খণ্ড' মোক্ষমুলরকে উপহার দেন।

৮। "I have got a lot of contributors, who have promised to write and can write in Dinabandhu, Hemchandra, Krishnakamal Bhattacharya, Taraprasad Chatterjee and a young man whom you don't know, but whose intellectual life, I think, I have greatly influenced for good or for evil, and whose inherent gifts presaege somethin; great for him in future. His name is Akhoy Sarkar". (৩০ ডিসেম্বর ১৮৭৪)

৯। পিতাপুত্র প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন—"১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক অর্থাৎ আমি বাড়ি বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করিবার এক বৎসর পরে, 'সাধারণী' প্রকাশিত হইল। আর সেই মাস হইতে আমি 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম।"

১০। 'বঙ্গদর্শনে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালার সাহিত্য' প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর সম্পর্ক দ্রষ্টব্য।

১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"বঙ্গদর্শনে যাঁহারা বঙ্কিমবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।........বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, সাধারণীর সম্পাদক, বঙ্গদর্শনে তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে।"

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাঙ্গালার সাহিত্য (বর্তমান শতাব্দী, পৃঃ ৮৭, ফাল্গুন)।

১২। বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৩। 'বাঙ্গালার সাহিত্য' প্রবন্ধ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখক। ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ কবিদের

কাব্য, টেকচাঁদ ঠাকুর, অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

(বাঙ্গালা সাহিত্য। বর্তমান শতাব্দীর—১২৮৭, ফাল্গুন)

১৪। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন—"সমসাময়িক শক্তিশালী গদ্যলেখকদিগের মধ্যে অনেকের প্রতিই তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) অবিচার করিয়া গিয়াছেন। ....আলালের ঘরের দুলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও বোধকরি বিদ্যাসাগর বিদ্বেষ প্রণোদিত।" (বাংলা সাহিত্যে গদ্য)

১৫। ১২৮৮ সালের ভাদ্রমাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

১৬। জীবনস্মৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক অধ্যায়।

১৭। পরবর্তী অধ্যায়ে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় একদা বাঙালীর আত্মদর্শন ঘটতো। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রথম বাঙালীকে দেশ দেখার দৃষ্টিদান করেন, বাঙালীর শিক্ষাসংস্কৃতি, জাতিবিন্যাস বর্ণবিন্যাস দেশাচার প্রভৃতিকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করেন, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্রেরও বাঙালীজাতির মঙ্গলসাধন ও জাতিগঠনে বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বেই কোলকাতার শিক্ষিত সমাজে নানা আন্দোলন সূচিত হয়। একদিকে রামমোহনপন্থীদের, অন্যদিকে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ আন্দোলনে উভয়গোষ্ঠীর লোকেরা তৎপর হ'ন। নারীর স্বাতন্ত্র, স্ত্রীশিক্ষা এবং বিধবাবিবাহের মতন বিষয় বঙ্গসমাজে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করে লেখনী ধারণ করেন। উনিশ শতকের বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের নারীমুক্তিচিন্তা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনাতে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' বিবাহিত নারীর প্রেমিকের জন্য স্বামীত্যাগ ও পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন নিয়ে রচিত উপন্যাস। 'কণ্ঠমালা'র সঙ্গে বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থটির তুলনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীরা যেমন দেশমাতৃকার জন্য জীবনসর্বস্ব দিতে চেয়েছিলেন, 'কণ্ঠমালা'র ডাকাতবেশী শম্ভু মহারাজের দল স্বদেশ ও সমাজের উন্নতিকল্পে মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজেছিলেন। আবার 'দামিনী' গল্পে সঞ্জীবচন্দ্রের দামিনী-রমেশের বাল্যপ্রণয়চিত্র অংকনে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনীর চরিত্র চিত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পী বঙ্কিম প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর দুর্নিবার আকর্ষণকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন, কিন্তু 'কণ্ঠমালা'র শৈলর চরিত্র থেকে কলুষ ও গ্লানি দূর করবার নিমিত্ত তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র নীতিবাগীশের ভূমিকা নিয়েছিলেন। বঙ্কিম-এর উপন্যাসে যেমন নদীমোহনা, সমুদ্র, নির্জন অরণ্য ও জীর্ণ পরিত্যক্ত জনপদ ও গৃহ প্রভৃতি উপাদানগুলি বর্ণবস্তু বর্ণনায় প্রায়ই উপন্যাসের অঙ্গ হিসাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে নিপুণ চিত্রকল্পের

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'কণ্ঠমালায়' মাতঙ্গিনী ও মাধবীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত প্রেমিক ও কবি সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট। একটি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ লক্ষ্য করা যাবে।—

"একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাতঙ্গিনী ও মাধবী উভয়ে বাইশ-পৈঠার ঘাটে বসিয়া নিম্নস্বরে কথাবার্তা কহিতেছিল। সর্বত্র ছায়া পড়িয়াছে। নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে, বায়ু অন্যমনস্কে বহিতেছে, নিকটে আর কেহ নাই-তথাপি উভয়ে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন।

মাধবী। আমি আর এখানে অধিকদিন থাকিতে পারি না। ..

মাতঙ্গিনী। এই সামান্য কথা বলিবার জন্য এত চুপি চুপি কথা কহিতেছ কেন?

মাধবী। কোন ক্ষতির ভয়ে কথার স্বর নীচু করি নাই। চারিদিকে স্বরের সঙ্গে আমার স্বর মিলাইয়া কথা কহিতেছি। দেখিতেছ না, সর্বত্র ছায়া পড়িয়াছে, ছায়ার স্বর অতি মৃদু, প্রায় শব্দহীন। জড়জঙ্গম সকলেই এই ছায়ার সঙ্গে স্বর মিলাইতেছে। ঐ দেখ, নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে, বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে, বক সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতেছে। মাছ-রাঙা পালক মুড়িয়া দিয়া শুষ্ক নিঃশব্দে বসিয়া আছে। পৃথিবীর গোলমাল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। আমিও তাই চুপি চুপি কথা কহিতেছি, এখন বুঝিলে?

মাতঙ্গিনী। তা বুঝিলাম। তুমি নিজে গায়িকা, সুতরাং গাছপালার নদ-নদীর স্বরগুলি চিনিতে পার।[১]

বস্তুত উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রকৃতি-চেতনা শুধুমাত্র অনুভূত হয় না, কথা না বলার মধ্যে একজন গায়িকা হিসাবে মাধবীর স্বভাবের একান্ত মাধুর্য ও ব্রীড়াকুণ্ঠিতভাব অনায়াসলক্ষণীয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে গানকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিশেষতঃ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ভীমা পুষ্করিণীর নির্জনতায় শৈবলিনীর চিত্র সেই দীঘির জলে প্রকৃতির কোলে মুহূর্তের জন্য অনুভব করেছে। অথচ তার মনের বীণা বেজে উঠেছে।

"শৈবলিনী। কেহ নাই ভাই, চুপি চুপি একটি গান গানা।

সু। ভুরহ। পাপ। ঘরে চ।

শৈ। ঘরে যাব না লো সই।"[২]

শৈবলিনীর এই অনুভূতি সুর ছাড়া প্রকাশিত হবার নয়। শিল্পী বঙ্কিম গানের প্রয়োগকৌশলে আপন শিল্পরীতির অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া বোষ্টমীর ও 'বিষবৃক্ষে'র বোষ্টমী বেশী দেবেন্দ্রের এবং 'চন্দ্রশেখর'-এর 'দলনীবিবির' গাওয়া গানগুলি নাট্যঘটনায় প্রকাশযোগ্য। 'কণ্ঠমালা'য় মাধবীর গান গাওয়ার মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গীতপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানবজীবনের অদৃষ্টনির্ভর উত্থাপতন সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' 'মাধবীলতা ও 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। কণ্ঠমালা-র শৈল, মাধবীলতার পিতমের মৃত্যু ঘটনা ও রচনা ঠিক যেন 'জাল প্রতাপচাঁদে'র ন্যায় অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত। মানুষের অদৃষ্টের মধ্যে শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অদৃষ্টের নির্মম ক্রূর পরিহাসের সহিত ঐশী বিধানের সামঞ্জস্যসাধন করতে চেয়েছেন। 'রাজসিংহে' মবারকের মৃত্যু ঘটনা শুধু অদৃষ্টের বিধান নয়. ঐশী নিয়মও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 'সীতারামে' তোবার খাঁর আক্রমণ হতে সীতারাম কর্তৃক নবাব রক্ষার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের নিয়তি ও ঐশী বিধানের সঙ্গে পুরুষকার শক্তির সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই উপন্যাসেই নায়িকা শ্রী-র অদৃষ্ট গণনার মধ্য দিয়ে নিয়তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এক অদৃশ্য যোগসূত্রও লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় মহারহস্যময় নিয়তির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

অতিপ্রাকৃত উপাদান ব্যবহারের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবণতা স্পষ্ট। চিঠি, গান, স্বপ্ন, মহাপুরুষ ও প্রকৃতি বর্ণনায় রোমান্সের সন্ন্যাসী অপরিচয়ের রহস্যকে আরো ঘনীভূত করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় মানবশক্তির ও প্রকৃতির অতীত রহস্যময় শক্তির বোধ তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের মূলে আছে। 'কণ্ঠমালা'র অরণ্য পরিবেশ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র সমুদ্র অরণ্য প্রকৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। নিখিলের রহস্যময় শক্তি আর মানুষের প্রেমের অদৃশ্যশক্তি উভয়েই উপন্যাসে অঙ্গীকৃত।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে মেয়েদের বয়স নিয়ে তৎকালীন সমাজের চিন্তাশীল মানুষদের মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রাখার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন—'বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী।

কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।"[৩]

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অনেক জায়গায় মিল আছে। 'যাত্রা সমালোচনা' প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার কুরুচিপূর্ণ দৃশ্যাবলী সঞ্জীবের ভালো লাগেনি। 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসেও গায়ক বিনোদ সুন্দরের (বিদ্যাসুন্দর) মালা গাঁথা দেখে বিদ্যার প্রেমাকর্ষণকে বিদ্রূপ মন্তব্য করে—"ভারতচন্দ্র গাঁজাখোর ছিল, তাই শিল্পকে প্রেমের বীজ করেছে।" 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'ভারতচন্দ্রের সমালোচনা' প্রসঙ্গে একই চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যাবে বঙ্কিমের বক্তব্য—'যেখানে দেখিবেন 'চাই বেলফুলের' ডাক অধিক সেইখানেই দেখিবেন যে এখন ভারতচন্দ্র রায়ের সমাদর অধিক। তবে কি ভদ্রলোক ভারতের গ্রন্থকলাপ কখনই পাঠ করিবে না? উত্তর, কেন ভদ্রলোক কি ফুলের আদর জানেন না? না ফুল ব্যবসায়ী ভদ্রপল্লীতে থাকে না। তবে কিনা ভদ্রলোকে যদি মালিনী গোয়ালিনীর বিশেষ গৌরব করেন বা কবি ভারতকে পরম পূজনীয় শ্রীল, শ্রীযুক্ত কবিবর জ্ঞান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না"।[৫]

তাব 'যাত্রা সমালোচনা' প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্র আগেই লেখেন। সঞ্জীবচন্দ্রের 'স্ত্রীজাতি বর্ণনা' ('ভ্রমরে' প্রকাশিত) 'বিবাহের ঘটকালি' (প্রচারে প্রকাশিত) প্রবন্ধদুটিতে সঞ্জীবচন্দ্র স্ত্রীজাতিদের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সঞ্জীবচন্দ্রের ইংরাজী রচনা Bengal Ryots : their Rights and Liabilities' গ্রন্থখানি ঊনবিংশ শতাব্দীর রায়তদের ঐতিহাসিক দলিল। বাঙালী প্রজাদের পূর্বেকার অবস্থার সঙ্গে ইংরাজদের আমলে প্রজাদের সম্বন্ধে যেসকল আইন রচিত হয়েছিল তার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল এবং দশ আইনের বিচার-বিশ্লেষণ যেমন বাস্তবপ্রদ তেমনি প্রজাদের উন্নতির জন্য তাঁর বক্তব্য মানবিক। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদ রাজাবিবি প্রজাদের কতখানি স্বার্থহানি ঘটিয়েছিল এবং ইংরাজ আমলে বাংলাদেশের কৃষকদের মর্মস্পর্শী চিত্র বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব স্মর্তব্য। 'জাল প্রতাপচাঁদ' লেখার ব্যাপারে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের চিন্তাধারায় প্রভাবিত তা অবশ্যস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে

লিখেছিলেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়. তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে আমি লিখিব সকলেই লিখিবে। যে বাঙালী. তাহাকেই লিখিতে হইবে।"৬

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবেদনে সঞ্জীবচন্দ্র সাড়া না দিয়ে পারেননি। দু'বছর পরেই (১২৮১ বঙ্গাব্দে) 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত 'জাল প্রতাপচাঁদের'র বিজ্ঞাপণে বঙ্কিমচন্দ্রের কথার সুর ধ্বনিত হলো। সঞ্জীব লিখলেন—"আমাদের ইতিহাস নাই, যাহা আমরা বাঙালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরাজের ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংরাজদের কীর্ত্তিকলাপকে বাঙালীর জিনিষ বলিয়া আমরা এখন গ্রহণ করিতেছি।"

তিনি আরো বলেন—"এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখন হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাস উপযোগী উপকরণের অভাব না হয় এই প্রত্যাশায় এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটি কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সেইজন্য আপাততঃ জালরাজাকে উপলক্ষ্য করা যাইতেছে"

উপলক্ষ্য হল কোম্পানীর আমলে বাঙলার সামাজিক ইতিহাস রচনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞানের প্রভাব বর্তেছিল তা সকলেই জানেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রবন্ধ সঞ্জীবচন্দ্রও লিখেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ও সমাজবিবর্তনমূলক উৎকৃষ্ট মৌলিক প্রবন্ধ—'বৈজিকতত্ত্ব'। এই প্রবন্ধে তিনি সমাজবিবর্তনের অনিবার্য ফলের কথা ব্যাখা করেছিলেন। ভ্রূণতত্ত্ব ও বীজতত্ত্ব (Embrology & Eugencies) নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ 'বৈজিকতত্ত্ব' তাঁর বাংলাসাহিত্যে প্রথম সার্থক বিজ্ঞান প্রবন্ধ। এ বিষয়ে ইউরোপের Sir F Galton এর "Human Faculty" নামক জীববিদ্যাবিষয়ক বইটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে মহাপাপ বা মহাপাতকের' কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে "ধর্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে ধর্ম মিথ্যা।" বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এরূপ ধর্মবোধে পাতকিনী শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। আবার প্রকৃতি বর্ণনায় সঞ্জীবচন্দ্রের কৃতিত্ব কম নয়। প্রকৃতির ভয়ংকরী রূপ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন অনুরূপ 'মাধবীলতা' উপন্যাসে রহস্যময় প্রকৃতির নির্মম রূপ সঞ্জীবচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন,—"প্রকৃতিদেবী কি ছিন্নমস্তা? এই কি প্রকৃতির যথার্থ মূর্তি? তাই কি অন্তরা আপনার শাবক আপনি খায়?....তবে হে প্রকৃতি! আমাদের কেন ঠকাও? যথার্থ মূর্তি ঢাকিয়া কেন নিয়ত মোহিনী মূর্তিতে আমাদের চোখে চোখে বেড়াও?"[৭] বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রকৃতি-চিত্রণের ভয়াবহ চিত্র 'চন্দ্রশেখরে' বিশেষভাবে লক্ষণীয়—'তুমি জড় প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সংকোচ নাই।"[৮]

'আনন্দমঠে'র সন্তানদল এবং 'কণ্ঠমালা'র মহাকুলীন দলের পরিকল্পনা প্রায় একই রূপ।[৯] 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১২৮৭ সালের চৈত্র থেকে ১২৮৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত, আর কণ্ঠমালা ১২৮২-র ভ্রমরে ৩৭টি অধ্যায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং সঞ্জীবচন্দ্রের 'মহাকুলীনদলের' পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের আগে। 'কণ্ঠমালা'-র শম্ভু ডাকাত কখনো পরহিতব্রতী সন্ন্যাসী, মহাকুলীন সত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে (১২৯৩) 'কণ্ঠমালা'র ২য় সংস্করণে অনেক অংশ পরিত্যাক্ত ও পরিবর্তিত হয়। হয়তো তখন এই সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পড়লেও পড়তে পারে। বিশেষতঃ অন্ধকার কক্ষে শৈলর বন্দীবাস চিত্রটি সেই রহস্যময় পরিবেশের কোন অংশের সঙ্গে 'আনন্দমঠে'র সাদৃশ্য আছে। শৈলের সঙ্গে রোহিনী ও শৈবলিনীর ভাবভঙ্গীগত কিছু সমমর্মিতা ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধের রামধন দাদার কাহিনীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র মিল আছে। 'পদোন্নতির পন্থা' অম্লরসের ব্যঙ্গাত্মক ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ, অথচ মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত আখ্যা কটাক্ষপূর্ণ, তীব্র ব্যঙ্গাত্মক রচনা। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় জ্বালা নেই—কারো উপর অশ্রদ্ধা নেই, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অকারণ ঘৃণা নেই।

যাই হোক মাঝে মাঝে তখনকার দিনে পত্রিকাগুলি ভুল করে বসত বঙ্কিমের রচনা সঞ্জীবের বলে, সঞ্জীবের রচনা বঙ্কিমের বলে, আসলে 'বঙ্গদর্শনে'র কোন লেখাতেই লেখকের নাম থাকত না। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় এরূপ একটি ভুল সমালোচনায় গল্প বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্ধুপুত্র তারকনাথ বিশ্বাসকে বলেছিলেন—'যেগুলোকে দাদার লেখা ভেবে ভাল নয় বলেছে, সেগুলো আমার লেখা। আর যেগুলো আমার লেখা মনে করে ভাল বলেছে

সেগুলো দাদার লেখা।"[১০]

সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার মধ্যে বঙ্কিমের চিন্তাধারা ও রচনারীতির অনিবার্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমের তত্ত্বজিজ্ঞাসার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও বিশ্লেষণ পটুতা তাঁরও মনের কোণে দানা বেঁধেছিল। তবে 'পালামৌ' ভ্রমণগ্রন্থে তিনি পর্যবেক্ষণশক্তি ও সৌন্দর্যবোধে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা সার্থকতর বলে মনে হয়।

নির্দেশিকা

১। কণ্ঠমালা, চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। সঞ্জীবচন্দ্র

২। চন্দ্রশেখর, প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র।

৩। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে ১২৯৮ সালে ২৯শে আশ্বিনে লেখা একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছিলেন।

৪। কণ্ঠমালা। ৩৪ পরিচ্ছেদ সঞ্জীবচন্দ্র।

৫। 'বঙ্গদর্শন' ১২৮০, বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র: বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন—১২৮৭ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত

৭। মাধবীলতা। ২৯ পরিচ্ছেদ। সঞ্জীবচন্দ্র

৮। চন্দ্রশেখর, ৩য় অধ্যায়, ৮ম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিমচন্দ্র

৯। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীব রচনাবলীর ভূমিকা।

১০। তারকনাথ বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরের সাবজজ দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র, বর্দ্ধমানে বাড়ী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি ওখানকার সাবজাজ ছিলেন

Bengal Ryots : their Rights and Liabilities (1864)

বাংলার রায়ত : তাদের অধিকার ও দায়

'Bengal Ryot' পুস্তকখানি সঞ্জীবচন্দ্রের ইংরাজীতে লেখা একটি অসামান্য রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগের রায়ত কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক-সামাজিক পীড়ন-শোষণ সম্পর্কিত একটি দলিল। রায়তদের জমিজমা সংক্রান্ত অধিকার প্রশ্নে এরূপ সুচিন্তিত, যুক্তিযুক্ত ও পরিশ্রমসাপেক্ষ রচনা এর আগে কেউ লিখেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। এই পুস্তকখানি পাঠ করলে সহজেই অনুমেয় যে বাঙালার রায়তদের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্র খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। রায়ত প্রজারা যে জমিদার মধ্যস্বত্বাধিকারীদের শোষণের শিকার তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লেখকের 'বেঙ্গল রায়ত' গ্রন্থটিতে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির উপরে জমিদারের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, কৃষকদের কোনরকম স্বত্বাধিকার স্বীকৃত হয়নি। খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের অপকৌশল সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের মনোভাব যেমন সুস্পষ্ট তেমনি ভূমিস্বত্ব-বঞ্চিত রায়তদের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ১৭৬৯ সালের অজন্মা ও ১৭৭০-৭১ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে বেশি খাজনা আদায় করার মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের ভয়াবহ চিত্রকে সঞ্জীবচন্দ্র দেখতে পেয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকদের খাজনা সম্পর্কিত বক্তব্যে রায়ত জমিদার উভয় সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর **'Bengal Ryot'** গ্রন্থে।

তবে এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহনের কথা মনে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ব্রিটিশ শাসনকালে রায়তদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তা রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ জনগণের কাছে সামন্তপ্রভুদের রায়ত শোষণের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। সামন্ত সমাজব্যবস্থার ঘনান্ধকারের মধ্যে জমিদারশ্রেণীর প্রতি সমর্থন থাকলেও রায়তদের প্রতি রামমোহনের সমবেদনা অনস্বীকার্য। রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেন। "১৭৯৩ সালের ১নং ও ৮নং রেগুলেশনের বলে এর পরবর্তী অন্যান্য রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারদের নতুনভাবে জমি বন্দোবস্ত ও খাজনাবৃদ্ধির

অধিকার দেওয়ায় প্রজাদের স্বার্থের বিনিময়ে, বরং বলা চলে তাদের ধ্বংস করে মুষ্টিমেয় জমিদার লাভবান হয়েছে।[১] ইংলণ্ডে থাকাকালে রামমোহন রায়তদের অবস্থার কথা লিখে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী সিলেক্ট্ কমিটি (১৮০২) কর্তৃক উত্থাপিত ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে ৫৪টি প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। তথাপি তাঁর সামন্তসত্তা কখনো কখনো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে রায়ত জমিদার প্রশ্নে তাঁর উদারনৈতিক চেতনার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। কারণ রামমোহন নিজে জমিদার ছিলেন এবং জমিদারী থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। ফলে তাঁর জীবনযাত্রায় ও চিন্তাধারায় প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল মানসিকতা— এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি রায়ত সমস্যার ব্যাপারে জমিদারদের শোষণ থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য রাজা রামমোহনের সর্বপ্রথম প্রয়াস নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়।

রাজা রামমোহন ছাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের আগে রায়ত শোষণের অশ্রুসজল চিত্র অঙ্কন করেছেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে। রায়তদের উপর যে অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিভাবে ছলে বলে কৌশলে নীলকরেরা অশিক্ষিত কৃষকদের চুক্তিবদ্ধ করে থাকত, কিভাবে দেওয়ান-নায়েব-গোমস্তারা এই লুণ্ঠনযজ্ঞে নিজেদের ভাগ বসিয়ে তাদের ক্রীতদাস করে রাখবার চেষ্টা করত তারই বাস্তব অভিজ্ঞতা এই নাটকে ইতিহাস হয়ে আছে। লঙ সাহেবের প্রকাশনায় মধুসূদন কর্তৃক 'নীলদর্পণে'র ইংরাজী অনুবাদ 'The Indigo Planning Mirror' পার্লামেণ্টে পাঠানো হয় এবং স্বদেশে বিদেশে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দেখা দিলে ইণ্ডিগো কমিশন বসে, তাতে আইন করে শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের ক্ষমতা সংকুচিত হয়। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের ৮ বছর আগে নিগ্রো দাসত্বের মর্মন্তুদ ঘটনাপূর্ণ কাহিনী মার্কিনী মহিলা ঔপন্যাসিক স্টো প্রণীত 'Uncle Tom's Cabin' (১৮৫২) এর কথা স্মরণীয়। দেখা যায় এই উপন্যাসখানি প্রকাশের পরই আমেরিকার নির্মম দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশঃ জাগ্রত হয়েছিল, যেমন 'নীলদর্পণ' প্রকাশের পর থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে ইংরাজদের প্রতি সর্বপ্রথম জাতিবর্ণনির্বিশেষে ঘৃণা-বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়। বিদেশী নীলকরদের মতো দেশীয় নীলকরেরাও রায়তদের উপর নিপীড়ন করতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৬) গ্রন্থে এর ঐতিহাসিক

সাক্ষ্য রেখে গেছেন—"প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়।"

আধুনিক ভারতের ভূমিব্যবস্থা কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে চাষীর সর্বনাশ ঘটিয়েছিল সেই ভাবনা নবযুগের মানবতাবাদী চিন্তানায়করা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। রাজা রামমোহন রায়, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতের ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এঁরা সকলেই রায়তদের ব্যথায় ব্যথিত। কারণ ব্রিটিশপূর্ব যুগেও নিয়মিত খাজনা প্রদত্ত হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারলাভে ভারতীয় রায়ত বা কৃষকরা বঞ্চিত হত না। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থে একথার উল্লেখ করে বলেছেন. "a large portion of the ryots are the proprietors of their estates, subject to the payment of a fixed land tax to government, and they are never disposed while they pay their tax" ২ কিন্তু ইংরাজ শাসনে এদেশে কৃষক জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হল, পক্ষান্তরে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়ে তারা কৃষিউৎপাদনের ধনবাদী ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে টেনে নিয়ে এল। স্বভাবতই এরূপ পরিবেশে কৃষিব্যবস্থা কোনক্রমেই উন্নতিশীল অর্থনীতির প্রয়োজনানুগ খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদনে সমর্থ হলনা। কৃষির সামান্য উদ্বৃত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে লাগল। এই প্রসঙ্গে মার্কসের বক্তব্য স্মরণীয়: "If any nation's history then the history of the English in India is a string of futile and really absurd (in practice infamous) economic experiments. In Bengal they created a caricature of large-scale English landed estates; in south eastern India a caricature of small parcelled property, in the north west they did all they could to transform the Indian economic community with common ownership of the soil into a caricature of itself."৩

এই প্রসঙ্গে ভূমিতান্ত্রিক সমাজে রায়তের সমস্যা প্রসঙ্গে জনৈক সমাজ-তত্ত্ববিদ যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য: "মার্কস ঠিক একশ বছর পূর্বে]

বলেছিলেন ভারতবর্ষ এতকাল বিভিন্ন আঘাতের মধ্যেও যে সমাজ ও যে সভ্যতাকে আঁকড়ে থাকতে পেরেছিল ইংরেজ আমলে আর তা পারবে না, কেননা ইংরেজের খরনখর তার সমাজশরীর ও আর্থিক কাঠামোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে। একথা সত্য সেইজন্য ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস শুধু যে রাজস্ব আদায় ও রাজস্বব্যবস্থার ইতিহাস তা নয়; সে হল সমস্ত সমাজেরই ইতিহাস, সমস্ত সামাজিক বিবর্তনের ছবি। ভূমিব্যবস্থার গভীর আলোচনা হতে এই ছবি যেমন ধরা পড়ে তেমন আর কিছুতেই নয়। সেযুগে সামাজিক জীবনের মূল কেন্দ্রেই ছিল ভূমি, কাজেই ভূমিব্যবস্থার অদলবদল হতে সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত খুব বেশিরকম পাওয়াই স্বাভাবিক।"[৪]

বাংলার ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস মূলত সমস্ত সামাজিক বিবর্তনের ছবি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তারপরেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরো পরে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এবং রায়তের ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ। 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১৮৭৬) ও 'সাম্য' (১৮৭৯) রচনায় তার পরিচয় সুস্পষ্ট। ইংরাজ শাসনে বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যবস্থার আলোচনায় তার বিশ্লেষণ এত তীক্ষ্ণ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশ্রয়পুষ্ট সম্প্রদায় তা সহ্য করতে পারেননি। নিম্নের একটি উদ্ধৃতি থেকে রায়তের প্রতি তাঁর ভাবনা সমর্থিত হয়েছে।

"আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমিদার দণ্ডনীয় হয়না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষীজমিদারী চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয়না? যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না সে আইন আইন কিসে? আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিলনা, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানী হইয়া চাঁদপালের ঘাটে ঢালাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...

আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল, তাহা হইলেই নির্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।"

প্রজাদের অধিকারের স্বীকৃতিদানে এরূপ স্পষ্ট, ঋজু ও দৃঢ় অথচ বিদ্রোহাত্মক কথা বলার সাহস সেযুগে খুব কম চিন্তানায়কের ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার চাষীদের সর্বনাশ এনেছিল, প্রজাদের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই তাকে স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। চিন্তার এই স্পষ্টতা তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থেও প্রকাশ পেয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার রায়ত ও চাষীদের সর্বনাশের অন্যতম কারণ তা বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। জমিদারেরা ন্যায় ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে কাগজে-কলমে খাজনার হারের চেয়ে অনেক বেশী খাজনা আদায় করতেন। বর্ধিত হারে খাজনা আদায় ছাড়া বলপূর্বক 'আবওয়ার' আদায় করার জন্য জমিদাররা প্রজাদের উপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে সচেতন ছিলেন তাই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেন—

"লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরো গুরুতর সর্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমিদারদিগের জমিদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমিদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমিদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে, এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কন্ট্রাকটরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।....

তাহাতে কি হইল? জমিদারেরা যে প্রজাপীড়ক সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী, জমিদারেরা কস্মিনকালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিশ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন।....ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদের এই প্রথম কপাল ভাঙিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র।"[৬]

ভূমিতান্ত্রিক সমাজে রায়ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। আধুনিক ভারতের এই শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী জমির উপর রায়তের স্বত্ব-স্বামিত্ব স্বীকার

করেছিলেন এবং মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস ও তার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। সঞ্জীব বা বঙ্কিম জমিদার ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। কিন্তু জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা কোনদিনই ছিল না। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন—

"আমার জন্মগত পেশা জমিদারী। কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষ নেই, গৌরবও নেই।"[৭]

প্রমথ চৌধুরী ও জমিদার বাড়ির ছেলে কিন্তু তিনি কৃষক-শোষণ সম্পর্কে নীরব ছিলেন না। বাংলাদেশে দশশালা বন্দোবস্ত (১৭৮৯) ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পরিণাম এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর হাতে ইতিহাস সাহিত্য-সুষমায় মণ্ডিত এবং রায়তদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে একজাগায় বলেছেন—

"রায়তের ভাবনা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকার চর্চা নয়, এর ভালো ভালো নজির আছে। বাঙালীর মধ্যে যে শ্রেণীর লোকেদের আমরা গুরু বলে মান্য করি, তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথায় ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন।"[৮]

প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য কিন্তু তাঁর উদ্ধৃতির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম নেই, অথচ যিনি অনেকের চেয়ে বেশি করে রায়তের কথা ভেবেছিলেন, রায়তদের হয়ে ওকালতি করেছিলেন এবং যাঁর লেখায় মানুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি উচ্চারিত হয়েছিল। নবযুগের চেতনার পরিচয়বাহী 'বেঙ্গল রায়ত' এর মতো পুস্তকখানি কেন যে প্রমথ চৌধুরীর চোখে পড়ল না, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

একথা অনস্বীকার্য যে ইংরাজ রাজত্বে রায়তদের অধিকার ও দায় সম্পর্কিত আইন ও বিষয়গুলি আলোচনা করে সঞ্জীবচন্দ্র সামাজিক দায়িত্ববোধের

অসামান্য পরিচয় দিয়েছেন।

২

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্রের 'Bengal Ryot' প্রকাশিত হয়। আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে। বইখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি বলেই বইখানি জনসাধারণের কাছে এখনো পর্যন্ত অনালোচিত থেকে গেছে। অথচ এই অমূল্য পুস্তকখানির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের ইতিহাস সচেতনতা ও সামাজিক জ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষত, বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস ও রায়তের সমস্যা আলোচনায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই বইখানি রচনার সময় সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ই বলেছেন যে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভার জলন্ত স্বাক্ষর—'Bengal Ryots'।[৯] পুস্তকখানি প্রকাশের পর সম্ভ্রান্ত মানুষদের হাতে হাতে শোভা পায় এবং সাহেব মহলে আলোড়িত হয়। Revenue বোর্ডের সম্পাদক চাপমান সাহেব নিজে 'Calcutta Review' পত্রিকায় 'বেঙ্গল রায়ত'-এর সমালোচনা করে লিখে-ছিলেন—'This impretending little book is a valuable addition to our literature upon the important subject on which it threats.'

সাহিত্য হিসাবে 'বেঙ্গল রায়ত'-র অবদান মানুষ ভুলে গেলেও কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে রায়ত-জীবনের রক্তঝরা কাহিনীর ইতিহাস ভুলবে না। যাই হোক, R. P. Chapman বইখানির বিষয়বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে সমালোচনা করেন। প্রথম ভাগে, বইখানির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ও দ্বিতীয় ভাগে প্রজাদের খাজনা সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথম 'Portion'-এ লিখেছেন—

'The historical portion displays a very creditable amount of research, and a considerable, though perhaps a rather theoretical than practical, acquaintance with the subject.'

বস্তুত, সঞ্জীবচন্দ্র ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে ইংরেজ রাজত্বে সামাজিক বিবর্তনের ছবি অঙ্কন করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে তাঁর মন্তব্য স্মর্তব্য —"the precis of the Rent as they now stand less valuable'.

বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' (১৮৯৩) সংকলনে 'বেঙ্গল রায়ত' এর পরিচয়

দিয়ে লিখেছিলেন—'এই পুস্তকখানি ইংরাজীতে লিখিত। এখানকার পাঠক জানেন না যে এ জিনিষটা কি?' ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। সেইকালে 'বেঙ্গল রায়ত'-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব চাপমান সাহেব স্বীকার করলেও, সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালেই এই পুস্তকখানি শিক্ষিত পাঠকের কাছে স্মৃতি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশিত হয়নি। অথচ রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসও এই পুস্তকখানির বিষয়বস্তু।

(১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্বতন অবস্থার বিবরণ।

(২) ইংরেজদের আমলে প্রজাদের সম্পর্কে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন হয়েছিল, তার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার সম্পর্কে লেখকের সুলিখিত অভিমত ব্যক্ত করা।

(৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচারে অত্যাচারিত রায়তের অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(৪) প্রজাদের উন্নতিকল্পে কি করা কর্তব্য, তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পুস্তকখানির অসাধারণ গুরুত্ব স্বীকার করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "অনেক ইংরেজ বলিলেন, যে ইংরেজরাও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরানী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুলবেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন,—এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক।"[১০]

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পরও বইখানি out of print হওয়ায় বঙ্কিম দুঃখ-প্রকাশ করে বলেন—"এই গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে, Hills Vs Ishwar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।"[১১]

'Bengal Ryot'-র এ author's preface-এ সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছিলেন—'The following compilation is presented to the public in the hope that it will supply a desideratum." অর্থাৎ প্রজাগণের বহু আকাংক্ষিত বিষয় এই পুস্তক থেকে জানা যাবে। পূর্বাভাসে সঞ্জীবচন্দ্র কোন উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি লিখতে উদ্যোগী হন তার আভাষ দিয়েছেন,—"There are many valuable works on the law of Landlord and Tenant in Bengal—but, while giving ample details of the Procedure,

it was not within the scope of any of them to refer to the principles which have guided legislation on the subject, or to the historic changes which have, in process of time revolutionised the legal and social relation between two of the most important sections of the community.

To understand a result, we must always go to its antecedents and its precursors—there to seek its causes—we must study the revolutions which have led to it—and estimate its value by the light of the past. The compiler felt that it had not been hitherto attemptedto treat the existing Law of Landlord and Tenant in this spirit ....

"Sensible that his own limited powers are unequal to so ambitious a work, he has still presumed to lay before the public an Elementary Treatise on the Substantive Law, illustrated by legislative history, in the hope that it may serve as an introduction to a study of the subject in greater detail, and that till some one more competent to the great work undertakes it, his humble book will place in the hands of the members of the profession—of students and other enquires ...of the propertied class—and of the public at large information not generally available.

"The object of this compilation has, therefore been to avoid procedure as much as possible, and to state the substantive Law, illustrated by the history of Legislation, and the principles which have guided it. It has, however, been sometimes necessary to advert to questions; of procedure in order to explain the Substantive Law itself; and on these occasions procedure has not been avoided.

"The compiler has to claim the indulgence of his readers for the many defects of his work. The most prominent is

doubtless that which results from his having to write in a foreign language. A work of the kind to be useful must be written in English—and the compiler had no choice. The disadvantage is great—and doubtless the reader will bear with his English patiently. If he proves every where intelligible all he aimed at will have been gained."[১২]

পূর্বাভাসে সঞ্জীবচন্দ্র বাংলার রায়তদের অধিকার ও দায় সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্য কি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। জমিদার ও প্রজাদের আইন সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি এই পুস্তকখানি রচনায় ব্রতী হয়েছেন এবং এই নতুন খাজনা আইন প্রণয়নের আগে পুর্বেকার আস্থা কি ছিল কিংবা সমাজে প্রজায় জমিদারে সামাজিক ও আইনানুগ সম্পর্ক কিরূপ ছিল তা অতীতের আলোয় পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া ইংরেজ রাজত্বে জমিদার ও প্রজাদের সম্পর্কিত যে সকল আইন বসানো হয়েছে তার Elementary Treatise গুলির ভালমন্দ বিশ্লেষণ করা, যার ফলে জনগণ, ছাত্র ও শিক্ষক ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে প্রজাদের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হতে পারেন তারই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি লেখা। ইংরাজী ভাষায় বইখানি লেখার জন্যে সর্বসাধারণের কাছে পৌছাবে না লেখকের এরূপ সন্দেহ ছিল। অথচ, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই ইংরাজীভাষায় লেখা ছাড়া উপায়ও ছিল না—সেকথাও সঞ্জীবচন্দ্র পুর্বাভাসে উল্লেখ করেছে—'A work of the kind to be useful must be written in English—and the compiler had no choice."[১৩]

পূর্বাভাসে সঞ্জীবচন্দ্রের বক্তব্যে রায়ত-জমিদার উভয় সমাজের 'legal and social relation' রক্ষার প্রয়াস লক্ষণীয়।

তিন

'বেঙ্গল রায়ত' গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ নাম : 'Bengal Rytos, Their Right and Liabilities—Being an Elementary Treatise on the Law of Landlord and Tenant' By Sunjeeb Chunder Chatterjee.

Printed by D' Rozario and Co., 8, Tank Square, Calcutta, 1864.

পুস্তকখানি ১৮৮৪ সালে, কোলকাতা, ডি. রোজারিও এ্যাণ্ড কোং ৮, ট্যাংক স্কোয়ার থেকে ২৮শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

পুস্তকখানির সূচীপত্র নিম্নরূপ :—

লেখক পূর্বাভাসে (Author's Preface) গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশের 'রেঁনেসাঁস' যুগের প্রধান প্রধান চিন্তানায়কদের মতো সঞ্জীবচন্দ্রেরও বক্তব্যে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল এই দুই পরস্পরবিরোধী মানসিকতা লক্ষণীয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রায়ত কারা ও তাদের শ্রেণীবিন্যাস; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর আগে রায়তের অবস্থা,—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কুফল ও রায়তদের উপর তার প্রতিক্রিয়া, তাদের বর্তমান অধিকার ও দায় প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে এবং সংকলনের পরিকল্পনার কারণের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু রাজত্বে রাজা জমির মালিক ছিলেন না, আবার মুঘল রাজত্বে ভূমির বাৎসরিক উৎপন্নের কিছু অংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল, তবে মুঘল রাজত্বের শেষেরদিকে চুক্তি প্রথার রাজস্বকরণের (revenue farming) প্রথা (contract method) প্রচলিত ছিল। রাজস্ব আদায়ের এই contract method রায়তদের পক্ষে শুভসূচক ছিল না বলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

আমলে কর্ণওয়ালিস দশশালা (১৭৮৯) ও 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপকার হলেও রায়তদের কোন আর্থিক পরিবর্তন ঘটেনি। সঞ্জীবচন্দ্র ভূমিকায় তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্বন্ধে বলেছেন : The progressive state of education and commerce is fast raising up a middle class, but the condition of the Ryot nevertheless remains materially unchanged।

প্রথম অধ্যায়ে (What is Rent) 'খাজনা কাকে বলে' আলোচনা করা হয়েছে। ম্যালথাসের সংজ্ঞাটি হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে—ম্যালথাসের খাজনাতত্ত্ব ও মিল কর্তৃক তার ব্যাখ্যা—এই তত্ত্ব ভারতে প্রযোজ্য নয়—হাই-কোর্ট কর্তৃক বাংলাদেশে এই তত্ত্বের প্রয়োগ—হাইকোর্ট কর্তৃক এই খাজনার সমন্বয় সাধন—১৮৫৯ সালের দশ আইনে এই খাজনার অসামঞ্জস্য প্রভৃতি বিষয়-গুলি আলোচিত হয়েছে। এই আইনে একদিকে যেমন ১২ বছর একাধিকক্রমে খাজনা দিলে রায়তকে উচ্ছেদ করা যাবে না, অন্যদিকে জমিদার যেন খাজনা বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় অনুচ্ছেদে (Rate of Rent)—১৮৫৯ সালের দশ আইনের ধারার প্রতি লর্ড ক্যানিং-এর মন্তব্য ও এই ধারায় রায়তদের সুবিধার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই ধারার বলেই রায়তরা জমি নিলে পাট্টা বা কবলতী নেবার সুযোগ পেত। রায়তরা, 'Right of occupancy' এই ধারার বলেই পেয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে (Enhancement of Rent) খাজনা বাড়ানোর বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় ১৯০৩ সালের কোডে এই খাজনা বাড়ানোয় বিভিন্ন রায়তদের দায় ও অনাদায়,—পরবর্তী আইন—১৮৫৯ সালের একাদশ ধারায় খাজনা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়, ফলে জমিদারগণ খাজনা বাড়িয়ে রায়তগণকে নাজেহাল করার সুযোগ পায় ও কালেক্টারের মনের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে (Abatement of Rent) খাজনার হার কমান সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। খাজনার হার কমানোর সূত্র—প্রত্যেক রায়ত বা প্রজার খাজনা কমানর দাবীর অধিকার আছে কিনা।

পঞ্চম অধ্যায়ে (Payment of Rent) খাজনা মেটানো সম্পর্কিত আলোচনা আছে। 'পাট্টা' ব্যবস্থা নিয়মিত করা—রসিদ দেওয়ার দায়িত্ব—জমিদার যদি খাজনা না নেন—রায়তের করণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আইনের প্রথম অনুচ্ছেদে (Ryot's Liability to Eject-ment and cancelment of their tenures) রায়তদের প্রজা উচ্ছেদ ও তাদের ভোগদখলে বঞ্চিত করলে মামলা দায়ের করা সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। খাজনা না দিলে প্রজা উচ্ছেদের মামলা—পুরাতন আইনানুসারে জমিদার নিজের কর্তৃত্বে প্রজা উচ্ছেদ—১৮৫৯ সালের দশ আইনের বলে সেই কর্তৃত্ব খণ্ডন—রাজস্ব বাকীর ফলে জমিদারী বিক্রী হলে উচ্ছেদের মামলা—মিঃ হল্ট ম্যাকেঞ্জি কর্তৃক অবিচারের সমালোচনা—১৭৯৩ সালের জমিদারী বিক্রীসংক্রান্ত আইনের উন্নতিকরণের প্রস্তাব ও ভারত সরকারের সমালোচনা। ১৮৪১ সালের ১২ ধারার প্রয়োগ—লর্ড অকল্যাণ্ডের সমালোচনা। পুনরায় ১৮৪৯ টাপিপে ভোগদখলের অধিকারের নিরাপত্তা খণ্ডন—মিঃ এইচ. রিকেটে এই বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে (আইনের ২নং অনুচ্ছেদ) ১৮৫৯ সালে ১১ আইনের ধারার সর্তানুসারে 'অকশন' (নীলাম) ক্রেতার কর্তৃত্বে ভোগদখলীকারদের রেজিষ্ট্রিভুক্ত —তার প্রকৃতি ও ফলাফল—কোন শ্রেণীর ভোগদখলীকারের রেজেষ্ট্রিভুক্ত হতে পারে—বিক্রী আইনে রায়তদের অধিকারের দাবীতে কতখানি ফল হয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়ে (Personal Liability of the Ryot) প্রজাদের ব্যক্তি-গত দায় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। মূলতঃ প্রজাগণ ব্যক্তিগত দায়বদ্ধ নয়। মুসলিম শাসনব্যবস্থা থেকে তারা দায়বদ্ধ হয়—১৭৯৩ এর ১৭ ধারা অনুসারে তাদের শারীরিক শাস্তি হতে মুক্ত করা হয়।

১৭৯৫ এর ৩৫ ধারা ও ১৭৯৯ এর ৭ ধারার সর্ত প্রজাদের উপস্থিতি থাকার বাধ্যবাধকতা সর্ত ১৮৫৯ সালের দশ আইনে বিলোপ—দশ আইনের বলে জোর করে খাজনা আদায় করলে শাস্তিবিধান এবং পেনাল কোডেও ঐ একই কারণে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

অষ্টম অধ্যায় (Liability of properity of Distraint)—মালক্রোক সম্পত্তির দায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মাল ক্রোক হল বিশেষ ধরণের খাজনা আদায়ের পদ্ধতি—কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় —'এই চাপ অস্বাভাবিক নয়—এই অত্যাচার থেকে আইন কতখানি সহায়তা করে—বিষয়সংক্রান্ত দায় সম্বন্ধে পুরাতন আইনের শর্ত, এব্যাপারে ১৮৫৯ সালের দশ আইনের শর্ত—ক্রোকের অধিকার কাদের নেওয়া হয়েছে—মাল ক্রোকের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ও বিক্রয়।

নবম অধ্যায়ে (Right of Alienation by sale) বিক্রয়লব্ধ হস্তান্তরিত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভোগদখলীদার কোন্ সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে—এবং কোন্ সম্পত্তি পারবে না--তার বিবরণ—দখলকারী সম্পত্তির বিক্রয়ের অধিকার—জমিদারী সেরেস্তার রেজেষ্ট্রীকরণ—জমিদারের মতানুসারে দখলের বদল করা।

দশম অধ্যায়ে (Miscellaneous) বিবিধ বিষয়ের মধ্যে রায়তেরা জমির পরিমাপ ও নিজের কাছ থেকে জমির অধিকার পরিত্যাগ করতে পারা যায় কিনা তা প্রমাণের জন্য ১৮৫৯ সালের দশধারা আইন উদ্ধৃত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট। (১) প্রধান বিচারক স্যার বি পিকককের Hills Vs. Iswar Ghosh মোকদ্দমার (১৮৬৪, ১৭ই মার্চ) বিচারের রায়ের Review প্রদত্ত হয়েছে।

(২) মাননীয় বিচারক শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বিচারের Review প্রদত্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে এই দুটি রায়ের Review অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যে লেখকের ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার সম্পর্কে সম্ভ্রম পরিলক্ষিত হয়।[১৪]

লক্ষণীয় এই যে, সঞ্জীবচন্দ্র 'বেঙ্গল রায়ত' পুস্তকখানিতে ১৮৫৯ সালের দশ-আইনের ধারাটির গুরুত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য প্রাচীন ভারত থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমিরাজস্ব নীতি ও বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। ইংরাজ আগমনের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ও প্রজাদের অবস্থার কথা উল্লেখ করে ১৮৫৯ সালের দশ আইনের ধারার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে কলম ধারণ করেছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে কর্ণওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্ত (১৭৮৯), শোর-গ্র্যান্ট-কর্ণওয়ালিশ বিতর্ক, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রচলনে ফিলিপ ফ্রান্সিসের কৃতিত্ব, চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় রায়তদের দুরবস্থা জমিদারদিগকে জমির মালিকানা প্রভৃতি বিষয়গুলি যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড মিন্টো ও লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রমুখ ইংরাজ শাসকের রাজত্বকালে জমিদার ও রায়তদের সম্পর্ক কেমন ছিল তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। লর্ড ক্যানিং-এর রাজত্বকালে (১৮৫৯) মিঃ কুরীর সুপারিশে 'Legislative Council'-এ রায়তদের খাজনার উপর কোর্ট বিল পাশ হয়। এই বিলটির নাম—১৮৫৯ সালের দশ আইন (Act of 1859) জনসাধারণের নিকট 'রেন্ট এ্যাক্ট্' নামে খ্যাত। লর্ড ক্যানিং এই বিলটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন—"the bill is a real and earnest

endeavour to improve the position of the Ryots of Bengal, and to open to them a prospect of freedom and independence which they have not hitherto enjoyed, by clearly defining their rights and by placing restrictions on the power of the Zamindars such as aught long since to have been provided".[১৫]

কিন্তু এই খাজনা আইন দ্বারা রায়তদের একটি মাত্র উন্নতি লক্ষিত হয় তা হলো—যদি কোন রায়ত ১২ বৎসর একাধিকক্রমে জমি ভোগ করে এবং জমিদারকে নিয়মিত খাজনা দেয়, তবেই রায়তকে উচ্ছেদ করা যাবে না কিন্তু জমিদারগণ ইচ্ছা করলেই খাজনা বৃদ্ধি করে রায়তগণকে নাজেহাল করার সুযোগ পায়। আর সবচেয়ে ত্রুটি হল যে জমি জরিপ করে প্লট অনুযায়ী রেকর্ডে রায়তের নাম না থাকলে কাগজে কলমে অধিকার থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রায়তের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই আইনের বলে রায়তদের তিনভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় এবং তাদের অধিকারের স্বত্ব (right of occupancy) প্রদান করা হয়।

সঞ্জীবচন্দ্র 'রেন্ট কমিশনের' Report থেকে এই (১৮৫৯ সালের দশ আইন) খাজনা আইনটি উদ্ধার করে রায়তগণের প্রভূত উপকার সাধন করেন। কারণ হাইকোর্টের আইনজীবীরা এই পুস্তকখানি পাঠ করে রায়ত-জমিদার সম্পর্কিত অনেক তথ্য জানতে পারতেন এবং রায়তদের পক্ষে ওকালতি করবার সুবিধা হত। সঞ্জীবচন্দ্র 'বেঙ্গল রায়ত' গ্রন্থে ব্রিটিশ আমলের ভূমিরাজস্বনীতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকটি উন্মোচন করিলেন। তারপর রায়ত সম্পর্কে এরূপ তথ্যপূর্ণ রচনা একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) 'The Peasantry of Bengal' ছাড়া আর রচিত হয়েছে কিনা জানা নেই।

চার

'বেঙ্গল রায়ত' পড়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ উপহার দিয়েছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরে সঞ্জীবচন্দ্র ঐ চাকরি পান। চাকরী পাবার আগে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও জজ-সাহেবগণ বইখানি পড়ে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রশংসা করে চিঠিপত্র দেন। সঞ্জীবচন্দ্রের 'Bengal Ryot' বইখানি হাতে পেয়ে তখনকার কোলকাতা হাইকোর্টের

কর্মরত প্রধান বিচারপতি তাঁর ধন্যবাদজ্ঞাপন করে চিঠি লেখেন ১৩ই জুলাই, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। চিঠিতে বিচারপতির সচিব লেখেন—'The officiating chief justice begs to thanks Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee for the copy of his book a Bengal Ryots which the Baboo has been kind enough to send him'.[১৬] বইখানি রচনার সময় সঞ্জীবচন্দ্র প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। ব্রিটিশপূর্ব ও পরবর্তীকালের আইন-সংক্রান্ত নথিপত্র খুঁজে প্রজাদের অধিকার ও দায় সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করে অনেকের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছিলেন।

তিনি বইখানিকে দশটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। কি গভীর পড়াশুনা ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তা করেছিলেন, বইখানির 'foot notes' থেকেই তা বোঝা যায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ব্রিটিশ গবর্নর জেনারেল কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গঠনে, জমিদার ও প্রজাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির 'একটি সাহসিকতাময় ও বিজ্ঞ ব্যবস্থা' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ব্যবস্থার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায়ে সুবিধা হত। দ্বিতীয়ত, জমিদারগণ জমিতে স্থায়ী অধিকার পেয়ে সরকারকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় দিত। তৃতীয়ত, রাজস্ব আদায়ের স্থিতি দেখা দেয়। চতুর্থত, কোম্পানীর অনুগত জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তের দুরবস্থা বেড়ে যায়, কারণ জমিদারগণ জমির মালিকানা পেয়ে ইচ্ছামত খাজনা বাড়িয়ে দেয় এবং রায়ত বা প্রজাদের জমির স্বত্ব না দেওয়ায় জমিদারদের গোমস্তা নায়েবগণ জুলুম করে রায়তগণকে জমি হতে উচ্ছেদ করতে অসুবিধা হত না। কিন্তু ১৮৫৯ সালের লর্ড ক্যানিং-এর শাসনব্যবস্থায় দশ আইন (খাজনা আইন) জারী হওয়ায় রায়তদের প্রভূত উন্নতি লক্ষিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র সেই নয়া খাজনা আইনের (১৮৫৯-দশ আইন) তাৎপর্য উপলব্ধি করে 'বেঙ্গল রায়ত' পুস্তকখানি রচনা করে লর্ড ক্যানিং-এর ভূমিরাজস্ব নীতির সমর্থন জানিয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায়—

"It was during the administration of Lord Canning that the greatest concessions were made in favour of the Ryots. In 1857 Mr. Currie introduced in the Lagislative Council a Bill which was into Law in 1859, as the tenth Act of that years'.[১৭]

যদিও রেণ্ট কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। নতুন খাজনা আইন সম্পর্কে রিপোর্টখানির পত্রসংখ্যা ৫০৪। অনেকেই পড়বার সুযোগ পাননি, কিন্তু যাঁরা পড়বার সৌভাগ্য অর্জন করেন—তাতেই সকলেই প্রায় ক্ষুব্ধ। কেউ বলেছিলেন—যত রিপোর্টই কর, আর বিলই করা হোক না কেন, রায়তের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত না করলে কিছু হবে না কেউ কেউ বললেন আরে বাপু—যা ছিল, ভালই ছিল, আবার ঘুমন্ত বাঘ জাগানো কেন? কেউ মন্তব্য করলেন—প্রজার সর্বনাশ হল; প্রজাদের শোষণের কৌশল মাত্র, কেউ কটাক্ষ করে বলেছিলেন জমিদারের ক্ষতি হল।

সঞ্জীবচন্দ্র সমাজমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। সমস্ত কিছু প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 'দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চুক্তিতে যেসমস্ত চুক্তি জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল তা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশ আইনের প্রণয়নে তার প্রায় সবই লোপ পেয়েছিল। 'Calcutta Review' পত্রিকাতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশ আইন সম্পর্কে যা মন্তব্য করা হয়েছিল তা নিম্নে প্রদত্ত হল— 'The Permanent Settlement is a great accomplished fact in Bengal, and can already claim an antiquity of nearly a century, it has only just recovered from the position of unstable equilibrium into which it was—we still cling to the belief—unintentionally thrown by the Act of 1859. The elaborate draft bill in two parts is designed to upset it, it does not purpose this and that minor alternation in the multiform system of rights which has grown under the shadow of the permanent settlement, but it deliberately aims a decisive blow at its fundamental condition'.[১৮]

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই প্রজাই জমির মালিক। আমাদের দেশে যে মণ্ডল ও পাটোয়ারী প্রথা প্রচলিত ছিল তাতে প্রজার স্বত্বই সাব্যস্ত করা হত। জমিভোগের জন্য খাজনা দেশে ছিল না। মনু বলেছেন—'ধান্যানামষ্টমো ভাগ: ষষ্ঠ দ্বাদশ এব না'—অর্থাৎ ধানের ৬ ভাগ, বা ৮ ভাগ অথবা ১২ ভাগ রাজাকে করস্বরূপ দিতে হবে। রাজার জমি ভোগ কর আর নাই কর—রাজস্ব দেবার প্রথা ছিল। প্রজারা কিছু না কিছু রাজাকে দিত। এরূপ 'করের' নাম

রাজস্ব বা revenue কিন্তু খাজনা নহে। বৃটিশ সরকার যেমন নানাপ্রকার ট্যাক্স্ বসান, আমাদের চিরস্থায়ী ট্যাক্স্ ছিল—জমির খাজনা ছিল না। তারপর মুসলিম রাজত্বে প্রজার ট্যাক্স্ ছাড় দিয়ে ভূমির ট্যাক্স্ ধার্য হল। কিছু কিছু বেড়ে আকবরের সময় এক তৃতীয়াংশ দাঁড়ায়। এর নাম আসল জমা। মুসলমানেরা নানা ফিকিরে আরো কিছু আদায় করতে থাকে। তার নাম 'আবওয়াব'। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেওয়ানী পেয়ে অবধি এই 'আবওয়াব' আদায় করত। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর প্রথম আইন দ্বারা জমির স্বত্ব জমিদারকে দেওয়া হয়—এবং 'আবওয়াব' আদায় করা এককালীন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৪ ও ৫৫ ধারা অনুসারে জমিদার কোন অধিক কর আদায় করবে না প্রতিশ্রুতি দিলে গভর্ণমেণ্ট জমিদারদের চিরকালের মত ভূস্বামী বলে স্বীকার করে নেন। অতএব, 'দশশালা' বলতে কেবলমাত্র জমিদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, প্রজার সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায়। কিন্তু বাংলার জমিদাররা কি ধাতু দিয়ে গড়া ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ তা ভাবতে পারেননি—'It is equally certain that the right of the Ryots were not provided for the sufficient care'.

সঞ্জীবচন্দ্র যেমন প্রজাদের পূর্বেকার অবস্থা, হিন্দু-মোসলমান রাজত্বে প্রজাদের ব্যবস্থা, ইংরেজ আমলে প্রজাদের অবস্থা আলোচনা করেন, তেমনি পূর্বের তুলনায় ১৮৫৯ সালের দশ আইনে প্রজাদের উন্নতির জন্য কি কি সুবিধা অসুবিধা হয়েছিল তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি মনে করেন যে আইনে রায়তগণের fundamental right-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট—'How subsequent legislation sought to remedy this error, and improvement was eventually brought about by the second great adjustment of the rights of landlord and tenant, namely, the Act X of 1859, will be seen in the course of this compilation.'[১৯] তিনি মনে করতেন, প্রজাদের কেউ বন্ধু নেই, রায়তদের হয়ে দু-কথা কেউ বলবে এমন শিক্ষিত লোকের বড় অভাব। শিক্ষিত যুবকদল নানা কারণে জমিদারগণের অন্নদাসে পরিণত হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষায় দেশের যে উন্নতিই হোক না কেন তা রায়তদের কোনো স্বার্থে আসে নি। প্রজারা যদি নিজেদের

স্বত্ব ও অধিকার বুঝে না নেয় তাদের চিরকালই বঞ্চিত হতে হবে।

সঞ্জীবচন্দ্র বুঝেছিলেন—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রজাদের রক্ষার্থে নানাবিধ আইন করেও কিছু করতে পারবেন না, প্রজাগণ যদি নিজেদের স্বার্থ বুঝে না নিতে পারে তাহলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। তিনি ইংরাজ রাজত্বে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমল থেকে লর্ড কর্নওয়ালিশ, স্যার জন শোর, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড মিণ্টো, লর্ড মুর, লর্ড আমহার্স্ট, লর্ড বেণ্টিক প্রমুখ গভর্ণর মহাশয়গণ যে কর-নীতি প্রবর্তন করেন, তার আলোচনা করে, ১৮৫৯ সালের দশ আইনের সুফল ও কুফল পর্যালোচনা করেছেন। এবং এই আলোচনায় যাতে রায়তদের আত্মসচেতনতা আসে সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন।

চাপমান সাহেব "Calcutta Review' পত্রিকায় 'Bengal Ryots'-এর সমালোচনায় লিখেছিলেন:

"The truth is that the power of the wealthy class, the difficulties in the way of legislating in the interest of the Ryots, and above all, the strength of English traditions and convention upon the subject or property in the soil are too great for the Ryots to contend against. All the powers of the court of Directors, who ever maintained a constant policy in their efforts to protect the interests of the Ryots, all the desires of the majority of the successive Governments in India itself in the same direction, have proved ineffectual to secure the object they had in view".[২০]

রায়তদের পক্ষে এমন বলিষ্ঠ ও নির্ভীক বক্তব্য ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আর কোন বাঙালী লেখকের হাত থেকে বেরোয়নি এবং সাহিত্য হিসাবেও 'Bengal Ryots' এর অবদান কম নয়।

চাপমান সাহেব যথার্থই বলেছেন—'The unpretending little book is a valuabel addition to our literature upon the subject on which it treats'.[২১] তাঁর ইতিহাস-সচেতনতাবোধ ও অনুসন্ধিৎসা আলোচ্য গ্রন্থের পাতায় পাতায় দেখা যায়। তিনি রাশি রাশি পুস্তক পড়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। লেখার মধ্যে ইতিহাসের প্রবহমানতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে। দুর্বল,

অত্যাচারিত প্রজাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধ ও অনুকম্পা অবিস্মরণীয়, —'a genuine and patriotic effort to defend the cause of the weak against the strong.[২২]

গবেষক হিসাবে সঞ্জীবের কৃতিত্ব যাই হোক না কেন, তাঁর যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণকে তথাকথিত পণ্ডিতগণ স্বীকার না করলেও হাজার হাজার দুর্বলশ্রেণী প্রজাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ তাঁকে স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত, এই পুস্তকখানির লেখার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভূমিকায় পাঠককে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত, রায়তদের দুটি মূল অধিকার খাজনা কি এবং খাজনার সঙ্গে রায়তদের সম্পর্ক, খাজনা বাড়ানো হলে রায়তদের যে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিণতি ও জমিদারদের খাজনা বাড়ানোর কতোখানি অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি উত্থাপন করে তিনি রায়তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রায়তদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানে তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তাঁকে সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি মনে করেন—

"It is beyond question that the permanent Settlement has not been devoid of beneficial results. But it is equally certain that the rights of the Ryots were not provided for with sufficient care. How subsequent legislation sought to remedy this error, and improvement was eventually brought about by the second great adjustment of the rights of landlord and tenant, namely, the Act X of 1859, will be seen in the course of this complation.

"The fundamental right and obligation of the Ryot are, in point of fact, very simple ; the tenant who uses the land of another for his own benefit, has but a single Right to enjoy, and a single obligation to fulfil.

"The obligation he must fulfil is, that he should pay a consideration to the person whose land he uses, in other words, pay him a rent. The rent once paid, he has a right to enjoy the reminder of the fruits of his labour··· ···

"Thus his labour might have increased the productive powers of his land and it is but fair that it should not be in the power of a capricious or unjust landlord, to deprive him of the land which he has laboured to improve. Thus a secondary right, the right of occupancy may spring up from the firsr".[২৩]

রায়তের প্রতি ভাবনা কেন এবং কী ভাবে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যের ভাবনা হয়ে ওঠে, সে প্রশ্নের উত্তর এই উদ্ধৃতি থেকেই পাওয়া যায়।

পাঁচ

বাংলার নবজাগরণ যুগের মনীষার লক্ষণই হলো চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃতি। রাজা রামমোহন থেকে সঞ্জীব-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালী মনীষীরা সচেতন ও স্বাধীনভাবে মানুষের আর্থিক ও নৈতিক সমস্যার অনুধাবন করেন। সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে এঁদের দায়-দায়িত্বজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে। যেমন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী সিলেক্ট্ কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত ৫৪টি প্রশ্নের উত্তরদান কালে রামমোহনও জমিদারদের সর্বগ্রাসী লালসা থেকে প্রজাদের রক্ষাকল্পে খাজনা বৃদ্ধি নিষেধ করে ছয়দফা কর্মসূচীর সুপারিশ করেন। রামমোহনের চিন্তাধারায় অবশ্য রায়ত-জমিদার—এই উভয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের লেখনীতে রায়তদের অধিকার ও দাবীদাওয়ার বিষয়গুলি নতুনযুগের মননধারায় প্রতিফলিত। জমিদারেরা স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে খাজনা বৃদ্ধি করেন, বলপূর্বক 'আবওয়াব' আদায় করেন, এই সমস্ত অপকৌশল থেকে রক্ষার জন্য সঞ্জীবচন্দ্র লেখনী ধারণ করেছিলেন। তিনি কখনো জমিদারের খাজনা ফাঁকি দেবার পরামর্শ রায়তদের দেননি, আবার জমিদারদের হয়ে ওকালতি করেননি। রায়তদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসলের যেন তারা অধিকার পায়, তারই জন্য সঞ্জীবচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত প্রভুদের কাছে রায়ত-শোষণের করুণচিত্র তুলে ধরেছিলেন। রায়তের রক্ষার স্বার্থে রায়তীস্বত্বের দাবী তাঁরই লেখনীতে প্রথম সোচ্চারিত হয়েছে। রায়ত-সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রয়াস গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয়বাহী।

নির্দেশিকা

১। Mohit Moitra—A History of Indian Journalism, P 54.

২। The Ecnomic History of India render British Rule—Victorian age. R. C Dutt

৩। Capital-Vol. III Karl Marks

৪। বাংলাদেশ ভূমিব্যবস্থা : ভূমিকা—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৫০, ৭ই এপ্রিল।

৬। বঙ্গদেশের কৃষক—বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ২৬৮-৯. ২৭০-৭১।

৭। রায়তের কথা : আষাঢ়-১৩৩৩, কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ।

৮। রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী-প্রবন্ধসংগ্রহ (১৯২০-ফাল্গুন)

৯। সঞ্জীবনী সুধা (১৮৯৩)-বঙ্কিমচন্দ্র

১০। সঞ্জীবনী সুধা (১৮৯৩)—বঙ্কিমচন্দ্র

১১। সঞ্জীবনী সুধা (১৮৯৩)—বঙ্কিমচন্দ্র

১২। Author's preface—'Bengal Royts'-Calcutta, 28th April, 1864

১৩। ঐ

১৪। প্রথম 'Review' টি ১৮৬৪ সালের ৩১ শে মার্চের Englishman পত্রিকা থেকে সংগৃহীত. দ্বিতীয়টি ঐ একই পত্রিকার ১৮৬৪ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে গৃহীত হয়।

১৫। Bengal Ryots : Rate, of Rent Chapter/II.

১৬। মূল চিঠিখানি নৈহাটির 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায়' রক্ষিত আছে।

১৭। Lord Canning remarked to this act (His Lordships resolution of the 29th April, 1859) — 'The Bill is a real and earnest endeavour to improve the position of the Ryots of Bengal.

—Bengal Ryots (Ch. II) —(Rate of Rent)
Sunjeeb Chunder Chatterjee.

১৮। দ্রষ্টব্য—বঙ্গদর্শন-১২৮৭ কার্ত্তিক: নূতন খাজনার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ-এর মত।

১৯। Bengal Ryots' (In traductton)

২০। Calcutta Review (Vol. XXXIX,No LXXVIII, pp. 442-446).

২১। Calcutta Review (Vol. XXXIX. No LXXVIII, pp. 442-446).

২২। Bengal Ryots—"Introduction—plan of the compilation.

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ-নিবন্ধ

শৈশবেই সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ জেগেছিল প্রবন্ধ লিখে। শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর'[১] পত্রিকায় তাঁর দু-একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। "প্রাবন্ধিক সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে পাঠকগণ পরিচিত হলে বুঝতে পারবেন, তথ্যবহুল যুক্তি শৃংখলাকে নিবন্ধ রচনায় ব্যবহার করে কৌতুকপ্রবণ, রসিক-শিল্পী সঞ্জীবচন্দ্র একটি দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।[২] দেশকালের পটভূমিকায় তাঁর বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টি ও সামাজিক ভাবপ্রবাহ বিশ্লেষণের যে মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সম্যক বিচার আজো হয়নি। যুগজীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে রূপদান করেছিলেন, প্রবন্ধকার সঞ্জীবচন্দ্রও বিচিত্র নিবন্ধ রচনার দ্বারা নিজস্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং নিরাবরণ নিরাভরণ ভাবেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর থেকেই সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর নাম গোপন রেখে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন এবং 'বঙ্গদর্শনে'র পাতাতেই 'যাত্রা' প্রবন্ধ দিয়ে তাঁর মননশীল নিবন্ধ রচনার সূত্রপাত। প্রবন্ধের দুটি অংশ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১২৭৯ সালের পৌষ ও ১২৮০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায়। 'যাত্রা' প্রবন্ধের তৃতীয় অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভ্রমর' পত্রিকার ১২৮২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' পত্রিকার সম্পাদনাকালে পত্রিকার পৃষ্ঠা পুরণ করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও বিবিধ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং সমকালীন যুগের ধর্ম, ইতিহাস, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রাবন্ধিক সঞ্জীবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজিতে লেখা তাঁর 'বেঙ্গল রায়ত' ছাড়া তিনি 'বৈজিকতত্ত্ব'[৩] নামে একটি দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। সমাজবিবর্তনমূলক এ ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সঞ্জীবচন্দ্রের পূর্বে কেহই রচনা করেননি। এই প্রবন্ধটি বহুদিন বঙ্গদর্শনের'র ছেঁড়া পাতায় আত্মগোপন করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সঞ্জীবনী সুধায়' তার উল্লেখ করায় আমরা তা জানতে পারি যে এটি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা। তাছাড়াও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত 'ভ্রমর' 'স্ত্রীজাতি বন্দনা', 'ভারত ভাণ্ডারী', 'একঘরে,' 'দুর্গাপূজা'।'সংকার' বাহুবল', 'কীর্তন' 'বাল্য-বিবাহ,' 'ভূতের সংসার' 'অকাতরে বিবাহ', 'আনার বল্লী' প্রবন্ধগুলি

উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলি 'ভ্রমরে' প্রকাশিত হলেও লেখকের নাম ছিলনা। এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধকার হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় উদ্ভাসিত। 'ভ্রমরে' প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধই যে সঞ্জীবচন্দ্রের তারও ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্রের' সঞ্জীবনী সুধায়' উল্লেখ করতে ভোলেন নি।' এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য স্মর্তব্য বলে মনে করি—"তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) ভ্রমর' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাতে বিলক্ষণ লাভও হইল। এখন আবার তাহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ সচরাচর করিতেন না।"[৪]

'ভ্রমরে' প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্র রচিত প্রবন্ধগুলির একটি তথ্য পাওয়া গেছে— 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায়'। পুরাতন 'ভ্রমর' পত্রিকার ১৭টি খণ্ডই একত্রে বাঁধানো আছে। তাতে কোন লেখাগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের ও কোন্ লেখাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের তার একটি বিশ্বাসযোগ্য সূচীপত্র[৫] সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শতঞ্জীবচন্দ্র নিজ হাতে লিখে রেখে গেছেন. শতঞ্জীবচন্দ্রের লেখক-তালিকা থেকে আমরা অনেক অজানা মূল্যবান তথ্য জানতে পেরে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধের বহুবিস্তৃত পরিচয় পাই। এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে সহজেই ধরা পড়বে যে এগুলি লেখকের নিজস্ব ঢঙে রচিত। ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে সহজবোধ্যতা অনায়াস লক্ষণীয়। অধিকন্তু, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'পদোন্নতির পন্থা, (১২৮৫ চৈত্র) 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' (১২৮৭ বৈশাখ), 'গৃহসন্ন্যাস' (১২৮৭ চৈত্র) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি আজও কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। লেখকের স্বহস্তে লেখা 'পদোন্নতির পন্থা[৬] প্রবন্ধের ছিন্ন-পাণ্ডুলিপি ছেঁড়া অবস্থায় এখনো ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম[৭] প্রবন্ধটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা তার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। প্রথমত, পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠি থেকে সেই তথ্য জানা যায়।

দ্বিতীয়ত, 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্মে'র[৮] ছেঁড়া পাণ্ডুলিপির অংশ যা লেখকের স্বহস্তে লিখিত, তা এখনো সংরক্ষিত আছে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ-শালায়'। 'গৃহ সন্ন্যাস' প্রবন্ধটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা তা 'বঙ্গবাণী' (১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ) পত্রিকার পুস্তক পরিচয় বিভাগ থেকে জানা যায়। বসুমতী মন্দির থেকে প্রকাশিত ,সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়—

"সঞ্জীবচন্দ্রের অন্য বিশিষ্টতার কথা বলি—তিনি অযথা কথা ফেনাইয়া রচনা বাড়াইতেন না। তিনি অতি অল্পকথায় তাঁহার 'গৃহসন্ন্যাস' প্রবন্ধে আসল ভাব জমাইয়াছেন। একজন সাহিত্যিক কৌশলওয়ালা উহা লিখিলে প্রবন্ধটির আয়তন দশগুণ বাড়িত। সমালোচিত গ্রন্থাবলীতে এই 'গৃহসন্ন্যাস'টি নাই। আরও কয়েকটি সুচরিত প্রবন্ধ নাই। এটা ত্রুটি। "উপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল যে 'গৃহসন্ন্যাস' সঞ্জীবচন্দ্রের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ।

এছাড়া 'ভ্রমরে, প্রকাশিত 'একঘরে' (১২৮১ শ্রাবণ) ও নিদ্রা (১২৮১ বৈশাখ) ও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'চাকরির পরীক্ষা' (১২৮৭ পৌষ)' 'ভূতের জাতি' (১২৮৭ শ্রাবন) প্রবন্ধগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের বলে মনে হয়।[৯] বঙ্কিম-জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রচার'[১০] পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরকাল, (১২৯২ মাঘ), বিবাহের ঘটকালি'[১১] (১২৯৩ অগ্রহায়ণ-পৌষ), 'একটি পরের কথা' (১২৯৩ ফাল্গুন) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালে কেবলমাত্র 'যাত্রা সমালোচনা' পৃঃ ৩৬ (১০ই জুলাই ১৮৭৫), 'সংকার' পৃঃ ১২ (১৮৯১) ও 'বাল্যবিবাহ' পৃঃ ১২ (১৮৮২) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর রচিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলি একত্রে সন্নিবেশিত করে আজ পর্যন্ত কোন সংকলন প্রকাশিত হয়নি এবং তাঁর প্রবন্ধের গুণগত উৎকর্ষ বিচারও আজো অসম্পূর্ণ। সঞ্জীবের প্রতিভার ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে হলে তাঁর মনীষাদীপ্ত প্রবন্ধগুলির অনুসন্ধান করতে হবে।

দুই

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তৎকালীন দেশ-কালের কথা মনে রাখতে হবে। সঞ্জীবচন্দ্রের আগেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পূর্ববর্তী গদ্যলেখকদের সমস্ত লেখাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাবন্ধিকদের বেশিরভাগ রচনাই উদ্দেশ্যমূলক। সেযুগে বিখ্যাত প্রবন্ধকার কালীপ্রসন্ন ঘোষের খ্যাতি সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁর উচ্ছ্বাস, হৃদয়াবেগ ও কাব্যিক প্রকাশভঙ্গি প্রবন্ধগুলিকে দুর্বল করেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলির বিশ্লেষণদক্ষতা ও যুক্তিনিষ্ঠা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু মননশীলতা ও পাণ্ডিত্য তাঁর প্রবন্ধের রসে মণ্ডিত করতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমত প্রবন্ধসাহিত্যকে উচ্চতর সাহিত্যিক মর্যাদা দান করেন। প্রাবন্ধিকদের পক্ষে বক্তব্যের ভারসাম্য রক্ষা একান্ত অপরিহার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সেই সাহিত্যিক গুণ অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের আত্মিক যোগ ছিল; সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারীতি অনেকাংশে বঙ্কিম-প্রভাব অনুস্যূত,—যদিও সঞ্জীবের নিজস্ব ভাবনা ও বিশিষ্ট স্টাইলের ক্ষেত্র সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতা, মৌলিক চিন্তা ও উচ্চাঙ্গের ধ্যান-ধারণা তাঁর ভাষা ও শৈলীকে সমৃদ্ধ করেছে, সে তুলনায় সঞ্জীবচন্দ্র চিন্তাধারার লঘু ভাবের সঙ্গে বিষয়ের সঙ্গতি রেখেই তাঁর রচনাশৈলী গড়ে উঠেছে। বিষয়ের দিক থেকেও তার প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সমালোচনা (২) সামাজিক প্রবন্ধ (৩) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ (৪) ধর্ম ও দর্শন (৫) ইতিহাস ও অর্থনীতি (৬) বিজ্ঞান বিষয়ক।

মূলত ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে গভীর সংস্পর্শের ফলে নবযুগে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রই আধুনিক সাহিত্য সমালোচকদের আদি পুরুষ বলে মনে হয়। সঞ্জীবচন্দ্রও তার প্রথম 'যাত্রা' সমালোচনার মধ্যে তার ব্যক্তি মানসের দিকটি উদ্ভাসিত করেছেন। 'যাত্রা' সমালোচনার মধ্যে লেখকের মানসিক অবস্থা ও মেজাজ প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রথম প্রবন্ধেই তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'যাত্রা সমালোচনা' পুস্তিকার তিনটি প্রবন্ধেই লেখকের সরসতা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ ভাষাশৈলীর মধ্যে ধরা পড়েছে—

"বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয় সেইটুকু বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন, নাচিয়া তদ্বিষয়ক দুই একটি গীত গাহিয়া থাকেন; অথবা অধীরা হইলে হীরা মালিনীর সহিত দুটা রহস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এইরূপ।" (যাত্রা সমালোচনা-১ম প্রবন্ধ)

তৎকালীন সমাজে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার অভিনয় গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই অভিনয়ে নাচগান প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেকালের যাত্রার কুরুচিপূর্ণ দিকগুলি দেশবাসীর কাছে বিচিত্র কৌশলে লেখক পরিবেশন করেছেন। সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য অত্যন্ত লঘুভাবের বিষয়বস্তু নিয়েও ব্যঙ্গ ও রসিকতায় প্রবন্ধকার তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। বিদ্যাসুন্দরের বিচ্ছেদের মধ্যে ট্রাজেডির আবেগোচ্ছ্বাস

প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু দর্শকের অনুভূতিকে নাড়া দেয়না, সাড়া জাগায় না। তাই লেখকের মনে হয়েছে—"সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকাদির উন্নতি হইয়া থাকে। এথেন্স (Athens) স্পেন ও ইংলণ্ডের নাটকাদি তাহার প্রমাণ স্থান এবং কথিত আছে যে. ভারতবর্ষেও হিন্দু রাজগণের সময়ে নাটকাদি বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" (১ম প্রবন্ধ)

তিনি 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' সমালোচনা প্রসঙ্গে 'কৃষ্ণযাত্রার' কথা উল্লেখ করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এককালে বাংলাদেশে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাস্তবিক. বাংলা নাট্যরচনার আদিরূপের নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কাহিনীর ঘটনায় সংস্থাপন, হৃদয়গ্রাহী সংলাপ চরিত্র চিত্রণের সার্থক প্রয়াস—অর্থাৎ সব মিলিয়ে অভিনয়োপযোগী পালা পরিস্ফুট হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'। কৃষ্ণ কাহিনী ও চৈতন্য জীবনী নিয়ে রচিত এখনকার দিনে যাত্রা গানের বিষয়বস্তু ছিল। চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত রাধাকৃষ্ণলীলার যে অভিনয় হত তাতে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' তাম্বুলখণ্ড. দানখণ্ড, ভারতখণ্ড প্রভৃতি অধ্যায়গুলি নাটকের অঙ্ক বিভাগের সমগোত্রীয়। বিষয়বস্তু যদিও শৃঙ্গার-রসাত্মক তথাপি রুচি বহির্গত কোন আদিরসের বাড়াবাড়ি লক্ষণীয় নয়, বরং কৃষ্ণযাত্রার রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী কালীয়দমন গোবর্ধন ধারণ পালায় অনেক ক্ষেত্রে ধর্মভাব ও ভক্তিভাব জাগরিত করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাপালায় এই ভাব পরিলক্ষিত হয় না। সঞ্জীবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত—"নাটক গুণাংশে কৃষ্ণযাত্রা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট"। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সুচিন্তিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। স্বসমাজ ও দেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের ফলে তিনি কলম ধরেছিলেন—"যে রচনা সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় সেই রচনা সমাজের তাৎকালিক রসগ্রাহিনী শক্তির পরিচয়স্বরূপ। রসহীন রচনা যদি সমাদৃত হইয়া থাকে তবে সে সমাজের রসাস্বাদন শক্তি সুমার্জিত হয় নাই। আর রসপূর্ণ রচনা যদি কোন সমাজে সম্মান পাইয়া থাকে, তবে অবশ্য সে সমাজকে রসজ্ঞ বলিতে হইবে। সেইরূপ যে নাটক বা যাত্রা জনসমাজের প্রিয় সে নাটক বা যাত্রার দ্বারা ঐ সমাজের রসজ্ঞতা অনুভব করা যাইতে পারে। যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের রসগ্রাহিনী শক্তি কতদূর পরিমার্জিতা হইয়াছে তাহা এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রাদি দ্বারা অনুভব হইতে পারে।" (১ম প্রবন্ধ)

'বিদ্যাসুন্দর যাত্রার' কবিত্ব ও রসজ্ঞতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মহাকবি সেকস্‌পীয়ারের 'ওথেলো' নাটকের অভিনবত্বের কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে বিস্ময়কর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। 'ওথেলো'র নাট্যগুণ সম্পর্কে তিনি যে সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন তাতে তার পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুগভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে।

"মহাকবি সেকস্‌পীয়রের প্রণীত 'ওথেলো' নাটকের নায়ক-নায়িকার প্রেম আদ্যোপান্ত বর্ণিত আছে। বিদ্যা যেরূপ পিতার অজ্ঞাতে সকলকে লুকাইয়া সুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন সেইরূপ ওথেলোর নায়িকা ডেসিডিমোনা আপন পিতার অজ্ঞাতে একজন অতি কুরূপ কাফ্রির প্রেমে বদ্ধ হইয়া তৎসমভিব্যাহারে পিত্রালয় হইতে পলায়ন করেন। বিদ্যা ও ডেসিডিমোনা এই উভয় নায়িকার প্রেমারম্ভ প্রায় একই প্রকার দোষাবহ। কিন্তু ডেসিডিমোনার কার্যে ব্যবহারে, কথায়বার্তায় চিন্তায় এত সরলতা, এত নির্মলতা এত পবিত্রতা প্রকাশ আছে যে, তাহা দেবদুর্লভ বলিয়া বোধ হয়।… যিনি ডেসিডিমোনাকে ভালবাসেন তিনি সতীত্ব ভালবাসেন। এক ডেসিডিমোনা চরিত্রে সতীত্বের সপক্ষে ইংলণ্ডে যাহা করিয়াছে সহস্র উপদেষ্টা একত্র হইয়া কস্মিনকালে তাহা পারিতেন না।"

বিদ্যা ও ডেস্‌ডিমোনা—এই দুটি চরিত্র আলোচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের রুচিবোধের ও কল্পনাশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সেক্‌সপীয়র সম্পর্কে যে অভিনব উৎসাহ জেগেছিল তা সাহিত্য-সমালোচনায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার শকুন্তলা ও মিরন্দা' ও 'শকুন্তলা ও ডেস্‌ডিমোনা'—প্রবন্ধদুটিতে কালিদাসের নাটকের সঙ্গে সেকস্‌পীয়রের নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করেন।

যাই হোক নাটক প্রসঙ্গে নৃত্যের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। পাশ্চাত্য নাট্যাভিনয়ে নৃত্যগীত সমন্বিত কোরাসের প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশের যাত্রাগানে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র 'যাত্রা' আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক নৃত্যের বাড়াবাড়ির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"যে কোন সমাজেই হউক নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালনজনিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়; কিন্তু বঙ্গসমাজে কেবল দেহের মধ্যভাগের সঞ্চালন জনিত দেহের যে ঘৃণিত আন্দোলন তাহাকেই নৃত্য বলে। কি লজ্জাকর

নৃত্য। বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছে ।' (যাত্রা সমালোচনা—২য় প্রবন্ধ)

আসল কথা, যাত্রা নাটকে সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। সঞ্জীবচন্দ্র সেই কালের বাঙালীর রুচিবোধ ও সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। বাঙালী ও বাঙালীর সংস্কৃতি-সাধনার প্রতি গভীর প্রীতিবোধ ছিল বলেই বাঙালীর অধঃপতন তার কাছে অসহনীয় ইংরাজ-প্রভাবের ফলে বাঙালী কতখানি অধঃপতনে নেমেছিল ও বাঙালী জমিদার বাবুদের বিকৃত রুচির ফলে জনজীবন কিরূপ বিপর্যস্ত হয়েছিল সমকালীন নাটকে তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। যাত্রার নৃত্য সম্পর্কে সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যটি তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয়—

"খেমটা নাচ'। চমৎকার কথা? গ্রাম্যবাবুদিগের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। বারইয়ারীর পাণ্ডাদিগের জীবন সর্বস্ব। যে পাণ্ডা নরক হইতে নিজ গ্রামে নর্তকী আনিলেন তিনি গ্রামের ভগীরথ জন্মিয়াছেন। এই গ্রাম্য ভগীরথদিগের জন্ম সার্থক। তাহাদের অনুকম্পায় গ্রামের অনেকেই চরিতার্থ হইলেন। চরিতার্থ হউন কিন্তু অনেক ছেলেও ডুবিল।" (যাত্রা সমালোচনা ২য় প্রবন্ধ)

সমকালীন যুগের বাস্তব প্রতিচ্ছবি যেমন প্রবন্ধকার রূপায়িত করেছেন তেমনি অন্যদিকে যাত্রার অসংগত দিককেও তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

যাত্রানাটকে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত অপরিহার্য। প্রবন্ধকার সেই দিকটিরও প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রীক ট্র্যাজেডি নাটকের সুরুতে গীত থাকত। ইংরেজি নাটকে অনেকসময় ধর্মসঙ্গীত দিয়ে নাটক আরম্ভ হত। ভারতীয় দৃশ্যকাব্যও নান্দীবচন দিয়ে আরম্ভ হত এবং স্বস্তিবচন দিয়ে শেষ করা হত। তবে পাশ্চাত্য নাটকের ন্যায় আধুনিক বাংলা নাটকে সঙ্গীত বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। কারণ আনন্দ বা বিষাদভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাবোদ্দীপক গীতের অপরিহার্যতা নাট্যকারগণ স্বীকার করেন এবং সেই কারণেই নাটকে গীতকে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু আধুনিক যাত্রানাটকে গান কোন অংশেই আস্বাদ্য হয়ে ওঠেনা বলে সঞ্জীবচন্দ্র মনে করেন—"বাঙ্গালার পূর্বস্বর লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার আর প্রায় কোন সুরই আন্তরিক ভাব প্রবাচক নহে, এইজন্য সেভাবের গীত হউক কোন একটা সুরে গাইলেই হইল। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, শ্রোতা ও গায়ক এক্ষণে রুচি সম্বন্ধে তুল্য।"

যাত্রানাটকে নায়ক-নায়িকার আচার-আচরণ, সাজ-পোষাক, ভাব-ভঙ্গি প্রভৃতি সমস্ত দিকেরও খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেছেন। চরিত্র-বিশ্লেষণে সঞ্জীবচন্দ্র সমকালীন জীবনযাত্রা ও লোকচরিত্র সমালোচনা অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এইসমস্ত নায়ক-নায়িকার সাজ-পোষাক, কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত রস প্রবল হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

"যাত্রার রানী পরিচ্ছদে মেতরানী। কেলুয়া ভুলুয়ার সঙ্গে যে মেতরানী আইসে, যাত্রার রানীর প্রয়োজন হইলে সেই উঠিয়া দাঁড়ায়; মেতরানীর পর রানীর পদ আমাদের বর্তমান সমাজে অসঙ্গত নহে।" (যাত্রা সমালোচনা—২য় প্রবন্ধ)

রাজার পরিচ্ছদ বর্ণনায় তিনি বাস্তবজগতের রঙ্গ-কৌতুক সঞ্চারিত করেছেন:

"রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকার; ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান, আর তৈলাক্ত জরীর টুপি। সেই পরিচ্ছদে নকিব বা জমাদার সাজিয়া আসিয়াছিল,—আবার সেই পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন। একজন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, পরিচ্ছদই লোকের পরিচায়ক। কে যোদ্ধা, কে পদাতিক, কে জজ, কে শিল্পী. তাহার পরিচয় পরিচ্ছদে পাওয়া যায়।....আমাদের যাত্রায় কি রাজা কি দাস সকলেই এক পরিচ্ছদধারী। চাপকান্ তাহার মধ্যে প্রধান। বাজীকরের "বনমানুষের হাড়" স্পর্শমাত্র সকলের পরিবর্তন করে, সেইরূপ যাত্রাকরের চাপকান্ পরিধান মাত্র, সকলের রূপান্তর করে। রাজা সাজিতে হইবে, চাপকান্ আবশ্যক। নৃসিংহদেব সাজিতে হইবে, সেই চাপকান্ আবশ্যক। হনুমান সাজিতে হইবে, আবার সেই চাপকান আবশ্যক। বুঝি চাপকান্ পরিলে হনুমানের মত দেখায়।" (যাত্রা সমালোচনা—৩য় প্রবন্ধ)

সেকালের 'যাত্রা' দলের পরিচ্ছদ সম্পর্কে কাণ্ডজ্ঞানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক যে অম্লমধুর শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন, তা বাস্তবিকই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

"পথে শুনিলাম, সীতার বনবাস অভিনয় হইতেছে, আমাদের আরও আহ্লাদ হইল। যাত্রার স্থানে গিয়া দেখি মোগলাই পাগড়ী মাথায়, আলবার্ট চেন শোভিত, চস্‌মা নাকে, হাইকোর্টের উকিলের ন্যায় কতকগুলির লোক কথাবার্তা কহিতেছে। পরে শুনিলাম, তাঁহাদের মধ্যেই একজন রাম, একজন লক্ষ্মণ, আর সকলে পারিসদ। আমরা কপালে হাত দিয়া বসিলাম। সুশিক্ষিত

যুবারা ভাবিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল সদৃশ ছিলেন। তিনি চস্‌মা নাকে দিতেন, মুসলমানদিগের মত পাগড়ী মাথায় দিতেন, সাহেবদিগের মত আলবার্ট চেন পরিতেন।" (যাত্রা সমালোচনা—২য় প্রবন্ধ)

উদ্ধৃত অংশটি থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের সহজ সাবলীল গদ্যরীতির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। হৃদয়াবেশ যেমন তাঁর প্রবন্ধের গতি সঞ্চার করেছে, তেমনি স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৌতুকহাস্য তাঁর রচনাকে রমনীয় করেছে। শিক্ষিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি শ্লেষাত্মক মন্তব্যও করেছেন।

'যাত্রা সমালোচনা' প্রবন্ধ গ্রন্থে যাত্রা নাটকের প্রতিটি বিষয়কে সহজভাবে পরিবেশন করার জন্য তিনি পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করেছেন। একটির পর একটি বিষয়ের জটিলতার জাল তিনি মুক্ত করেছেন। একজন আদর্শ সমালোচকের মতো সঞ্জীবচন্দ্র কখনো কখনো অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎ থেকে পরিচিত উপমা সন্নিবেশ করেছেন এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যপরিহাসের আলোকে তিনি তাঁর বক্তব্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। 'যাত্রা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রবন্ধকার কয়েকবার কীর্ত্তনের কথা উল্লেখ করেন। ভ্রমরে পরবর্তীকালে তাঁর নিজের সম্পাদিত পত্রিকায় 'কীর্ত্তন'* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে পৌরাণিক বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ভক্তিধর্ম। 'কীর্ত্তন' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের কৃষ্টিচেতনা ও অধ্যাত্মসাধনার ছায়া পড়েছে। কীর্ত্তন বলতে প্রধানত বৈষ্ণব পদাবলীকে বুঝায়। বস্তুত, মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠকের মনে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে। বৈষ্ণব পদাবলী শুধু পড়া হত না, ভক্তদের কীর্ত্তনের আসরে গীত হত। উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই কীর্ত্তন গ্রামে-গঞ্জে-শহরে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নামকীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন, পালাকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় তা আসরে গাওয়া হত। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলবদ্ধভাবে কৃষ্ণগুণগান করার নাম—সংকীর্ত্তন। আর শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন পালার আকারে যে গান গাওয়া হত—তা হল লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন। কীর্ত্তনীয়ারা বিভিন্ন পদকর্ত্তাদের পদগুলিকে পালাক্রমে সাজিয়ে নিতেন—যেমন রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মিলন, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি। মোটকথা, কীর্ত্তনীয়রা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ মিলনবিরহের পদগুলি পালাকীর্ত্তনে গেয়ে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতেন। কিন্তু "কীর্ত্তনে লোকের আর বড় রুচি নাই, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলেন যে, কীর্ত্তনে টপ্পার মজা পাওয়া যায় না,

উহার ভাষা বুঝা যায়না সুরও ভাল লাগেনা।"* (১ম প্রবন্ধ)

উপরিউদ্ধৃত মন্তব্য প্রবন্ধকারের কীর্ত্তনের প্রতি যেমন বিশুদ্ধ অনুরাগ স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি স্মরণ করিয়ে দেয় বিশেষ দেশকালের রুচির স্বরূপ ধারা। তাছাড়া এই মন্তব্যের পশ্চাদপটে রয়েছে প্রবন্ধকারের অধ্যাত্মসাধনার ব্যঞ্জনা।

মহাপ্রভুর আলোকে অসামান্য ভাবাদর্শে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী বা রাধাকৃষ্ণ পদাবলী বিপুল আকার লাভ করে এবং কীর্তনের মারফতে সেই পদাবলীর রসধারা রসিকজনের কাছে নিবেদন করা হলে শ্রোতাদের আনন্দের সীমা থাকত না। 'কীর্ত্তন' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাঙালীর ঐতিহ্যর কথা তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে: "কীর্ত্তনে কবিত্ব আছে, এইজন্যই বাঙ্গালির পক্ষে কীর্ত্তন আদরের ধন হওয়া উচিত। সুখদ রস বাঙ্গালির যত হৃদয়গ্রাহী এত আর অন্য কোন দেশীয়দিগের নহে। তাহার কারণ কি, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা, কিন্তু কথাটি সত্য। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বাঙ্গালির অন্তঃকরণ অতি কোমল; এত দয়া, এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত আহ্লাদ আর কোন দেশীয়দিগের মধ্যে দেখা যায় না। যে অন্তঃকরণ কোমল সেই অন্তঃকরণই কোমল হইলে সুখদ রস মাত্রেই অধিকার জন্মে।" (১ম প্রবন্ধ)

বৈষ্ণব কবিদের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্র যে হৃদয়াবেগমণ্ডিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন, তা,ত তাঁর রসাসক্ত মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব কবিদের স্বরূপ সম্পৃর্কে তিনি বলেন: "যে কবিরা কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হৃদয় চিত্রকর। তাঁহারা রাধার হৃদয়চিত্র করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় রাধার সকল অন্তর্বৃত্তি চিত্র করেন নাই; কেবল তাঁহার প্রণয়চিত্র করিয়াছেন। সেই চিত্র এত সম্পূর্ণ যে তাহা সচরাচর দেখা যায় না, প্রণয়ের অতি সূক্ষ্ম উচ্ছ্বাস যেন অনুবীক্ষণে দেখিয়া চিত্রিত হইয়াছে।" (১ম প্রবন্ধ)

উপরের এই মন্তব্যে রাধা চরিত্র সৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিগণের অসামান্য কৃতিত্বের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং রাধাচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও তিনি ব্যঞ্জনায় সুপরিস্ফুট করেছেন। বৈষ্ণব কবিদের সমালোচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যাখ্যান বিশ্লেষণধর্মী ও সৃষ্টিমূলক। প্রবন্ধকারের নিজস্ব জীবন-উপলব্ধি তাঁর অনাসক্ত সত্যদৃষ্টিকে সুদূরপ্রসারী করেছে।

সঞ্জীবচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করে তাদের রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শেখর প্রমুখ কবিদের তুলনামূলক

আলোচনা করে তিনি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্যাপতির রাধার সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার গোত্রগত মিল না থাকার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের দুটি পদ—'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার', 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা', এবং কবি শেখরের 'মাথুর'-এর 'কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে' প্রভৃতি পদের উল্লেখ করে দেখান যে এই প্রকার পদে কিরূপ আস্বাদন রস আছে, তা কীর্ত্তনীয়রা গানের মাধ্যমে পাঠকচিত্তের বাসনালোকে মৃদু স্পন্দন জাগায়, তারই ফলে পদাবলীর নতুন রূপলোক ফুটে উঠেছে। রসিক সঞ্জীবচন্দ্র 'কীর্ত্তন' সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধমনের নিবেদন জানিয়েছেন: "কীর্ত্তনে সর্বপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় সন্তানের প্রতি জনক-জননীর স্নেহ নায়ক-নায়িকার বিশুদ্ধ প্রণয়, সখিত্ব প্রভৃতি সকলই পর্যায়ক্রমে তাহাতে বর্ণিত আছে। তাহা একবার শুনিলেই অনেককে অশ্রুপাত করিতে হয়। যেমন কীর্ত্তনের কবিত্বশক্তি অতুল্য, তদ্রূপ কীর্ত্তনের সুরও অতুল্য। যদি কীর্ত্তনের গীত না গাইয়া শুদ্ধ সুর গাওয়া যায়, তাহা হইলেও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবার তাহাতে যদি কথা যুক্ত করিয়া গাওয়া যায় তাহা হইলে ত কথাই নাই। আপনি যে কথা সর্বদা ঘরে বাহিরে শুনিতেছেন, তাহা যদি কীর্ত্তনসুরে গীত হয়, তবে সে কথা যে ভাবে সেই সুরে গীত হইবে। সেই ভাব আপনার হৃদয়ে অবিকল চিত্রিত করিবে।" (২য় প্রবন্ধ)

উপরিউক্তির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের সুকুমার রসবোধ পরিলক্ষিত হয়। কীর্ত্তনের রাগ পদ্ধতিকে হালকা চালে গাইবার যে রীতিটি একদা শহরে গ্রামে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা সঞ্জীবচন্দ্রকে নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট করেছিল বলেই তিনি কীর্ত্তনের মতো একটি রমনীয় প্রবন্ধ পাঠককে উপহার দেন। মানুষের সুখে-দুঃখে, হাসিতে-অশ্রুতে, শোকে-আনন্দে কীর্ত্তনের আনন্দদান অপরিহার্য —"শোকসন্তপ্ত লোক সন্তপ্ত লোকদিগের যতদূর কীর্ত্তন ভাল লাগে এতদূর তোমার আমার ভাল লাগে না। তাহার কারণ শোকাতুর ব্যক্তিরা কাঁদিয়া তাহাদিগের শোকের শমতা করিতে ইচ্ছা করে। কীর্ত্তন কাঁদাইবার গীত, সুতরাং শোকাভিভূতের অন্তর্দ্দেশে যে শোকবহ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে, তাহার অনুরূপ সে বাহ্যিক দেখিতে পায়, দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলে।" (২য় প্রবন্ধ)

কীর্ত্তনের প্রতি আনুগত্য ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধই সঞ্জীবচন্দ্রের এই ধরণের রচনাকে একটি স্বতন্ত্র্য মর্যাদা দিয়েছে যা বাংলাসাহিত্যে বিরলদৃষ্ট।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কীর্তন যে কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটি মহিমান্বিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন প্রবন্ধকার।

সংস্কৃতি তথা আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে তাঁর 'দুর্গাপূজা'[১২] প্রবন্ধে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকারের আকুতি ও নিঃসঙ্গতা-বোধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আশ্চর্য সংহতিলাভ করেছে। দুর্গাপূজার সময় সকল কালে সকল মানুষের বুক কানায় কানায় ভরে উঠে কেন সে সম্পর্কে প্রবন্ধকারের সূক্ষ্ম অভিমত সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। দুর্গাপূজায় মানুষ মানুষের কাছে আসে, পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হয় এবং দেশের মানুষ ব্যষ্টি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। 'দুর্গাপূজা' প্রবন্ধে লেখকের ভাবদৃষ্টিতে বৈদিক ভারতের মহামাতৃমূর্তিই ভাস্বর হয়ে উঠেছে :—

"এ প্রতিমা কখন মিথ্যা বিষয়ের প্রতিমা নহে—তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া এত কোটি লোকে, এত উল্লাসের সহিত কখন ইহা পূজা করিত না। যাহা মনুষ্য হৃদয়ের বদ্ধমূলে, তাহা কখন মিথ্যা নহে, বঞ্চনার উপায়মাত্র নহে। বেদ পুরাণ তন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিব না, তাহাতে এ তত্ত্বের অন্ত পাওয়া যায় না। মনুষ্য হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিব। কি এ? জগৎশক্তি।" (দুর্গাপূজা)

লেখক সেই উক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছেন এবং তিনি তাঁর কল্পনাশক্তি ও ভাষার সমন্বয়ে অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে প্রত্যক্ষগোচর করেছেন :—"এই প্রতিমার আর একটি সূচনা আছে। হিন্দুধর্ম ত্রিতয়াপূর্ণ। প্রাচীন ত্রিমূর্তি, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য। আধুনিক ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর।

ঈশ্বরের বা পুরুষের তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তম। সেইজন্য বঙ্গীয় শক্তি-ভক্ত, শক্তির ত্রিমূর্তি কল্পনা করিবে। স্থূলচক্ষে যাহারা দেখে, তাহারা সংসারে তিনটি শক্তি দেখে—বল, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা, দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। শক্তি ভাগ্য এবং জ্ঞান।"

বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির ভাষা ও বক্তব্য এক অদ্ভুত ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত। লেখকের বক্তব্য আতিশয্যদোষে কৃত্রিম হয়ে পড়েনি বরং শব্দবিন্যাস তাঁর বর্ণনাশক্তিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর পরিমিতিবোধ কোথায়ও অকারণপ্রগলভ্ হয়ে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার দুর্গোৎসব'[১৩] প্রবন্ধের কথা উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিবছর দুর্গোৎসবে সুন্দর সুস্থ ও প্রাণবন্ত জীবনের দ্যোতনা

খুঁজে পেতেন: "সেই তরঙ্গ সংকুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—স্বর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা....এ মূর্তি এমন দেখিব না—আজ দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে না—কিন্তু একদিন দেখিব।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা যেখানে সহজ, সরল ও পরিচ্ছন্ন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গি ও কল্পনাশক্তি আভিজাত্যে বিশিষ্ট। বঙ্কিম ভাষায় লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, সঞ্জীব সর্বপ্রকার কৃত্রিমতাকে বর্জন করে তাঁর বক্তব্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে 'বৃত্রসংহার' সমালোচনাটি নিঃসন্দেহে সাহিত্য-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কবি বা শিল্পীর কাছে প্রত্যক্ষভাবে যা পাই, সমালোচকের কাছে তার চেয়ে কম পাই না বরং সমালোচক আস্বাদন-প্রক্রিয়ার কৌশলটি এমনভাবে শিখিয়ে দেন যে পাঠক কবি বা শিল্পী কর্তৃক সৃষ্টির রসমাধুর্য গ্রহণে অধিকতর সফলতা লাভ করে। সমালোচকের আস্বাদন ক্রিয়ার সঙ্গে পাঠকের আস্বাদন ক্রিয়ার সঙ্গতিসাধন—সমালোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মূল রচনা থেকে উৎকৃষ্ট নিদর্শন উদ্ধৃত করে সমালোচক তা পাঠকের নিকট পরিবেশন করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতির মার্জিত রূপ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনায় প্রকাশিত হয়। 'বৃত্রসংহার'—১ম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বঙ্গদর্শনে করেন। সঞ্জীবচন্দ্র "বৃত্রসংহার' (২য় খণ্ড)[১৪] সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থানুসরণ করে কাব্যতত্ত্বের উৎসমূলে প্রবেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর প্রবন্ধে প্রথম খণ্ডের এগারো সর্গের বিস্তারিত পরিচয় ও বিশ্লেষণ করেছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রও অনুরূপ দ্বিতীয় খণ্ডের ১২ থেকে ২৪ সর্গের কাব্য-ব্যাখ্যানের সঙ্গে বিচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ ও নবম সর্গের সমালোচনায় মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের ভূয়সী প্রসংসা করেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে 'বৃত্রসংহার' ২য় খণ্ডের সমালোচনা করেন।[১৫] 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কবির প্রতি অন্ধ সহানুভূতিবশত প্রবন্ধকার তেমন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেননি বরং এক জায়গায় বলেছেন:—"বৃত্রসংহারে প্রবেশ করিয়াই আমার কাব্যের দ্বারে শক্তির বিশাল মূর্তি দেখিতে পাই। কাব্যের মর্মার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারি না" যাই হোক 'বৃত্রসংহার'-এর চমৎ-

কারিত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও নারীচরিত্র বর্ণনার অংশ উদ্ধৃত করে সঞ্জীবচন্দ্র তার পাঠকের সঙ্গে আস্বাদন করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভে দ্বাদশ সর্গে দানবপত্নী ঐন্দ্রিলাকৃত শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নির চিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেব-দানবের শক্তির মত্ততা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি সৃষ্টি-মূল্য নিরূপণ ও বিচার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "পাঠক দেখিবেন, আমরা এপর্যন্ত কেবল একত্রে বৃত্রসংহার পাঠ করিতেছি—প্রচলিত প্রথানুসারে আমরা বৃত্রসংহারের সমালোচনা করিতেছি না। আমরা উদ্যানের শোভাবর্ণনে প্রবৃত্ত নহি—আমরা পুষ্পচয়ন করিতেছি মাত্র। উদ্যানের শোভাকীর্তনে মালীর সুখ হইতে পারে। কিন্তু দর্শকের সুখ পুষ্পচয়নে।....বৃত্রসংহার পাঠের যে সুখ তাহা যদি পাঠককে প্রাপ্ত করাইতে পারি, তাহা হইলে কৃতকার্য হইলাম মনে করিব।"এই মন্তব্যে সমালোচক সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকমনের পরিচয় পাওয়া যাবে। বৃত্রসংহার কাব্যের লক্ষ্য, রস-সৌন্দর্য, বাচ্য, রীতি-ছন্দ-অলংকার ও ব্যঙ্গ্যার্থ প্রভৃতি দিকগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ না করলেও তিনি মনে করেন—' "বৃত্রসংহারের লক্ষ্য মহত্তর।' কারণ—'হেমচন্দ্র মনুষ্যজীবনের যে মূর্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পরমসুন্দর। বাহুবলের শাক্তধর্ম; ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংসপ্রাপ্ত; অত্যাচার ঈশ্বরের অসহ্য; পুণ্যের সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ-তত্ত্ব সৌন্দর্যে পরিপ্লুত; যে প্রকারে ইহাকে স্থাপন কর, যেভাবে ইহাকে দেখ, আলোক-সম্মুখীন রত্নের ন্যায় ইহা জ্বলিতে থাকে। হেমবাবু এই তত্ত্বকে এতদূর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, যে ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল; ত্রিভুবন জয়ী বৃত্রের আলয়ে রমনীর অপমান দেখিয়া, ত্রিদেব তিন মূর্তিতে পরমেশ্বর—অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন—অকালে বৃত্রের নিধন হইল।"

আসল কথা, তখনকার দিনে সমালোচনা সাহিত্যে নৈতিক আদর্শ প্রচারই মূল উদ্দেশ্য ছিল। 'বৃত্রসংহার' সমালোচনায় সঞ্জীবচন্দ্র নৈতিক তত্ত্বের সার্থকতা দেখাতে চেয়েছিলেন। ফলে সমালোচনাটি creation within creation হয়ে উঠল না। এই প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ্য: "তিনি বৃত্রসংহার কাব্য সমালোচনায় মৌলিক রসভাষ্য অপেক্ষা কাব্য-বহির্ভূত নীতি সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে অকারণে অধিকতর বাড়াবাড়ি করেছেন।[১৬]"

তিন

সাহিত্য হল ইতিহাসের প্রতিবিম্ব। সেই ইতিহাস শুধু রাজ-রাজড়ার-

কাহিনী নয়,—সামাজিক, আর্থিক ও বৈজ্ঞানিকও বটে। ঊনবিংশ শতকে সমাজ-সচেতনতা সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় সমাজবাদী সমালোচনা লক্ষণীয় বিষয়। তাঁর রচিত 'সৎকার', 'বাল্যবিবাহ', 'একঘরে', 'অকাতরে বিবাহ', 'বাহুবল', 'ভারতভাণ্ডারী', 'চাকুরীর পরীক্ষা', 'গৃহসন্ন্যাস', 'পরকাল', 'বিবাহের ঘটকালি' প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের তিনি প্রবন্ধ লেখেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁর 'সৎকার' ও 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধ দুটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য দুটি প্রবন্ধেই লেখকের জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল লক্ষণীয়। 'সৎকার' প্রবন্ধে দেশবিদেশের কাহিনী ও উদাহরণ অবলম্বন করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাধারণের হিতচিন্তা প্রবন্ধকারের জীবনের আদর্শ ছিল। 'সৎকার' প্রবন্ধে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহের সৎকার করা উচিত কিনা তা প্রমাণ করতে দেশবিদেশের প্রথাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এবং ভারতীয় শাস্ত্রবিধির মৌলিকতার কথা তিনি চিন্তা করেছেন—"শাস্ত্রে বিধি আছে মৃত্যুর পর অন্যূন দ্বাদশ দণ্ড পর্যন্ত দেহ রাখিতে হইবে। এই বিধির কোন বিশেষ যুক্তি ছিল, এক্ষণে সেই যুক্তি ইউরোপে আদরিত হইয়াছে।" (সৎকার)

'সৎকার' প্রবন্ধে লেখকের জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধের পরিচয় অনুমান করা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে বিভিন্ন প্রথা চালু আছে, তা নিয়ে প্রবন্ধকারের ভাবনার মধ্যে আত্মার তীব্রতর যন্ত্রণার কথা প্রকাশ পেয়েছে। 'সৎকার' পৃথিবীর একটি প্রাচীন প্রথা। বিভিন্ন দেশের নানা তথ্য সংগ্রহ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহের 'সৎকার' করা উচিত নয়। তাঁর স্থির বিশ্বাস—"যদি রয় শ্বাস তবু রাখ আশ।" কারণ দেখা গেছে মৃত্যুর পরও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক ফরাসীদেশের একজন যুবা পাদরী ও বিলাতের একজন সাহেবের মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠার ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং আমাদের দেশেও এরূপ ঘটনার নিদর্শন দেখিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

"এই সকল ঘটনা দেখিলে বোধহয় যে সৎকার করিতে বিলম্ব করা নিতান্ত আবশ্যক; না করায় অনেককে না মরিয়াও মরিতে হইতেছে। যাঁহারা দাহ করেন তাঁহাদের এইজন্য সময়ে সময়ে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের

পাতকী হইতে হইতেছে ; অতএব তাঁহাদের উচিত যে মৃত্যুর অন্যূন দ্বাদশ দণ্ড অতিবাহিত না হইলে দাহ করিতে স্বীকার না করেন।"

তাঁর এই বক্তব্যে কোনরকম বাক্‌চাতুরী নেই বরং শাস্ত্রের শাশ্বত সূত্রটি তুলে ধরে জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মৃতদেহ সৎকার প্রথার সঙ্গে আমাদের দেশের প্রথার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। জার্মানের মৃতদেহ দাহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

"জার্মানী দেশে অনেক স্থানে লৌহময় চিতা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথায় অল্প সময় মধ্যে অনেক শবদাহ হইয়াছে। ঐ যন্ত্রে একঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শরীর ভস্মীভূত হইয়া অত্যল্পমাত্র থাকে। স্বজনবর্গ তাহাই সযত্নে একত্র করিয়া রৌপ্যময় পাত্রে স্নেহ-নিদর্শনস্বরূপ লইয়া যান।"

এই উক্তির মধ্যে তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি বৈজ্ঞানিক যুগের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে। বিদেশের তুলনায় আমাদের দেশের সমাজ কতখানি পিছিয়ে আছে, তা তাঁর সমাজ-ভাবনা থেকেই প্রতীয়মান হয় : "আমাদিগের দেশে দাহ করিবার যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। শবদেহ চিতার উপর শয়ান করাইয়া সন্তান দ্বারা মুখাগ্নি করান পৈশাচিক কার্য। আবার তদুপরি মধ্যে মধ্যে লগুড়াঘাত করা আরও নিষ্ঠুরতা।" 'সৎকার' প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র পাঠককে বৈজ্ঞানিক যুগের শুভাগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সমাজের যথার্থ ভালমন্দের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করেন।

'বাল্য বিবাহ'[১৭] প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের একটি মৌলিক রচনা। একথা স্বীকার্য যে সঞ্জীবচন্দ্র দেশের মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করতেন। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের আচার-আচরণ ও শাস্ত্রের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সামাজিক মঙ্গলের প্রশ্নে তিনি প্রাচীন প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থন ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধটি তার নিদর্শন। আমাদের মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে তিনি যে অভিমত পোষণ করতেন, তা ভারতীয় শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত :

"মনুর সময়াবধি আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে, চিরকাল অতি অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগের সন্তান হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বালিকার সন্তান যে একেবারে রক্ষা পায় না, কি দুর্বল হয় এমত সংস্কার লোকের কখনও জন্মে নাই। যখন ভারতের বড় গৌরব, বলবীর্যে ভারত অতুল, তখনও মনুর

বিধান মত বাল্যবিবাহ হইত।" (বাল্যবিবাহ)

সঞ্জীবচন্দ্রের বাল্যবিবাহের সমর্থনে লেখনী ধারণ করার বিশেষ কারণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত চেতনায় শিক্ষিত বাঙালীর জীবনসমুদ্রে এক নতুন ঢেউ উঠেছিল। ইংরাজ সভ্যতার প্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় মূল্য-বোধগুলি ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। কারণ ভারতীয় বোধ, বিশ্বাস, দেশের মানুষের নৈতিক ও আর্থিক সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান প্রভৃতি সব বিষয়েই সেই যুগের চিন্তানায়করা সচেতনভাবে অনুশীলন করেছিলেন। নবযুগের বাংলার অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন বিধবাবিবাহ সমর্থনে প্রবল কুণ্ঠাবোধ ছিল, তেমনি 'বাল্যবিবাহে' সমর্থন ছিলনা। 'বাঙালীর বাহুবল' প্রবন্ধে জনসংখ্যাধিক্যের অর্থনৈতিক পরিণামের কথা ভেবে বাল্যবিবাহের কুফলের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন :

"ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে ; মনুষ্য মাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায় ? যে দেশে বাপ মা ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসার সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে ?"[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।

কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে জাতীয়তা ও হিন্দুত্বকে একই সূত্রে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন : "ইংরেজরা বিজ্ঞ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান অতএব তাঁহারা যে আপনাদের সমাজমধ্যে মঙ্গলকর নিয়ম সংস্থাপন করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে নিয়মই দেখা যায়, তাহাই যে মঙ্গলকর, অথবা মঙ্গলকর বলিয়া যে সংস্থাপিত হইয়াছে এমত নহে, এই কথা উদ্বাহ সম্বন্ধে আরও বিশেষ খাটে। অধিক বয়সে বিবাহ করা তাহাদের মধ্যে নূতন নহে, তাঁহাদের অসভ্যাবস্থাবধি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অতএব ইহা একণকার বিজ্ঞানশাস্ত্র বা সৎশিক্ষার ফল নহে।"

এখানে সঞ্জীবচন্দ্রের বক্তব্য স্পষ্ট - চিন্তাক্ষেত্রে কোন স্ববিরোধিতা নেই। "বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে লেখক ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতির ভালোমন্দের দিকগুলি তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'বাল্যবিবাহ' প্রসঙ্গে আলোচনা কালে তিনি পরিবারগত ও বংশগত বৈজাত্য-

সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত 'বৈজ্ঞিকতত্ত্ব' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মেয়েদের বিবাহকালের সময়সীমা বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও বিবাহ যোগ্য মেয়েদের যথাসময়ে বিবাহদান না হলে তার কুফলের দিকগুলি উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। তিনি নানাযুক্তি দিয়ে বাল্যবিবাহের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তিনি কেমস (kames) ও বফন (Buffon) সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর যাথার্থ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন: "ইংলণ্ড দেশে ও ফ্রান্স দেশে অনাথা যুবতী বিস্তর তাহারা আশ্রয়হীনা হইয়া পথে পথে বেড়ায়, অন্নাভাবে পাপপঙ্কে পতিত হয়। আমাদের বাঙ্গলায় নিরাশ্রয় যুবতী সংখ্যা অল্প। তাহার কারণ বাল্যবিবাহ।"

প্রবন্ধকারের এই উক্তি বেদবাক্য হিসাবে গ্রাহ্য নয় ঠিকই কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক রুচির মূল্যবোধকে বড়ো করে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন যে পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি গড়ে তোলার জন্য বাল্যবিবাহ আদর্শরূপে গ্রহণ করা উচিত: "যে যাহা বলুক, আমাদের সংসারের সুখ কেবল ভালবাসা হইতে। এ ভালবাসা আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটেনা। দুই একজনের অদৃষ্টমন্দ, বিপরীত ঘটে; কিন্তু আমাদের সংসারের এই সুখ, এই ভালবাসা কতকটা বাল্যবিবাহজনিত বলিয়া বোধ হয়।"

'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের স্বকীয় উপলব্ধিজাত ফসল এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনার পিছনে তাঁর যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল তার মূল লক্ষ্য হল সমষ্টিচেতনা, কল্যাণচিন্তা এবং যার পরিণাম হল অনিবার্যভাবেই ভাবোচ্ছ্বাস।

লেখকের ব্যক্তিমানসই সমাজ ও স্বদেশ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত। তাঁর 'বাহুবল'[১৯] প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। 'বাহুবল' প্রবন্ধে তিনি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাঙালীর স্বাজাত্যবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হয়। বাহুবলের প্রতাপ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। মানুষেরআদিম অবস্থায় বাহুবলের প্রতাপ অবিসংবাদিত সত্য: মানুষের আদিম অবস্থায় বাহুবলই সর্ব্বস্ব, বাহুবল থাকিলে আর কিছুই অপ্রতুল থাকেনা। এ অবস্থায় সকলে আপন আপন রক্ষক। যাহার বাহুবল থাকে, কেবল সেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, কেবল সেই আত্মোদর পূরণ করিতে সমর্থ হয়, বাহুবল না থাকিলে আদিম অবস্থায় প্রাণধারণ করা অতি কঠিন। অতএব এই অবস্থায় বাহুবল যথার্থই পূজ্য। ...

"আদিম অবস্থায় মল্লযুদ্ধ, বাহুবলে বাহুবলে যুদ্ধ হইয়া থাকে; যেদিকে বাহুবল

অধিক সেইদিকে জয়লাভ হয়। শেষ বৈজ্ঞানিক অস্ত্র প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইলে আর অস্ত্র নিক্ষেপের জন্য বিশেষ বাহুবলের প্রয়োজন হয়না। তখন বলিষ্ঠ ও দুর্ব্বলের গুলি শত্রুসংহারে তুল্যই কার্য করে।"

সঞ্জীবচন্দ্রের এই বক্তব্যে সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং প্রবন্ধকার জীবন দিয়ে উপলব্ধ সত্যকে আড়াল করে রাখেন নি। তিনি বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে সমস্ত হৃদয় ও মন দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন :

"যুদ্ধ কি বাণিজ্যে এক্ষণে যে অতিরিক্ত বল ব্যয় হইতেছে, তাহা অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক বল। পূর্ব্বে বাহুবল প্রধান ছিল. এক্ষণে বৈজ্ঞানিক বল প্রধান হইয়াছে; বৈজ্ঞানিক বল ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা আরও বৈজ্ঞানিক বলের উন্নতি সাধন করুন। বাহুবলের সময় গিয়াছে, বৈজ্ঞানিক অবস্থায় যে পরিমাণে বাহুবল প্রয়োজন, তাহা বোধহয় আমাদের যথেষ্ট আছে।"

'বিবাহের ঘটকালি'[২০] 'স্ত্রীজাতি বন্দনা',[২১], 'অকাতরে বিবাহ'[২২] 'ভূতের সংসার'[২৩] 'চাকুরীর পরীক্ষা'[২৪] প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলিতে সঞ্জীব-প্রতিভার বিচিত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন সমাজের লোকচরিত্র সমালোচনায় অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে। কিন্তু অতিকথন ও পুনরুক্তি দোষ তাঁর প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। 'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধে তাঁর 'বাল্যবিবাহ' এবং 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রবন্ধদুটির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন সমাজের স্ত্রীলোক ঘটকের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তাঁর বাল্য বিবাহ ও বৈজিকতত্ত্বের কথা মনে পড়ে : "যেখানে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত সেখানে ঘটকের কার্য বড় গুরুতর। সে বিষয় একটু বিশেষ করিয়া-বলা আবশ্যক। বৈজিকতত্ত্ব ভালরূপ না জানিলে ভাল ঘটক হইতে পারে না।" (বিবাহের ঘটকালি)

সমকালীন যুগে স্ত্রীলোকেরা অনেক কাজের মতো ঘটকালি কাজে নিযুক্ত হন। আধুনিকতার নামে নারী জাতির যথেচ্ছচার ও কর্তৃত্বকে প্রবন্ধকার সুনজরে দেখেন নি। জীবনের ক্ষেত্রে যেখানেই বাড়াবাড়ি দেখেছেন সেইখানেই তিনি আঘাত হেনেছেন :"গৃহিনীরা ইদানিং সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব একচেটে করিয়া লইয়াছেন—ব্যয়, ভূষণ, লৌকিকতা, সামাজিকতা সকলই এখন তাঁহাদের হাতে। বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্তা। পুরুষ ঘটকেরা অন্দর মহলে যায়না, সুতরাং আর ঘটকালি পায় না। কাজেই তাহাদের সে ব্যবসা ছাড়িতে হইয়াছে।

তাহাদের পরিবর্তে এখন স্ত্রীলোক ঘটক।" (বিবাহের ঘটকালি)

'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধে বংশধারা, বংশপরিচয়, বংশভেদ ও কৌলিন্য প্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশের পশুপালকের (Bruders) বিশেষ ভূমিকার কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে হাস্যোদ্রেক সৃষ্টি করেছেন।

'স্ত্রীজাতি বন্দনা' প্রবন্ধটিতে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে যে কৌতুকরস সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে প্রবন্ধকারের নির্দোষ হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়: "হে সুরুচি! তুমি স্বরূপ বল, মৎস্যের 'লেজা' ভালবাসা কি প্রতিবাসীর মুড়া ভালবাস? হে দেবী! তুমি মনে করিলে সকলের মুণ্ডু ঘুরাইতে পার —কথায়। পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে পার—রোদনে। পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে পার—কলহে।"

'স্ত্রীজাতি বন্দনা'য় বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সঙ্গে ব্যঙ্গের সমন্বয় লক্ষণীয়। নারীজাতির স্বার্থপরতা, ঘটকালিবুদ্ধি, ভাবপ্রবণতার আতিশয্য ও প্রগলভতা নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে নানা আস্বাদনের রস পরিবেষণ করেছেন। 'পালামৌ' গ্রন্থের নারীর কথাবার্তা নিয়ে কৌতুককর চিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য: "সাধুদের গৃহিনীরা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন. সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায় গালি চলেনা, মনের অনেক কথা বলা যায় না।" (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

আবার 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধে আধুনিকতার নামে নারী চরিত্রের আত্মীয় তোষণনীতির কথা উল্লেখ করেছেন: "এক্ষণে আমাদের কেবল আপনাদের নিজের প্রতি দৃষ্টি। তাহার মূল কারণ, এখনকার গৃহিনীরা স্বার্থপর হইয়াছেন।"

'ভূতের জাতি'[২৫] প্রবন্ধে প্রবন্ধকার সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, তার চেয়ে গল্পের মতো ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনার কৌতুককর চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। সাহেবদের ভূত বানানোর ব্যাপারটি সত্য-মিথ্যার সীমা লঙ্ঘন করেছে: "ভূতের জাতি বলিলে কাহাদের বুঝায়, তাহা বাঙ্গলায় বড় বলিয়া দিতে হয় না। বুদ্ধিমান বাঙ্গালীরা তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কাফ্রি ও অন্যান্য দেশে ভূতের জাতি সাহেবদের বলে। (Krumen call Europeans the Ghost-tribe : Burton) মঙ্গো পার্ক আফ্রিকার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দুইজন কাফ্রি রুদ্ধশ্বাসে পলায়, প্রায় অর্ধক্রোশ গিয়া আর দুই পরিজন স্বদেশীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের ভয় যায়। কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিরা মঙ্গো পার্ক সাহেবকে যে ভূত মনে

করিয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার বর্ণের দোষে। কাফ্রিয়া মনে করে কখন শ্বেতবর্ণ হইতে পারে না ; শ্বেতবর্ণ ভূতের। অনেক স্থানে ভূত আর শ্বেত মনুষ্য উভয় অর্থে এক শব্দই প্রয়োগ হয়।"

আমাদের দেশের ভূতের বর্ণনায় তাঁর নির্দোষ কৌতুক ও রঙ্গরস অনাবিল ধারায় উৎসারিত হয়েছে : "আমাদের মনুষ্য মরিলেই যে ভূত হয়, ইহার নিশ্চয়তা আছে। তাহারা দৌরাত্ম্য করে, গাছ ভাঙ্গে, ছেলেপিলের ঘাড় ভাঙ্গে। তবে বন্যজাতির ভূতের ন্যায় তাহারা রীতিমত সংসার করে না। বরং কিছু স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারে, বোধহয়, কিছু অন্নাভাব, পয়সাকড়ির সংস্থান থাকে না, মৎস্য তাহারা বড় ভালবাসে, অথচ সংগ্রহ করিতে পারে না।"

বাঙালী ভূতের জন্য দুঃখ প্রকাশের মধ্যে প্রবন্ধকারের ব্যক্তিজীবনের গভীর অনুশোচনা রূপায়িত হয়েছে। বাঙালীজাতিকে কৌতুকচ্ছলে জাগানোর উদ্দেশ্যে যেন এই জাতীয় প্রবন্ধ লেখা।

'ভারত ভাণ্ডারী' প্রবন্ধেও সঞ্জীবচন্দ্রের পরিহাসপ্রিয়তা ও তীব্র রসিকতা লক্ষণীয়। বাবা তারকেশ্বরের জন্য মানত করে দাড়ি রাখাটা কুসংস্কার—এটা তাঁর মনে হয়েছিল বলেই আমাদের মনকে সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। নিম্নের উদ্ধৃতিতেই তার প্রমাণ মিলবে :

"ভারত ভাণ্ডারী একদিন দৈবদুর্বিপাকে আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবক্ষচুম্বিত শ্মশ্রুরাশি লম্বিত করিয়া কাটগড়ার মধ্যে দণ্ডায়মান, নাম, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করার পর ভারত ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তাহার বয়স কত ?

ভাণ্ডারি উত্তর দিলেন—সতের কি আঠার হইবে।

উকিল ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি। তোমার অত বড় দাড়ি। তোমার সতের বছর বয়স ?

তাহাতে ভারত ভাণ্ডারি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, এ দাড়ি বাবা তারকেশ্বরের।"

উপরিউদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজজীবনের যে চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে, তার যে একটি নিজস্ব মূল্য আছে তা অনস্বীকার্য।

'একঘরে' প্রবন্ধটি সমাজ-জীবনের দর্পণ। সমাজের ছল-চাতুরী তির্যক আলোয় আলোকিত হয়েছে। সমাজ-জীবনের জটিল সমস্যা ও জটিলতর

লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা তিনি তির্যকদৃষ্টির সাহায্যে রূপায়িত করেছেন। প্রতিবেশীদের উপর জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের ইতিহাস তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যেন যুগধর্মেরই প্রবক্তা :

"কোন জমিদার বা নীলকর আমাদের প্রতিবাসীকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেলে অথবা অন্যপ্রকার পীড়ন করিলে, আমরা কোন কথাই কহি না। মনে ভাবি—আমাদের উপর তো কোন পীড়ন হয় নাই, তবে অন্যের নিমিত্ত আমরা কেন কথা কহিব; যাহার বিপদ সেই একা ভোগ করুক, আমরা অন্যের নিমিত্ত কথা কহিয়া কেন অনর্থক দোষী হইব।"

'একঘরে' প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিবেশীদের স্বার্থপরতা ও দলাদলিকে তির্যক-দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিবেশীদের হীনমন্যতাবোধ সামাজিক জীবন-যাত্রাকে কতদূর নীচে নিয়ে যায়, তারই করুণ চিত্র এঁকেছেন প্রবন্ধকার :

"কিন্তু আমাদের তো দূরদৃষ্টি নাই। আমাদের দৃষ্টি কেবল আপনার উপস্থিত স্বচ্ছন্দতার প্রতি; কেবল আপনার ঘরের প্রতি। যতক্ষণ আপনার ঘরের মধ্যে কোন ব্যাঘাত না হয়, ততক্ষণ আমরা ভাবি পৃথিবীতে কোন চিন্তা নাই। সমাজের, কেবল এই একঘরের প্রতি দৃষ্টি, এইজন্য বলি আমরা একঘরে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য যেমন আনন্দদান করা, তেমনি মনকে নাড়ানো ও সমাজকে জাগানো, সঞ্জীবচন্দ্রের আলোচ্য প্রবন্ধে সমষ্টিচেতনার সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'চাকুরীর পরীক্ষা, প্রবন্ধে ইংরেজ রাজত্বের আমলাতন্ত্রে পরীক্ষার প্রহসন, কারসাজি এবং তার বিষময় ফল প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। জীবনের এক অপরিসীম তিক্ততা আলোচ্য প্রবন্ধে নির্মম সত্যরূপে উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পরীক্ষায় আইনবিষয়ে কম নম্বর দিয়ে ফেল করিয়ে চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়। এই বেদনাবোধই তাঁর 'চাকুরীর পরীক্ষা' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। ইংরাজ রাজ-কর্মচারীদের কূট কৌশলের প্রসঙ্গ উন্মোচন করে, চাকরি পাবার ব্যাপারগুলি তিনি যেভাবে মিলিয়েছেন, তাতে প্রবন্ধকারের বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায় :

"ইদানীং বিজ্ঞ রাজ-পুরুষেরা অনুরোধের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সহজে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত এক উপায় উদ্ভাবন

করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা।"

ইংরাজ আমলে উমেদারী করলে, তোষামোদ করলে এবং ঘুষ ও তেল দিলে পরীক্ষা না দিয়েও ভাল চাকুরী পাওয়া যেত, কিন্তু আগে চাকুরী পেতে হলে সৎবংশ ও চরিত্র এবং পারদর্শিতার পরীক্ষায় বসতে হত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ সরকার ইচ্ছাপূর্বক নানা ফিকিরে অনুপযুক্ত লোককে কর্মে নিযুক্ত করতেন। বিশেষত গবর্ণর গ্রে সাহেবের আমল থেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদ নিয়োগের জন্য পরীক্ষা প্রহসন ব্যবস্থা চালু হয়; কিন্তু এর ফলে পরীক্ষা পদ্ধতির কোন উন্নতি লক্ষিত হয়নি। কিছু কিছু ডেপুটি তৈরী হত ঠিকই, কেউ কেউ এই সব ডেপুটিদের 'গ্রের গাধা' বলে তামাসা করত। সঞ্জীবচন্দ্র তাই মন্তব্য করেন :

"এক্ষণকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরা যে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য অথবা এক্ষণকার উকিলেরা যে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ, পুরাতন লোক এই প্রস্তাব-লেখক তাহার মধ্যে একজন। যাহারা উভয় সময়ের কর্মচারী দেখিয়াছেন, তাহাদের প্রমাণ গ্রহণ না করিলে আর প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাদের প্রমাণ যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে পরীক্ষা সত্ত্বেও এক্ষণকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অযোগ্য। পরীক্ষা সত্ত্বেও যদি এরূপ হয়, তবে পরীক্ষার প্রয়োজন?

চাকুরী পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সর্বজনস্বীকৃত :

"যোগ্য লোক নির্বাচনের জন্য পরীক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযোগী পরীক্ষা এ পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয় নাই। এই জন্য ভুল হইতেছে এবং অনেক দিন পর্যন্ত এ ভুল চলিবে।"

'পদোন্নতির পন্থা'[২৬] সঞ্জীবচন্দ্রের একটি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ। জীবনে অসন্তোষ ও অতৃপ্তি থেকেই মানুষ বড় হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মনুষ্যত্বকে নিজের ব্যবহারে লাগাতে পারলে মানবপ্রকৃতির সম্যক স্ফূর্তি হয়। শুধু তৈল মর্দ্দন করে মানবজীবন সমাজে টিঁকে থাকতে পারে না, তা প্রমাণ করবার জন্যই রামধনদাদা চরিত্রটির পরিকল্পনায় লেখকের কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধকার তাঁর লেখায় রামধনদাদা চরিত্রের তেলমাখানো আচরণকে রঙ্গ-রসে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন :

"মনুষ্য মাত্রেই অনুগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রামধনদাদা সকলের অনুগত ছিলেন, ক্ষমতাপন্নদের বিশেষত। এ অবস্থায় তাঁহার উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভব।

অনুগত হওয়া সকলের সাধ্য নহে। নম্রতা, স্নেহ বা তেল আবশ্যক। অভিমান জয় করা আবশ্যক। বিশেষত অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া আবশ্যক।”

আবার পদোন্নতির জন্য ইংরাজীতে বাক্‌পটুতা থাকা. চালচলনে আধুনিকতা ও পোষাক পরিচ্ছদে সৌখিন হওয়া ও আচার আচরণে নম্রতা দেখানো প্রভৃতি লক্ষণগুলি অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু লেখক মনে করেন—“আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে বিশেষ চেষ্টা হয় না। উন্নতির ইচ্ছা অনেকের আছে সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা বিশেষ প্রবল নহে।” বড় হবার প্রবল ইচ্ছা থেকেই মানুষের উন্নতি তথা সমাজের উন্নতি—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লেখক এরূপ অভিমত পোষণ করেন: “যে সকল সমাজ বিশেষ উন্নত. সে সকল সমাজের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অতৃপ্তই উন্নতির মূল।”

‘গৃহসন্ন্যাস’[২৭] সঞ্জীবচন্দ্রের একটি অন্যতম বিশিষ্ট প্রবন্ধ। ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। লেখকের চিন্তাশীলতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় জীবনধর্মের মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রবন্ধকারের নান্দনিক অনুভূতি খুবই যুক্তিসঙ্গত। নিজের জীবন দিয়ে জীবনকে বিচার করলেই স্বাধীনতা মূল্যবোধ উপলব্ধি করা যায়। তাই তিনি মন্তব্য করেন:

“যে স্বাধীন, নিশ্চয়ই সে সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ছিল, সেইজন্য সন্ন্যাসীও ছিল। সন্ন্যাসীরা অনেকেই গৃহী, স্বাধীন গৃহী। জনক রাজা ভারতের প্রথম সন্ন্যাসী।”

সঞ্জীবচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য স্বাধীনতার মূল্যবোধকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে ভারতীয় স্বাধীনতাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করেছেন: “স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ধন। জার্মানীরা ইদানীং স্বাধীনতার অর্থ কতকাংশে বুঝিয়াছে, এই জন্য জার্মানীতে সন্ন্যাসী সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপীয় আর আর জাতিরা অসার, অনেকে আবার বাচাল; তাহাদের স্বাধীনতা অতিদূরে।”

ভারতীয় কৃষ্টি ও স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যই হল আত্মিক স্বাধীনতা, প্রাণের মুক্তি। ইউরোপীয়দের স্বাধীনতা জড়ের সঙ্গে জীবনের যোঝা-যুঝি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের বক্তব্য অবিস্মরণীয়: “স্বাধীনতার এরূপ মূর্তি আর কোথাও অনুমিত হয় নাই। মৃত্যু আইসে, পাশে দাঁড়ায়। জোড় হাত করে অনুমতি চায়, অনুমতি কখন পায় কখন পায়না।” এই চিত্র

কেবল স্বাধীনতার সংস্করণ। অদ্যাপি অনেক পরমহংস গোপনে আহার করে। পাছে ক্ষুৎ-পিপাসার বশবর্তী দেখিয়া লোকে পরাধীন মনে করে। অনেকে দারা-পুত্র ত্যাগ করে, পাছে লোকে মায়ার অধীন মনে করে। এই সকল ব্যবহার অনর্থক নহে। প্রতিধ্বনি পূর্বধ্বনির পরিচয়।"

'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে। 'গৃহসন্ন্যাস' প্রবন্ধে যেমন স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা বলে তিনি স্বীকার করেননি। দেশের সামাজিক, বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্ঘাটন না ঘটলে বাস্তবিকপক্ষে দেশের পরাধীনতা। প্রবন্ধকার বঙ্গদেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির সত্যটি খুঁজেছিলেন :

যে ব্যক্তি আপনার অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত অন্যের মুখাপেক্ষী হয়-- অন্যের প্রতি নির্ভর করে, সে ব্যক্তি পরাধীন। এইরূপ যে দেশ অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত বা সাংসারিক কোন সামগ্রীর নিমিত্ত অন্যদেশের প্রতি নির্ভর করে সে দেশও পরাধীন।'

তাঁর এই মন্তব্য থেকে মনে হয় যে মানুষ সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পন্ন না হলে, এবং শিল্পোন্নতির কথা না ভাবলে বাংলাদেশ কোন কালেই অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাবে না। তাঁর এই বক্তব্য সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।

চার

সঞ্জীবচন্দ্রের ধর্ম ও জীবনদর্শন সম্পর্কে দুটি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ— 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম'[২৯] 'পরকাল'[৩০]। জীবনের শেষের দিকে তিনি এই দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এই দুটি প্রবন্ধে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম-দর্শন গ্রন্থ অনুশীলন করে 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধটি লেখেন। একথা স্বীকার্য যে বঙ্কিমযুগে প্রবন্ধকারদের শুধুমাত্র ব্যক্তি-মানসটি প্রাধান্যলাভ করেনি, ভারতমুখী চেতনার দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ফলে তাঁদের রচনায় ভারতীয় সংস্কৃতি-দর্শন ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের লুপ্ত ধর্ম ও দর্শন উদ্ধার করাই সঞ্জীবচন্দ্রের মহৎ উদ্দেশ্য। দার্শনিক সঞ্জীবচন্দ্রের ধ্যান-ধারণার মূল অনুসন্ধান করতে হলে তাঁর এই উক্তিটি অবশ্যই স্মরণীয় :

"হিন্দু মতানুসারে ঈশ্বর আকাশবাণী দ্বারা পাপপুণ্য বলিয়া দিয়াছেন। মুসলমান মতানুসারে স্বয়ং আংশিক অবতারস্বরূপ মনুষ্যমধ্যে আসিয়া বলিয়া

দিয়াছেন। মুসলমান মতানুসারে মহম্মদের নিকট ঈশ্বর দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। বেদব্যাস বা শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ বা যীশু খ্রীষ্ট যিনিই ঈশ্বরবাক্য প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকুন কেহই মূল ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেহই বলেন নাই যে, আত্মা নাই, মৃত্যুর পর সকল ফুরায়, কেহই বলেন নাই যে, স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা। কেহই বলেন নাই যে পাপপুণ্য নাই। কেহই বলেন নাই যে পাপপুণ্যের বিচারকর্তা ঈশ্বর নাই। যদি কেহ তাহা না বলিয়া থাকেন, তবে মূল কথার পার্থক্য কই হইল? দেশ ভেদে বা সময় ভেদে স্বতন্ত্র উপদেষ্টা সম্ভব ; উপাসকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত উপদেষ্টার অমানুষিক পরিচয়ও সম্ভব।" (প্রথম পরিচ্ছদ-ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম)

লেখক প্রবন্ধের সূচনাতেই সাকার ও নিরাকারের প্রশ্ন নিয়ে বিশ্লেষণমুখী আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মানুষের আত্মা সম্পর্কে নানা মত ও নানা পথের আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন, আত্মা কি? আত্মার অস্তিত্ব ইহকাল পরকাল, কর্মফল প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে তিনি নানাভাবে তার মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনে একটি কথাই উদিত হয়েছে :

"মানুষের ভিতর মনুষ্য আছে, এই অনুভব ভারতবর্ষে প্রথম উত্থাপন হইল। উত্থাপিত হইবামাত্রই নূতন এক ধর্ম স্বতঃউপস্থিত হইল। মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে, এই অনুভবের সঙ্গে ইহকাল পরকাল, স্বর্গ, নরক, পাপ এ সকল অমানুষিক কথা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, একে একে তাহা সমুদায় অনুভব হইয়া নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইল।" (প্রথম পরিচ্ছেদ-ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম)

ধর্মের মৌলিকতা ও বিশালত্বের কথা চিন্তা করে তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তা হল :

"যিনি যাহা বলুন, কোন ধর্ম সত্য সত্যই পারত্রিক নহে। সমাজের মঙ্গল সাধনার্থ সকল ধর্মই প্রণীত হইয়াছে।" প্রকৃতপক্ষে সমাজের যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধতাই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। সঞ্জীবচন্দ্র যেন বাঙালীজাতিকে সেই মহৎ ধর্মে দীক্ষিত হবার ইঙ্গিত দান করেছেন।

জীবনের শেষ দিকে সঞ্জীবচন্দ্র 'পরকাল' চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তাঁর মন শান্ত ও সমাহিত। ধর্মচিন্তায় তাঁর মনের বিচিত্র অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং আত্মোপলব্ধির মধ্যে সর্বসাধারণের জীবনকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। 'পরকাল' প্রবন্ধটি এই কারণেই উল্লেখযোগ্য। ধর্মাধর্মবোধ থেকেই প্রবন্ধকারের পরকাল চিন্তা উৎসারিত : "পরকালের কথা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক।"

পাঁচ

'বৈজিকতত্ত্ব'[৩১] সঞ্জীবচন্দ্রের গবেষণাধর্মী একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে তাঁর গভীর অধ্যয়নশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন যুগের বিজ্ঞানের প্রসার প্রবন্ধকারের কৌতূহলী মনকে আকর্ষণ করে। সেই সময় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সারের Principles of Sociology, Vol. I (1876) এবং Vol. II ও Data of Ethics (1879) বইগুলি প্রকাশিত হয়। ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' এই সময়েই স্থাপিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'জ্ঞান' প্রবন্ধে কোঁৎ, কান্ট, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন মতামতগুলি বঙ্গদর্শনে আলোচনা করেন। ভিক্টোরীয় যুগে চার্লস ডারুইন (C. Darwin)-এর বিখ্যাত বিবর্তনবাদ সমাজজীবনে আলোড়ন তোলে। তাঁর 'The Origin of Species' যুগান্তকারী গ্রন্থ (১৮৫৯)। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সার ডারুইনের বিজ্ঞানসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। ডারুইনের বিবর্তনবাদে নতুন চিন্তাধারার সূচনা লক্ষিত হয়। দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ ডারুইন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদে আত্মজিজ্ঞাসার নতুন সন্ধান পেয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানত ডারুইনের Variation of Animals এবং Herbert Spencer-এর Principles Biology গ্রন্থদুটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং বৈজিকতত্ত্ব প্রবন্ধটি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে স্যার এফ. গ্যাল্টন (Sir F. Galton) এর Human faculty (1833) নামক জীববিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধটি অবশ্যই উল্লেখ্য। কারণ এই গ্রন্থে Eujencs অর্থাৎ সুপ্রজনন-বিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা ইউরোপে স্যার এফ. গ্যাল্টনই প্রথম সূচনা করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রও তাঁর বৈজিকতত্ত্বে ভ্রূণতত্ত্ব ও সুপ্রজননতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস 'বৈজিকতত্ত্ব' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

প্রবন্ধকার তাঁর সমস্ত প্রবন্ধটিকে মোট আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই প্রবন্ধটি রচনার মূলে মূলত তাঁর দুটি উদ্দেশ্য লক্ষণীয়—এক, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ থেকে বংশধারা, কুল ও গণের সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের কৌলিন্য ও জাতিভেদ প্রথাকে

প্রজনন বিত্তার সাহায্যে ব্যাখ্যানের চেষ্টা, দুই : সন্তান তার জনক জননীর দেহাকৃতির অধিকারী হয়—শুধুমাত্র পিতামাতার অবিকল দেহাকৃতি নয়—সেই সন্তান তার পূর্বপুরুষের ন্যায় হতে পারে কিংবা কিভাবে হয়, অথবা ভিন্ন বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে কিনা আলোচনা প্রসঙ্গে জাতি ও ব্যক্তিবিশেষে বৈজিক প্রবলতার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। সমকালীন যুগের মানুষের উপকারার্থে তিনি সুপ্রজনন তত্ত্বটিকে অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুধাবন করেছিলেন।

প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি বৈজিকতত্ত্বের কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমতঃ, বৈজিকতত্ত্বের প্রথম কথা হল—সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশানুরূপ হয়। যেমন গোজাতিতে ঘোটক জন্মে না বা ঘোটকজাতিতে গো জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ সন্তানের গঠন জনক ও জননীর ন্যায় হয় তার ছয়টি লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। (১) অস্থি—"জনক বা জননীর যে অংশে অস্থি দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র, লঘু বা গুরু, রিক্ত বা অতিরিক্ত থাকে সন্তানদেহের সেই অংশে সেই অস্থির অবস্থা তদ্রূপ হয়। এই প্রসঙ্গে হার্বাট স্পেন্সারের বক্তব্য তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"Some special modifications or organs caused by special changes in their functions may also be noted. That large hands are inherited by men and women whose ancestors led laborious lives, and that men and women, whose descent unused for many generations have been from those unused to manual labour, commonly have small hands are estadlished opinion"

(২) কেশ। কেশ সম্বন্ধে জীবদেহের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ডারুইন ও স্পেন্সারের উদ্ধৃতি দিয়ে তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। (৩) জনক বা জননীর ন্যায় সন্তানের বল মাংস, শিরা, হস্তাক্ষর, চালচলন, ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর সাধারণত দেখা যায়। প্রবন্ধকার ডারুইনের মন্তব্য 'বৈজিকতত্ত্বের' পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন : "On what a curious combination of corporeal structure mental character and training hand-writing depends." (৪) অভ্যাস, শিক্ষা, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ব্যাপার ব্যাপারগুলি পিতা-মাতা কর্তৃক প্রাপ্ত হয়। তাই পৈত্রিক উপজীবিকা সন্তানের অতি সহজে শিক্ষা হয়। তার প্রধান কারণ বৈজিক। দ্বিতীয় কারণ সংসর্গ।

"Some of the best illustrations of functional heredity, are furnished by the mental character of human races." (৫) সন্তানের আকৃতি-প্রকৃতি প্রধানত জনকের ন্যায় হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের আয়ু ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পিতা-মাতার ন্যায় হয়। (৬) পিতামাতার অসুখবিসুখগুলি সন্তানের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, মৃগীরোগ ও উন্মাদ রোগ প্রভৃতি।

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার ডারুইন ও হার্বাট স্পেন্সারের মতামতগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈজিকতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য:

"জনকের ন্যায় পুত্র হয়, জননীর ন্যায় কন্যা হয় একথা বাঙ্গালার সর্বত্র রাষ্ট্র। অনেক সময় সন্তানেরা কিয়দংশে মাতার ন্যায় হইয়া থাকে একথাও ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে আমরা এই সর্বসাধারণ পরিচিত কথার অনর্থক পুনরুক্তি করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিব না, বৈজিকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে নিয়মগুলি বাঙ্গালায় সচরাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করি এই আমাদের অভিপ্রায়।...

"বৈজিকতত্ত্ব অবলম্বন করিলে বোধহয় তাহাদেরআকৃতি প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করান যাইতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে বৈজিকতত্ত্বের অনুশীলন হওয়া অবধি গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন সংসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে দেখিলে বোধহয় যেন মনুষ্যের প্রয়োজনানুসারে তাহাদের গঠন হইতেছে।"

সঞ্জীবচন্দ্র যে ডারুইন ও হার্বাট স্পেন্সারের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও সঞ্জীবচন্দ্র ডারুইনের 'Variation of Animal & Plants' থেকে প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করে তুলেছেন: "পূর্বে বলা হইয়াছে যে জনক জননীর ন্যায় সন্তান হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা না হইয়া পিতামহ বা মাতামহের ন্যায় হইয়া থাকে, আবার অনেক সময় প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ তদূর্ধ্ব কোন পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে।" আলোচ্য পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার পায়রা, বৃষ ও ছাগ প্রভৃতি প্রাণীর অবয়ব, আচার-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন:

"আমাদের প্রত্যেকের শরীরে সেসকল চিহ্ন প্রকৃতি বা শক্তি এক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হয় তাহা ব্যতীত আরও শত শত প্রকৃতি বা শক্তি গুপ্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক পূর্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক ব্যতিক্রম বা যথাক্রম বীজবাহী হইয়া আমাদের শরীরে আসিয়া অপ্রকাশ্যভাবে রহিয়াছে, উপযুক্ত কারণ পাইলেই তাহার কোন কোনটি প্রকাশ পাইবে, নতুবা পূর্বমত অপ্রকাশ্যভাবে আমাদের শরীরে থাকিয়া আবার যথারীতি বীজানুগামী হইয়া সন্তানে যাইবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজের চিহ্নও লইয়া যাইবে।"

আলোচ্য পরিচ্ছেদে প্রাণীজগতের সংকর বীজ প্রসঙ্গে মানবজাতির বর্ণ-সংকরের কারণ ও তার আচার-আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বিজাতীয় বংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—"The parents of all our domesticated animals were of course aboriginally wild in disposition."

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সন্তান আবার বংশের কারো মতো না হয়ে একেবারে ভিন্ন বংশোদ্ভব লোকের ন্যায় হতে পারে, তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলন থাকলে এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় কিংবা গর্ভিনী যে যে মূর্তি ভাবনা করে, সন্তানের মূর্তি সেইরূপ হতে পারে। প্রবন্ধকার তা প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল :

"একজন যুবা একখানি ইংরেজি পট ক্রয় করেন। পটখানিতে একটি সুন্দর শিশুর নিদ্রাভঙ্গ চিত্রিত ছিল। যুবা একদিন দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী অতি আগ্রহের সহিত পটখানি একা দেখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চিত্রিত শিশুকে আদর করিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়া যুবতী অপ্রতিভ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের কি এমত সুন্দর সন্তান হইতে পারে? এই সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার স্বামী দেখিলেন যে গর্ভবতী সর্বদাই সেই পটখানির নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। পরে যথাকালে তাঁহার পুত্র জন্মিল; প্রায় ছয়মাস বয়সের সময় দেখা গেল যে সন্তানটির উদর ও বক্ষের গঠন পটের চিত্রিত শিশুর ন্যায় হইতেছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি জীব-জন্তু-মানুষের প্রবলতার কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে তাঁর বিদ্যাবত্তা কথনো বক্তব্যকে শুষ্ক করে তোলেনি বরং সরস ও সজীব মনের স্পর্শে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি

বৈজ্ঞিকতত্ত্বের দুরূহ বিষয়কে অতি সহজে পাঠকের কাছে পরিবেশন করতে পেরেছিলেন :

"জাতি বিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষে বীজের প্রবলতা থাকে। শৃগাল ও কুক্কুরের মধ্যে শৃগালের বৈজিক প্রবলতা অধিক ; অশ্ব ও গর্দভের বৈজিক প্রবলতা অধিক। শৃগাল ও কুক্‌কুরের শাবক উৎপাদিত হইতে শৃগালের ন্যায় শাবক হয়; কুক্‌কুরের ন্যায় একেবারে হয় না। অশ্ব ও গর্দভ সংযোগে যে শাবক জন্মে তাহা গর্দভের ন্যায়, অশ্বের ন্যায় হয় না। এই স্থলে বলিতে হইবে অশ্ব অপেক্ষা গর্দভের বৈজিক বল অধিক সেইজন্য শাবক গর্দভের ন্যায় হয়।"...

"এরূপ বৈজিক প্রবলতা কখন স্ত্রীর মধ্যে কখন পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। যেখানে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জননীর মত হয়, যে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জনকের মত হয়। এই জন্য কোন কোন লেখক বলেন যে, যে স্থলে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা অধিক সে স্থলে পুত্র অধিক জন্মে। ওয়াকার সাহেব লিখিয়াছেন যে, আইয়রলণ্ড দেশে একজন সাহেব তিন বিবাহ করেন এবং সেই তিন স্ত্রী দ্বারা তাঁহার যত সন্তান হইয়াছিল সকলগুলিই পুত্র হইয়াছিল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গের কুলবীজক সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞাতি-বিবাহের ভালমন্দের দুটি দিকই উন্মোচন করেছেন। বিলাতে পশু-ব্যবসায়ীরা সহোদর ও সহোদরার মধ্যে শাবক উৎপাদন করিয়া থাকে, আবার কখনো পিতা ও কন্যার মধ্যে শাবক উৎপাদন করায়। এই প্রথাকে ইংরাজীতে interbreeding বা in-and-in breeding বলে। বিলাতের কোন গোমেষাদির বংশ যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল তা' এই নিয়মের ফলে।

প্রসঙ্গত তিনি জ্ঞাতি বিবাহের কথা আলোচনা করেছেন। জ্ঞাতি বিবাহও প্রচলিত আছে। কিন্তু জ্ঞাতি বিবাহের খারাপ দিকগুলি সহজে লক্ষ্য করা যায় না। Darwin যথার্থই বলেছিলেন—The evil results from close breeding are difficult to detect for they accumulate slowly." প্রবন্ধকার ডারুইনের বিজ্ঞানের সেই তত্ত্বকে অতি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

"পশুদিগের মধ্যে ব্যবসায়ীরা যেরূপ করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি কোন বংশে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে তাহা হইলে জ্ঞাতি-বিবাহের ফলাফল বুঝা

যাইতে পারে। শুনা যায় যে মিশর রাজ্যে রাজপরিবারের মধ্যে সহোদর সহোদরায় বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু সে বংশ শীঘ্রই লোপ পাইয়াছে।"

বাস্তবিক, ডারুইনের প্রজনন-বিজ্ঞানের জগতে প্রবন্ধকারের ছিল অবাধ যাতায়াত। তিনি ডারুইনের জীব-বিজ্ঞানের বিশেষ দিকটি জনসমক্ষে উপস্থিত করে মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। জ্ঞাতিবিবাহ সমাজকল্যাণের পক্ষে সহায়ক নয়, বিখ্যাত বিজ্ঞানী তা' উপলব্ধি করেছিলেন :

"Manifest evil does not usually follow for pairing the nearest realation for two-three or even four generation— but several causes interfere with our detecting the evil."

সপ্তম পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র আমাদের দেশে জ্ঞাতি-বিবাহ কিরূপ ছিল তার স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হন। জ্ঞাতিবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি গোত্র, কৌলিন্য ও কৌলিন্য প্রথার প্রচলন সম্পর্কিত বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন। বৈজ্ঞিকতত্ত্বের দুরবগাহ গভীরতা সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পিতৃবীজ ও মাতৃবীজ সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর বক্তব্য প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য :

"শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে পিতাই জনক, সন্তান কেবল পিতা হইতে জন্মে, মাতা ক্ষেত্র মাত্র। এইজন্য পিতৃগোত্র বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জন্ম সম্বন্ধে মাতাই প্রধানা, পিতৃবীজ কেবল উত্তেজক মাত্র ; পিতৃবীজ অভাবেও গর্ভ হইতে পারে, তবে গর্ভ রক্ষা বড় হয় না।"

বিজ্ঞানের এই সত্যকে বিশ্বখ্যাত ডারুইন্ তাঁর গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র সেই তত্ত্বকে মাতৃভাষার মাধ্যমে তা বাঙালী পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। পিতৃবীজ ও মাতৃবীজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে খাঁচায় বন্দী পাখি, মুরগী হংসী প্রভৃতির গর্ভে পুরুষ সংস্রব ছাড়া অণ্ড বা শাবক জন্মায়, তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্ত থেকে একথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে পিতৃগোত্র অপেক্ষা মাতৃগোত্র অনেক নিকট। আমাদের সমাজে পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলেও মাতৃগোত্রে বিবাহ না থাকায় প্রকারান্তরে জ্ঞাতি-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কথা প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র কুলীনসমাজের বংশধারা বিশ্লেষণ করে কুলীন সমাজের খারাপ দিকগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কুলীনসমাজে পিতৃবংশ ছাড়া অন্য যে কোন বংশে বিবাহ দেবার প্রথা প্রচলন

ছিল। এমনকি মাতৃগোত্রে বিবাহ হতে কোন বাধা ছিল না। প্রবন্ধকার এই রীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য ডারুইনের মতবাদে অনুশীলিত: "বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে স্থলে কুলবীজক রীতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে সেখানে কখন কখন নূতন রক্ত সংযোগ করাইতে পারিলে বংশ রক্ষা হয়। বোধ করি আমাদের কুলীনদিগের মধ্যে শ্রোত্রীয় রক্ত কখন কখন মিশ্রিত হওয়ায় তাঁহাদের বংশ একেবারে লোপ নাই।"

যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্র বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথাকে বৈজিকতত্ত্বের অনুযায়ী বলে মনে করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার বৈজিকতত্ত্বানুসারে সন্তানের সঙ্গে জনক-জননীর বৈসাদৃশ্যের দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন:

"জনক-জননীর ন্যায় সন্তান ইহা নৈসর্গিক নিয়ম, আবার জনক-জননীর হইতে সন্তানের যে কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য থাকে ইহাও আর একটি নৈসর্গিক নিয়ম।',

এই বৈসাদৃশ্যের নানা কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন ডারুইনের তত্ত্ব অনুযায়ী। যেমন, ভোগজনিত, ক্রিয়াজনিত, খাদ্যগত ও অবস্থাগত বৈসাদৃশ্যের কারণগুলি তিনি নানা তথ্য উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যাবে না। তাঁর বক্তব্য তথ্যসমৃদ্ধ কিন্তু রসগ্রাহী ও সুস্পষ্ট:

"মনুষ্যমধ্যে সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য আমরা অনেক বুঝিতে পারি সত্য, কিন্তু সকলগুলি পারি না। জন্মভূমিগত একরূপ বৈসাদৃশ্য হয় আমরা তাহা একেবারে দেখিতে পাই না। কিন্তু একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে তাহারা এই বৈসাদৃশ্য বুঝিতে পারে। উষ্ণ প্রদেশে জাত ব্যক্তিকে তাহারা দংশন করে না, কিন্তু শীত প্রদেশে জাত ব্যক্তির অনাবৃত দেহ পাইলে একেবারে অস্থির করিয়া দেয়। পিতা যদি শীত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন আর পুত্রের জন্ম যদি উষ্ণ দেশে হয়, তাহা হইলে পিতাপুত্রে এই একপ্রকার বৈসাদৃশ্য জন্মে। এইরূপ বৈসাদৃশ্য কতই আছে।"

'বৈজিকতত্ত্ব' প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"সঞ্জীবচন্দ্র উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ থেকে বংশধারা, কুল ও গণের সম্বন্ধে অদ্ভুত সংবাদ উদ্ধার করেন। কথা প্রসঙ্গেই তিনি বাংলাদেশের কৌলিন্য প্রথা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের জাতি ও শ্রেণীভেদকে প্রজনন বিভার সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। এজাতীয় বৈজ্ঞানিক ও সমাজবিবর্তন-

মূলক কোন মৌলিক গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয়নি।"৩৬

বস্তুত, মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার পথকেই সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম প্রশস্ত করেছিলেন। তাঁর আগে বাংলাভাষায় যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচিত হয়নি, এমন কথা নয়। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের গভীরাশ্রয়ী মন বিজ্ঞানের সত্যকে কখনো অস্বীকার করেনি বরং তিনি সহজভাবেই বৈজ্ঞিকতত্ত্বের গভীর কথা বলেছেন।

ছয়

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য, প্রাচীন সভ্যতা, রাজনীতি, সমাজনীতি—সমস্তকিছুই আলোচনা করেছেন। কোথাও কোন পাণ্ডিত্য তাঁর সহজ প্রসন্নতাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর গদ্যরীতির সবচেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে প্রবন্ধকার তাঁর আলোচনাকে যতদূর সম্ভব সহজ-সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। সাধারণ ঘরোয়া উপমা, হাস্যরস প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্যকে সরস করে তুলেছে। কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি ও সহজ কথোপকথনের রীতি বিষয়বস্তুর দুরূহতাকে সহজ করে তুলেছে। কৌতুক রস ও বাগবৈদগ্ধ্য সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে উপভোগ্য করেছে। 'সংকার' 'বাল্যবিবাহের' মতো জটিল বিষয়কে তিনি সরস করে বর্ণনা করেছেন। 'চাকুরীর পরীক্ষা', 'পদোন্নতির পন্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধের ব্যক্তিগত জীবনের বেদনাবোধ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তেমনি সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টিধর্মে মণ্ডিত হয়েছে। 'স্ত্রীজাতি বন্দনা' 'বিবাহের ঘটকালি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে আধুনিকযুগের নারীজাতির স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ-রসিকতা উপভোগ্য 'একঘরে', 'বাহুবল' প্রভৃতি সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর সামাজিকতা বোধ অনায়াস লক্ষণীয়। 'যাত্রা', 'কীর্ত্তন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর পরিমার্জিত রুচি-বোধের পরিচয়ে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা ও রুচির প্রতি তাঁর কি অগাধ বিশ্বাস ছিল—, তারই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে এই দুটি প্রবন্ধে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধেই ব্যক্তিগত অনুভূতি দার্শনিক মননের সঙ্গে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। বৈজ্ঞিকতত্ত্বের মতো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ কুশলতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় রেখে গেছেন, তার তুলনা নেই। এতদিন পর্যন্ত যে বৈজ্ঞিকতত্ত্ব 'বঙ্গদর্শনের' পাতায় বন্দী জীবন কাটাচ্ছিল, তার যদি আগেই

মুক্তি হত, তাহলে পাঠক নিঃসন্দেহে সঞ্জীবচন্দ্রকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সার্থক রূপকার হিসাবে চিহ্নিত করত। 'পালামৌ' প্রবন্ধগুলিও তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। একথা অনস্বীকার্য যে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি তাঁর ব্যক্তিনিষ্ঠ রসের আশ্লেষে হাস্যগুণসম্পন্ন।

নির্দেশিকা

১। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"বাল্যকাল হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল।...কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর' নামক পত্রে তিনি দুই-একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিত হইয়াছিল।" (সঞ্জীবনী সুধা : ১৮৯৩)

২। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্জীবরচনাবলী—ভূমিকা। পৃঃ ৪২।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত ; এখনও তাহাই হইতে লাগিল। তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া. 'জাল প্রতাপচাঁদ'. 'পালামৌ', 'বৈজ্ঞিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। —(সঞ্জীবনী সুধা—১৮৯৩)।

৪। 'সঞ্জীবনী সুধা' (সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী, ১৮৯৩) বঙ্কিমচন্দ্র।

৫। সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র (জ্যোতিষচন্দ্রের পুত্র) শতজীবের কৃত 'ভ্রমর' এর লেখক সূচীর 'photostat'।

৬। 'পদোন্নতির পন্থা' ছিন্ন পাণ্ডুলিপির 'photostat'।

৭। জ্যোতিষকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের চিঠিখানির 'photostat'। সঞ্জীবচন্দ্র তখন যশোরে স্পেশাল সাবরেজিস্ট্রার। তিনি যে চিঠি লেখেন তাতে একজায়গায় লেখা ছিল—"আমি যে 'ভবিষ্যৎ হিন্দু ধর্ম' বলিয়া আর্টিকেল পাঠাইয়াছি, তাহার গেলি প্রুফ কি পেঁছি সম্বাদ কিছু না। ইতি ২১ মার্চ।"

৮। 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে লেখকের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া অংশ।

৯। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র রায় রচিত 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য 'গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পৃঃ পরিশিষ্ট—৪৮।

১০। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রচার' পত্রিকা।

১১। 'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধের লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের নাম সহ 'প্রচার' পত্রিকার প্রচ্ছদের 'photoatat'।

* 'কীর্ত্তন' প্রবন্ধটি 'ভ্রমরে' ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে (১৪-১৫ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

* "ভ্রমর" কীর্ত্তন—প্রথম প্রবন্ধ, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২, ১৪ সংখ্যা।

* ভ্রমরে 'কীর্ত্তনের' ২য় প্রবন্ধটি ১২৮২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় (১৫ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়।

১২। প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভ্রমরে'। ১ম খণ্ড, আশ্বিন (৬ সংখ্যা) ১২৮১ বঙ্গাব্দ।

১৩। প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনে। তৃতীয় বর্ষ—কার্ত্তিক (৭ম সংখ্যা) ১২৮১ বঙ্গাব্দ। 'কমলাকান্ত দপ্তরে' এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে।

১৪। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বৃত্রসংহার' কাব্যের ১ম খণ্ড (১—১১ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' এর তৃতীয় বর্ষ মাঘ ও ফাল্গুন (১২৮১ বঙ্গাব্দে) সংখ্যায় সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় খণ্ড (১২—২৪ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে)। সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন'র পাতায় সমালোচনা করেন পঞ্চমবর্ষের মাঘে ও ফাল্গুন সংখ্যায়।

১৫। "হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধেও বঙ্কিমবাবু 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করেন নাই। সঞ্জীববাবুই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' উহার এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। '—'আমার জীবন' —নবীনচন্দ্র সেন। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত নবীনচন্দ্র রচনাবলী —১ম, পৃঃ ৪৬৬)

১৬। সঞ্জীব রচনাবলী। ভূমিকা—পৃঃ ৪৪—৪৫

১৭। 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধটি ভ্রমরে (১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের 'জনসন প্রেস' থেকে।

১৮। 'বাঙালীর বাহুবল' প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮১) শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯। 'বাহুবল' প্রবন্ধটি 'ভ্রমর' পত্রিকার ১ম খণ্ড, ফাল্গুন ১২৮১, ১১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২০। ‘বিবাহের ঘটকালি’ প্রবন্ধটি রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ‘প্রচার’ পত্রিকায় ৩য় খণ্ড ৫ম-৬ষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যায় (১২৯৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ) প্রকাশিত হয়। কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২১। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত ‘ভ্রমর’ পত্রিকায় ১২৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

২২। ‘অকাতরে বিবাহ’ ‘ভ্রমরে’ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত। কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তি হয়নি।

২৩। ‘ভূতের সংসার’ প্রবন্ধটি ‘ভ্রমর’ পত্রিকায় ১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৪। ‘চাকুরীর পরীক্ষা’ প্রবন্ধটি সঞ্জীব সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শনের’র ১২৮৭ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৫। ‘ভূতের জাতি’ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ১১৮৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৬। ‘পদোন্নতির’ পন্থা প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শনে’ ১২৮৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৭। ‘গৃহসন্ন্যাস’ প্রবন্ধটি ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৮। তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) অতি অল্পকথায় তাঁহার ‘গৃহসন্ন্যাস’ প্রবন্ধে আসল-ভাব জমাইয়াছেন। একজন সাহিত্যিক কোমলওয়ালা উহা লিখিলে প্রবন্ধটির আয়তন বাড়িত। ‘বঙ্গবাণী’ (১৩৩০ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ)

২৯। ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম। বঙ্গদর্শন। ১২৮৭ বৈশাখ

৩০। পরকাল। প্রচার। ১২৯২ মাঘ

৩১। ‘বৈজ্ঞিকতত্ত্ব’ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে (পঞ্চমবর্ষ) ১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র এবং ১২৮৫ (ষষ্ঠ বর্ষ) বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সঞ্জীবনী সুধা’ থেকে জানা যায় যে এই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা।

৩২। The principles of Biology—II, P. 247—Herbert Spencer.

৩৩। Variation of Animals Vol. I, pagc 449, Darwin.

৩৪। Darwin—Variation of Animals—Vol. 2, page 92

৩৫। Darwin—Variation of Animals, Chapter XVIII.

৩৬। সঞ্জীব রচনাবলী। ভূমিকা, পৃঃ ৪৫

সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'

'রামেশ্বরে অদৃষ্ট'[১] সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলাই ভাল। কারণ ছোটগল্পের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য তখনও এদেশে রূপলাভ করেনি।

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের নতুন রূপটি লক্ষ্য করা যায় ফরাসী দেশে—মোঁপাসার রচনায়। জীবনযন্ত্রণা ও যুগযন্ত্রণার সার্থক রূপকার মোঁপাসা। রুশদেশেও ছোটগল্প রচনায় প্রয়াস তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্যিক পুশকিন কয়েকটি ভাল ছোটগল্প লেখেন। কিন্তু গোগোলকে ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ রূপকার বলে চিহ্নিত করা হয়। গোগোলের 'over coat' গল্পটি বিশ্বে অবিস্মরণীয়। ডস্টয়ভস্কি বলেছেন—"All of us born from Gogal's over coat." তারপর—টলস্টয়, তারপর চেকভ। রুশসাহিত্যে চেকভ আর ফরাসী মোঁপাসা এঁরা দুজনই বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের দিক নির্ণয় করেন।

ইংরাজী সাহিত্যে তখন ছোটগল্পের রূপায়ণ বিস্তৃতিলাভ করেনি। ইংরেজরা তখন উপন্যাস-সমুদ্রে ডুবে থাকতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সাময়িক পত্রিকা প্রসার লাভ করলে বিদেশী অনুকরণে কিছু কিছু ছোটগল্প লেখার চেষ্টা হয়। কিন্তু সেগুলি খাঁটি ছোটগল্পের পাশ মার্ক পায়নি। হয় সেগুলি বড় গল্প হয়েছে, নতুবা ক্ষুদ্র উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগালুঙ্গরীয়,' 'রাধারানী' ও সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'দামিনী' প্রভৃতি এই ধরনের রচনা। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছোটগল্প এদেশে প্রথম সার্থক রূপ লাভ করে। 'না বঙ্কিমচন্দ্র না সঞ্জীবচন্দ্র'[২]—ছোটগল্পের আঙ্গিক বা প্রকৃত স্বভাবটি ধরতে পারেননি। জীবনের সুখদুঃখ, বেদনা, অশ্রু ও হাসি—এক একটি ঘটনা নিয়ে গল্পের ফ্রেমে মালা গাঁথা হয়। সেই ফ্রেমে মালা গাঁথা নিপুণ শিল্পীর কাজ।

সেই কাজটি বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কোন শিল্পী ঠিকমত লিখতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়না। উপন্যাসের স্রোতে এই যুগের শিল্পীরা গা ভাসিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা,' 'যুগলাঙ্গুরীয়,' 'রাধারানী' ছোটগল্প হতে গিয়েও হতে পারল না। অনুরূপ সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও

'যামিনী' আখ্যানটুটি ছোটগল্প হতে গিয়ে হতে পারল না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' সম্বন্ধে বলেছিলেন —'ইহা আয়তনের দিক দিয়া প্রায় ছোটগল্পের অনুরূপ।'[৩]

সত্যিই, আয়তনের দিক থেকে 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গল্পটি ছোটগল্পের অনুরূপ কিন্তু ছোটগল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যে খুবই দুর্বল। এমন কোন অবিস্মরণীয় মুহূর্তের আনন্দ-বেদনার ঘনধ্বংস আলোচ্য গল্পে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছোট-গল্পের অনবদ্য সংজ্ঞা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—"অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

এমন সূক্ষ্ম অনুভূতি সেইকালে কোন লেখকের ছিল বলে বোধ হয়না। সেইজন্য লেখক 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গ্রন্থটিকে উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন এবং মানবজীবনের অদৃষ্টকে কাহিনীর মূল বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। যদিও পিতাপুত্রের বাৎসল্য রসপূর্ণ চিত্রটি খুবই উপাদেয় কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র সেই বাৎসল্য রসকে যথাযথ রূপদান করতে পারেননি। ফলে ছোটগল্প হতে পারল না।

আবার, 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'কে উপন্যাস বলা চলে না। কারণ উপন্যাসের রীতি নীতি, প্রকরণ, প্লট ও বিষয়ের জটিলতা বলতে কিছুই নেই এই গ্রন্থে। কাহিনীবিন্যাসে, ঘটনাসন্ধি নির্মাণে ও চরিত্রাঙ্কনে উপন্যাসের শিল্পরীতির কোন বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। অদৃষ্টের নির্মম ক্রূর পরিহাসকে সাব্যস্ত করবার জন্যেই হয়ত তাঁর এই উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লিখেছেন—''সেচ্ছানির্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, 'মরিব'—মরিতে পারিল না—বিশ বৎসরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। আমরা মনে করি, 'এই করিব', আর একজন মনে করেন আর। আমাদিগের কার্য্য দৃষ্ট; তাঁহার কার্য্য, অদৃষ্ট।" (৩য় পরিচ্ছেদ)

এই 'অদৃষ্টবাদ'কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে একটি বাৎসল্যরসের কাহিনী মার খেয়ে গেল। আখ্যানটির একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'কে ৪টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে।

(এক) রামেশ্বর শর্মার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। পিতার শ্রাদ্ধে সর্বস্ব খুইয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করা কঠিন হল। যুবতী ভার্যা পার্বতী আর তিন বছরের পুত্র আনন্দদুলালের সঙ্গে উপবাসী জীবনযাত্রা দুঃসহ হয়ে উঠে। শিশু আনন্দদুলালের অনাহারে থাকার কষ্ট রামেশ্বর সহ্য করতে পারে না; অথচ

'তেড়িকাটা' কোটগায়ে বাবুরা যারা পয়সা নিয়ে 'ছিনিমিনি' খেলে, তাদের কাছে ভিক্ষা করেও দু-একটা পয়সা পাওয়া যায় না বরং উল্টে তারা রামেশ্বরকে মারধোর করতে যায়।

আনন্দদুলালের ক্ষুধাপীড়িত কাতর মুখের কথা ভেবে রামেশ্বর গৃহস্থের ঘরে হানা দিয়ে পয়সা চুরি করে। পেটরায় তিনটাকা আটআনা থাকা সত্ত্বেও আট আনা চুরি করে। তারপর দোকানীর অবর্তমানে রাত্রের মত চাল, নুন দোকান থেকে নিয়ে সেই স্থানে উচিত মূল্য রেখে-আসে। রাত্রে পিতা-পুত্রে আহার করে। কিন্তু পার্বতী নিজে আহার না করে পরদিনের জন্যে রেখে দেয়। সপরিবারে রামেশ্বর স্বগ্রাম ত্যাগ করে ও ভাতিপুরে বসবাস শুরু করে। উগ্র ক্ষত্রিয় বলে নিজের পরিচয় দেয়। সে অপরিচিত বলে কেউ চাকুরী দেয় না। গ্রামের নায়েবের কাছে পিয়াদাগিরির কাজের জন্যে কাকুতি মিনতি করে। এই সুযোগে নায়েব গ্রামের একটি স্ত্রীহত্যার আসামীর জন্যে রামেশ্বরকে সুপারিশ করে। পেটের জ্বালায় রামেশ্বর তাতেই রাজি॰ হয়।

"শীঘ্র একজন অপরাধী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট না পাঠাইলে আবার জমিদারের দণ্ড হইবে, অথবা তাঁহার জমিদারী যাইবে, অতএব আসামী সাজাইয়া একজনকে পাঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।" (১ম পরিচ্ছেদ)

মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে রামেশ্বর আসামী হতে রাজী হয়। পার্বতী এত টাকা একত্রে পেয়ে বিস্মিত হয়। বৃত্তান্ত জেনে পার্বতী টাকা টান মেরে ফেলে দেয়। তথাপি রামেশ্বর স্ত্রীপুত্রের আকর্ষণ ছিন্ন করে টাকা কটি বিছানায় রেখে একরারী আসামী সেজে জেল খাটতে যায়। পার্বতীর ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছিল।

প্রথম পরিচ্ছেদে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয় নেই। অদৃশ্য ভাগ্যের হাতে নায়ক নিজেকে তুলে দিয়েছে। ভাবনার চরিতার্থতায় প্লটের ঘটেছে অতি সরলীকরণ। অদৃষ্টের ক্রীড়নক হয়ে নায়ক রমেশ ছুটেছে অন্ধকার পথে।

(দুই) নায়েব ও দারোগার কথোপকথনের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্রের চিত্র উপস্থাপিতকরা হয়েছে। আসামী সাজালেই আসামী হয় না—অতএব আসামীর ঘরে যাতে চুরির মাল পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবার জন্যই একটি জলপাত্র রামেশ্বরের স্ত্রীর ঘরে রেখে আসবার জন্য দারোগা নায়েবকে নির্দেশ দেন।

কিন্তু ফলটা ফলেছিল অন্যরকম। রামেশ্বর গভীর রাত্রে পদাতিকদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে গৃহের এক বৃক্ষপাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় নায়েব সাহেব তার স্ত্রীর ঘরের কাছে গেল। তখনও তার স্ত্রী কাঁদছিল। তার স্বামীর খবর দেওয়ার অজুহাতে নায়েব ঘরের ভিতর ঢুকেছিল।

"নায়েব গৃহে প্রবেশ করিলে আবার দ্বার রুদ্ধ হইল, রামেশ্বর মনে করিলেন, তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না।"

সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত রামেশ্বর কিছুই যাচাই করল না। সে চোখে সবকিছু অন্ধকার দেখল। আবার সে পদাতিকের কাছে ধরা দিল। দায়রা সোপর্দ হল—বিশ বৎসরের জন্য রামেশ্বরের দ্বীপান্তর হল। সতীসাধ্বী পার্বতী জলে ঝাঁপ দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নিজের স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে জেলখানায় হাজত-বাস করতে যাওয়ায় নাটকীয় মুহূর্তে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।

(তিন) আগেই বলা হয়েছে—অদৃষ্টকে ভর করে এগিয়ে চলেছে রামেশ্বর। বিশবছর হাজতবাস করে ফিরে এসেছে সে। পত্নীর কথা তত নয়, আনন্দদুলালের কথা যত বেশী করে মনে পড়ত তার সন্তানের খোঁজে সে উন্মত্ত হয়ে গেল। মারধোর রাহাজানি করতে সুরু করল। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত, দিবালোকে দোকান ভেঙে চুরি প্রভৃতি কুকর্মে মত্ত হয়ে উঠল। খুনে-ডাকাতের সর্দার সে এখন। ডাকাতি করতে গিয়ে একদিন গুরুতর আহত হয়ে বনে পড়েছিল। সেই মুমূর্ষু ডাকাতকে একজন ডাক্তার বাঁচিয়ে তোলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, যে ডাক্তার তাকে ভাল করে তুলেছে, সে তারই ছেলে। এই সাক্ষাৎকার খুবই আকস্মিক। পার্বতী ও রামেশ্বরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ছিল।

(চার) রামেশ্বর এখন রামু সর্দার। তার ভয়ে দেশের লোক, গ্রামবাসী তটস্থ। রামেশ্বর একরাত্রে ডাকাতি করবার জন্য দল বেঁধে চলেছে, এমন সময় দুই প্রহর রাত্রে একজন বাবু পাল্কীকরে যাচ্ছে। ডাকাতরা তাকে শেষ করবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু রামেশ্বর চিনতে পারল যে সেই বাবুটি আসলে সেই ডাক্তারবাবু যে একদিন তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল। অন্যান্য ডাকাতদের নিরস্ত করে রামেশ্বর অতীতের কথা স্মরণ করে ডাক্তারবাবুকে বাঁচালেন।

"ডাক্তারবাবু দস্যুর এরূপ কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি স্বভাবতঃ

মহাত্মা—কেন এ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ?"[৬]

তখন জীবনের সমস্ত কথাই রামেশ্বর খুলে বলেছিল ডাক্তারবাবুকে। পরিচয় পেয়ে রামেশ্বর জানতে পারে—ডাক্তার তারই ছেলে। বাড়ীতে ফিরে পার্বতীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় পরিতৃপ্ত এবং শান্ত হয়।

মোটামুটি চারটি পরিচ্ছেদে এই হল আখ্যানের বিষয়বস্তু। একেবারেই সাদাসিধে—বর্ণনার রঙে ও কল্পনার বিস্তারে শিল্পীর জাগ্রত দৃষ্টি ছিলনা। সঞ্জীবচন্দ্র কৌতুহলময় কাহিনী সৃষ্টি করেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্টে' ছোটগল্প বা উপন্যাসের কোন রীতিই ধরা পড়েনি। এটি একটি বিস্তৃত দেহ গল্প। এর কারণ, কাহিনীটি একমুখী। ঘটনার বিকাশে ঘাত-প্রতিঘাত নেই। নায়ক চরিত্রে অভিব্যক্তি যৎসামান্য। নায়ক রামেশ্বর ভীরু স্বভাবের যুবক। উপকথার মত কাহিনীর বিন্যাস গ্রথিত হয়েছে মাত্র।

পার্বতী চরিত্রে লেখকের কৃতিত্ব নেই। শিশু আনন্দগোপালের বিকাশের কোনো সঙ্গতি নেই।

সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে—'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' চমকপ্রদ ঘটনাবিন্যাসের সীমা ছাড়িয়ে উপন্যাসের উচ্চতর রাজ্যে পৌঁছিতে পারেনি এবং রামেশ্বরের শিশুপুত্রের বাৎসল্যরসপূর্ণ চিত্রে লেখকের নৈপুণ্য শক্তি কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।[৭]

শিল্পরূপের বিচারে 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' সামঞ্জস্যহীন বাগ্‌বিস্তার ছাড়া লেখকের সৃষ্টি-উৎস মোটেই আলোকিত হয়নি।

কিন্তু প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের অনুভূতিগুলি সত্যিই উপভোগ্য চন্দ্রনাথ বসু তার সুন্দর চিত্র নিরূপণ করেছেন—"যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর ভাবিত, তাহার আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে; এবং যখন সেই সমুদ্রে অস্পষ্ট লক্ষ্য একটি তরঙ্গ উঁচু হইয়া নাচিত, তখন রামেশ্বর মনে করিত, তাহার আনন্দদুলাল নাচিতেছে।"[৮]

'দামিনীকে' 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' উপন্যাসের মত একটি ক্ষুদ্রায়তনের উপন্যাস বলা হয়েছে। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' প্রকাশের একমাস পরে ১২৮১-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'দামিনী' প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' একই সময়ে, একই মানসিকতায় লেখা। 'দামিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর চার বছর পর 'সঞ্জীবনী সুধা'য় অগ্রজের অন্যান্য রচনায়

সঙ্গে এটি অন্তর্ভুক্ত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিকে পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র যখন 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' আখ্যান দুটি রচনা করেন তখন তিনি Special Sub-Registrar ছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদটি হারিয়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছেন। সামাজিক জীবনের প্রভাব স্বভাবতই লেখক সাহিত্যিকদের প্রভাবান্বিত করে। বিশেষতঃ প্রতিবেশীদের ক্রুর চরিত্রগুলি তাঁর মনের উপর দারুণ প্রভাববিস্তার করত। তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ 'পালামৌ' ভ্রমণ স্মৃতিতেও প্রতিবেশীদের সেই একই বাস্তবচিত্রই অঙ্কন করেছেন তিনি।

শিশু চরিত্র অঙ্কনে তাঁর সহজ প্রত্যয়, সৌন্দর্যপ্রীতিতে তন্ময়তা, সহজ রসিকতায় সিদ্ধহস্তের পরিচয় এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। সেই সমাজের টুকরো টুকরো চিত্র চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে, ভণ্ড আত্মবঞ্চনার প্রতিবিম্বও তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। সমাজের আত্মম্ভরী অপদার্থ মানুষের চরিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। মাতৃহারা সন্তানের মর্মন্তুদ চিত্র যেমন অঙ্কন করেছেন, তেমনি স্বামীহারা স্ত্রীলোকের অন্তর্জ্বালার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু সব চিত্রই খণ্ড খণ্ড টুকরো টুকরো ছেঁড়া ছেঁড়া—যার মধ্যে তাঁর নিষ্ঠা অধ্যাবসায় শ্রমশীলতার অভাবটাই বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে আখ্যানের কাঠামো শিথিল হয়েছে।

পাগল ও পাগলী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর স্পৃহা বেশী ছিল। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গ্রন্থে রামেশ্বর একসময় পাগল হয়ে যায়, 'দামিনী'তেও এক পাগলী দেখা যায়। সে দামিনীর মা। এই মুহূর্তে 'মাধবীলতা'র পিতম পাগলের কথা মনে হয়।[১০] এই সমস্ত পাগল ও পাগলী চরিত্রগুলি কতখানি উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে তা চিন্তার বিষয়।

সঞ্জীবচন্দ্রের কাহিনীর রচনারীতিতে কতকগুলি ব্যাপারে এই প্রকার মিল দেখা যায়।

(১) আজগুবি উপাদানের আমদানি।
(২) সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য।
(৩) পাগলী চরিত্র গঠন।
(৪) অলৌকিক চিন্তা।

'দামিনী'কে উপন্যাস বলা চলে না, ছোটগল্পের কোন বৈশিষ্ট্যই নেই।

নানা ভাব-ভাবনা ও ঘটনা 'দামিনী'কে অসার্থক করেছে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি মূল কাহিনীকে ধূলিসাৎ করেছে।

'দামিনী' ক্ষুদ্র উপন্যাসে ছটি পরিচ্ছেদ আছে।

(এক) ৭ বছরের মেয়ে মাতৃহারা 'দামিনী' ও মাতামহীর নিবিড় সম্পর্ক গ্রথিত হয়েছে। প্রথম বলা হয়েছে—"আয়ী, আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" দামিনীর সঙ্গে রমেশের প্রণয়। দামিনী চরিত্রে তার মায়ের অবাস্তর অদৃশ্য আকর্ষণ আখ্যানটির গতি-প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ করেছে।

(দুই) রমেশের সঙ্গে দামিনীর বিয়ে হয়েছে। এখন দামিনীর বয়স ১৭। রমেশ ও দামিনীকে সুখী বলাই ভাল। একজন উন্মাদিনীর আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। দামিনীর প্রতি তার ভীষণ টান। দামিনী কিছুতেই বুঝতে পারে না—কেন পাগলী তাঁকে এত ভালবাসে। রমেশের বিমাতা—পাগলী ও দামিনীর মাখামাখি পছন্দ করে না। পাগলী দামিনীর মা, স্বাতী মারা গেলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে।

(তিন) পাগলী ভাগীরথী তীরে একটি ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করে, রমেশদের বাড়ীর কাছাকাছি। রমেশ শিল্পালয়ে গমন করে। মুসলমান ফৌজদারের পুত্র রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে দামিনীকে চুরি করে নিয়ে যায় রাত্রে। গ্রামের লোকেরা তাকে উদ্ধার করতে যায় না। পাগলীর ত্রিশূলে ফৌজদারের পুত্র নিহত হয়। দামিনীকে রাস্তায় ফেলে রেখে বাহকেরা চলে যায়।

(চার) যেহেতু যবনেরা দামিনীকে চুরি করে নিয়ে যায়—সেইজন্য অদিতি ভট্টাচার্য পুত্রবধূকে গ্রহণ করতে পারলেন না—'একঘরে'[১১] হয়ে যাবার ভয়ে রমেশের বিমাতার পরামর্শ মত গ্রামের প্রতিবাসীরাও দামিনীকে বাড়ীতে স্থান দেয় নি।

(পাঁচ) শ্বশুর অদিতি ভট্টাচার্য দামিনী যবনস্পৃষ্টা হয়েছে বলে তাকে ঘরে স্থান দিতে পারল না। দামিনী কোথায় হারিয়ে গেল, পরদিন কেউ খুঁজে পেল না।

(ছয়) রমেশ শিল্পবাড়ী থেকে ফিরে সমস্ত কিছু শুনে গৃহত্যাগ করল। দামিনীকে খুঁজে পেয়েছিল সেই পোড়ো অট্টালিকায়। দামিনী তখন মৃত্যুশয্যায়। দামিনীর মৃত্যুর পর পাগলী রমেশকে গলা টিপে মেরে ফেলে।

কাহিনীটি আবগুবি, অবিশ্বাস্য মনে হবে। ঘটনায় কার্যকারণের সূত্র নেই। প্লট শিথিল, গ্রন্থের উদ্দেশ্য শূন্য। চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক এবং প্রায়ই অসম্পূর্ণ। রমেশ, দামিনী ও অদিতি ভট্টাচার্যের চরিত্রের যথাযথ বিকাশ-

-পাত ঘটেনি। বিমাতা চরিত্রের ক্রূরতা সুস্পষ্ট হয়নি। রমেশের ব্যক্তিত্ব-হীনতা কষ্টদায়ক। তার নারীসুলভ মনোভাব খুবই হাস্যকর। তার মৃত্যুঘটনা অবান্তর ও অবাস্তবোচিত হয়েছে।

মনে হয় পাগলী এই আখ্যানের নায়িকা। রমেশের সঙ্গে দামিনীর মিলন দৈবঘটনার মত। সঞ্জীবচন্দ্রের গল্পের নায়কেরা শুধু কাঁদতে জানে, অদৃষ্ট বা দৈবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জানে না। দামিনীর চিত্তচাঞ্চল্য, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে তেমন ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয়নি। অদিতি ভট্টাচার্য টাইপ চরিত্র হয়েও হতে পারল না। তবে সেই কালের সমাজচিত্র অঙ্কন তাঁর দক্ষতা স্বীকার্য।

শুধু একটি অতিপ্রাকৃত সত্তা সমস্ত গল্পটিকে ভর করে আছে। এই অতি-প্রাকৃত সত্তাটি হল মায়ের প্রতি দামিনীর অজ্ঞাত টান। কিন্তু গল্পে সেই সত্তার সম্যক বিকাশ সাধন ঘটেনি। কারণ 'দামিনীর পরিকল্পনা এবং রচনারীতি তখনকার পক্ষে প্রত্যাশিত।[১২]

দাম্পত্যজীবনের ঘরোয়া ছবিগুলি তাঁর বর্ণনায় খুবই উপভোগ্য হয়েছে। সঞ্জীব এখানে নিপুণ শিল্পীর মত তুলির কাজ করেছেন—নীচের উদ্ধৃতিটি তার চমৎকার নিদর্শন—

"শয্যায় দুই একটি পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া, দামিনীকে বলিলেন—'কোন্ আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে?'

--দামিনী বলিল—'খুব করেছে, উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখতে পারেন, আর লোকে চুরি করতে পারে না? খুব করেছ, চুরি করেছ।'

রমেশ বলিলেন—'খুব করেছে বই কি? চোরকে একবার ধরিতে পারিলে বুঝিতে পারি।"

বাঙালী প্রতিবাসীদের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে তাঁর অভিজ্ঞতা অবশ্যস্বীকার্য। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল : –

"রাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্বাটিতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই, সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিয়া রহিলেন, ক্রমে প্রতিবাসিগণ, আত্মীয় কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করিতে আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন, কি বিপদ, কি বিপদ'। কেহ বলিলেন, 'কখন কাহার কি ঘটে, কে বলিতে পারে? কে বলিলেন, 'অদৃষ্টই মূল।'

আবার অদৃষ্টের কথা এলেই মনে হয়, এই গল্পটি 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'-এর পরবর্তী রচনা।

নির্দেশিকা

১। রামেশ্বরের অদৃষ্ট : ভ্রমরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ হয়। পুস্তকাকারে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে (১২৭৭ সালে জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়)।

২। 'বিশেষ আঙ্গিকগত যে ছোটগল্প উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে য়ুরোপে জনপ্রিয় হয়েছে, তার প্রকৃত স্বভাবটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এদেশে কেউ-ই ধরতে পারেননি—না বঙ্কিমচন্দ্র, না সঞ্জীবচন্দ্র। অথচ তাঁদের কোন কোন রচনা আর একটু মাজাঘষা হলে ছোটগল্প বলে মেনে নেওয়া যেত। '—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সঞ্জীব রচনাবলী'-ভূমিকা, পৃঃ ১৮।

৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৩৪

৪। রামেশ্বর বুঝি পয়সা চুরির প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছে।

৫। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

৬। রামেশ্বরের অদৃষ্ট—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৭। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

৮। চন্দ্রনাথ বসু : সঞ্জীব সাহিত্য সমালোচনা।

৯। সঞ্জীবনী সুধা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০। চন্দ্রনাথ বসু : সঞ্জীব সাহিত্য আলোচনা।

১১। 'একঘরে' নামে সঞ্জীবচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ আছে।

১২। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

সঞ্জীব উপন্যাসের আলোচনা

মানবচেতনাকে যুগোচিত ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে অন্বিত করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থেকেই উপন্যাসের উদ্ভব। সেই উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগসাধনার ফলে। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের প্রবল আঘাতে নেপোলিয়নীয় যুগে সাহিত্যমনের মুক্তির স্বপ্নোল্লাস ও স্বপ্নভঙ্গ—দুইই ঘটে। ভারতবর্ষে শাসন ও শোষণের ঔপনিবেশিক ক্ষেত্র এ-যুগেই বিস্তৃত হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, বায়রণের যুগ তখন। আমাদের দেশেও ইংরাজী সাহিত্যের ঘাত-প্রতিঘাত এসে পড়ে। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর অপেক্ষা স্কটের (Sir Walter Scott) ঐতিহাসিক রোমান্সের প্রভাব বাঙালীর মনে বেশী আকর্ষণ করে। এমনকি অষ্টাদশ শতকের বাস্তববাদী নভেলিষ্ট রিচার্ডসন ফিল্ডিং প্রমুখ স্রষ্টাদের প্রভাব ততটা বিস্তারলাভ করেনি।

স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসই বাঙালী গদ্য-স্রষ্টাদের হৃদয় মন কেড়ে নিয়েছিল। আমাদের দেশে স্কটের 'ওয়েভার্লি' (Waverly) নভেলগুলি নিছক ঐতিহাসিক রোমান্সই নয়, সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য হিসাবে তা' গণ্য। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্কটের নভেলের দৃষ্টান্তে রোমান্টিক নভেলেরও একটি ইংরাজী ক্ষুদ্র ধারা বাংলাসাহিত্যে এসে মিলিত হয়েছিল। কারণ এই সময় থেকে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তথাপি হেনরি জেমস থেকে টমাস হার্ডি পর্যন্ত ইংরাজী নভেলের বিচিত্র নতুন ধারা সমসাময়িক বাঙালী লেখক ও ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিকে কতখানি প্রসারিত করেছিল, তা সুস্পষ্ট নয়। যদিচ ডিফো থেকে স্কট পর্যন্ত ইংরাজী নভেলের ধারা দিয়েই বাঙলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমুখী বাস্তবরূপ ক্রমশঃ প্রবল হয়। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্স থেকেই স্বপ্নভঙ্গের জীবনানুভূতি পরিলক্ষিত হয়; ডিকেন্সের উপন্যাসে হাস্যোজ্জ্বল বেদনাক্লিষ্ট অনুভূতি প্রবণতা বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। জর্জ এলিয়ট অন্তরস্থিত মানুষকে (inner man) চিত্রিত করলেন তাঁর উপন্যাসে। হার্ডির রচনায় কিন্তু এই সমস্ত সমসাময়িক ইংরাজী ঔপন্যাসিকদের স্পষ্ট ছায়া বাংলা উপন্যাসে উনবিংশ শতকে আশানুরূপ প্রতীয়মান হয় না।[১]

তাই উনবিংশ শতকে উপন্যাসে স্কটের রোমান্সের রূপান্তরের প্রথম রূপ

'দুর্গেশনন্দিনী' তারপর—'কপালকুণ্ডলা'। এবং তারপরে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সামাজিক উপন্যাস ও 'রাজসিংহের' মতো একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। অবশ্য তার পূর্বে সামাজিক নক্সা কাব্যনাটকের মতো আখ্যায়িকা-ভুক্ত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তারে এদেশে আকস্মিক অর্থনৈতিক স্ফীতির একটি ক্ষণস্থায়ী জোয়ার এসেছিল।[১] ফলে বাঙালীসমাজের 'বাবু'[২] নামে পরিচিত একটি সম্প্রদায় ভোগ-বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। তাদেরই জীবনবৃত্ত নিয়ে রচিত হয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'[৩] ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প‍্যাঁচার নকসা'।[৪] এগুলির কোনটাই ঠিক উপন্যাস নয়—উপন্যাসের খসড়া। এছাড়া শ্রীমতী হ্যানা মুলেন্সের 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা উপন্যাসের গৌরব দাবী করতে পারে না। ১৮৫৬ খ্রীঃ ইংরাজী 'রোমান্স ও হিস্টরী' গ্রন্থের উপাখ্যানের ভাব অবলম্বনে ভূদেব মুখোপাধ্যায়—'সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়'[৫] উপন্যাস দুটি রচনা করেন। এই পথ ধরেই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স-ধর্মী উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাসের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় রমেশচন্দ্র দত্ত 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' নামে দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। বঙ্কিমযুগে আর যাঁরা বাংলা উপন্যাস রচনায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচাঁদ ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, যোগেশচন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের বঙ্কিম প্রতিভার আলোকচ্ছটা ভেদ করা অসম্ভব ছিল। তথাপি সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা', ও 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাস রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। বিশেষত তাঁর ইতিহাস-আশ্রিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসে সঞ্জীবচন্দ্র স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

তথাপি সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের উপন্যাসের form সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। নভেল বা উপন্যাস বলতে কী বুঝায়? কী তার রূপ? কী-ইবা তার চরিত্র? নভেল হল—এক বা একাধিক খণ্ডের কল্পনামূলক গদ্যকাহিনী। নভেল বাস্তব সাধারণ বা

স্বাভাবিক জীবন ও ঘটনায় সম্পৃক্ত মানুষের চরিত্রভাষ্য। কাহিনীর মধ্যে একটি ধারাবাহিক আখ্যান বিন্যাস (প্লট), বাস্তবজীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র ও ঘটনা (action) অঙ্কিত হয়। নভেলের আভিধানিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "Fictitious prose narrative of sufficient length to fill and or more volumes, portraying character and actions representative of real life in continuous plot."৬

অর্থাৎ নভেল বা উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ প্লট বা কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনার বর্ণনা। ঘটনার নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত যা কাহিনীবিন্যাসে চিত্রিত হয়। যথার্থ নভেল বা উপন্যাস তাই রোমান্স নয়। রোমান্স প্রধানত মধ্যযুগের আখ্যানকাব্য—আর নভেল আধুনিক শিল্পসম্মত কাহিনী। কাহিনীবিন্যাসে চরিত্র, সংলাপ, ভাষারীতি ও পরিবেশ রচনার যথাযোগ্যতা থাকা চাই—এসবই উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ। সকল অঙ্গের মোটামুটি সামঞ্জস্য না ঘটলে তা যথাযথ রূপলাভ করে না। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র তা জানতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আরো জানতেন—সৃষ্টি একটা অভিনব ও অনন্ত ক্রিয়া, উপন্যাসে প্লট, চরিত্র ও প্রকাশরীতির সমন্বয়ে সেই অভিনবত্ব ও অখণ্ডতা পূর্ণতালাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই গোড়ার কথা জেনেই উপন্যাস রচনা করেছেন।

বঙ্কিমযুগের সমকালীন ঔপন্যাসিকগণ বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছিলেন তা স্বীকার্য। সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ও দেশকাল প্রয়োজনে লেখনী ধারণ করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্স ও ইতিহাস বিপুল বন্যাস্রোতে আত্মসমর্পণ করেছে। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার নিজস্ব প্রবণতা তাঁর রচিত উপন্যাসে প্রকাশিত। সে প্রবাহ উনিশ শতকের ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, সে স্রোতধারা রবীন্দ্রনাথের (বউ ঠাকুরানীর হাট-১৮৮৩, রাজর্ষি-১৮৮৭) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে বিংশ-শতাব্দীর (চোখের বালি-১৯০৩) প্রারম্ভে ক্রমশঃ ক্ষীণস্রোত হয়ে আসে বাস্তবধর্মী উপন্যাসের সংস্পর্শে।

উপন্যাসের উপাদান হলো মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। কেহ বা কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন, কেহবা সমসাময়িক ঘটনাকে উপাদান হিসাবে সংগ্রহ করে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন,

কোন কোন ঔপন্যাসিক ইতিহাসের পটভূমিকা হতে তাঁর প্লট নির্বাচন করেন। যেমন কল্পনা ও ইতিহাসের সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' (১৮৬৫) রচনা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের বিরাট ঘটনাস্রোতে পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের মর্মবাণী উদ্ভাসিত হয় না। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হৃদয়াবেগ ও জীবনযন্ত্রণা তাঁর 'রাজসিংহে' একেবারেই অবজ্ঞাত। বস্তুতঃ উপন্যাস সাধারণ জীবন ও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ কাহিনী। মার্কিন 'New Standard Dictionary'[৭]-তে বলা হয়েছে চরিত্র ও সংঘাতে কাহিনীর সুবিন্যস্ত বিন্যাসই হল উপন্যাস এবং নভেলের সঙ্গে রোমান্সের পার্থক্য কোথায় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া আছে। উপন্যাসের চার জাতীয় বিভাগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই চার জাতীয় বিভাগের মধ্যে কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস নতুন যুগের সম্পদ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এক-প্রকার বিশেষ রস আছে। ইতিহাস হতে উপাদান সংগ্রহ করে উপন্যাস লেখার প্রয়াস বাংলা উপন্যাসে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের রচনায় তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচেতনা তাঁদের ঐতিহাসিক রোমান্স রস সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমের প্রেরণা যুগিয়েছিল, একথা অকুণ্ঠিত-ভাবেই স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের তখন ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছে—দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮১)।

রমেশচন্দ্রেরও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার উৎস স্কট। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস-রস রমেশচন্দ্রকে কতখানি পুলকিত করেছিল তিনি তা নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর 'Literature of Bengal'[৮] গ্রন্থে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সচেতন সংস্কার রমেশচন্দ্রের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রমেশচন্দ্রের ৪ খানি রোমান্স-রস মিশ্রিত ঐতিহাসিক উপন্যাস আছে। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৭) ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)।

'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার দশবছরের মধ্যে অনেক লেখকই বঙ্কিম প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও সেই পথেই

সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমপর্বে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। (১) ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্সমূলভ আখ্যান (২) সমাজসমস্তামূলক বাস্তবজীবন আলেখ্য। এই পর্বের দুটি ধারায় সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়।

তথাপি সঞ্জীবচন্দ্রের পথ স্বতন্ত্র। তাঁর রচনায় উৎস বৈচিত্র্যময়। মধ্য-যুগীয় রোমান্স, লোকপ্রচলিত গল্প, রূপকথা, ব্রতকথা, রায় গুণাকরের বিদ্যা-সুন্দরের দূতীর ভূমিকা, আরব্য-পারস্য-রজনীর হারেমে গোপন প্রণয়ের লক্ষণগুলি তাঁর উপন্যাসে সম্পৃক্ত হয়। সমাজচিত্র অঙ্কনে পূর্ববর্তীকালে লেখকদের প্রভাব যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', তাঁর উপন্যাসে ছায়াপাত করেছিল।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা'-র শৈল-র চরিত্রের পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনীর চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'মাধবীলতা' উপন্যাসে রোমান্স ও অলৌকিক কার্যাবলী এবং 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসের ইতিহাসচেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেরই ছায়াপাত। তাছাড়া 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে 'শম্ভু' ডাকাতের 'মহাকুলীন' সম্প্রদায় গঠনের পিছনে 'আনন্দমঠে'র সন্তান সম্প্রদায়ের কথা স্মরণে আসে।[৯]

'কণ্ঠমালা'[১০] সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত প্রথম উপন্যাস। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কালের রচিত উপন্যাস—'মাধবীলতা'র[১১] পরিশিষ্ট।

কণ্ঠমালা

বাংলা কথাসাহিত্যে 'কণ্ঠমালা' একটি নতুন সুরের আমদানি করেছিল। ভ্রষ্টা নারীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে পরপুরুষাসক্তি ও স্বার্থপরতার কাহিনী নির্বাচনের অভিনবত্বে তা অনায়াসেই স্বতন্ত্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। গল্প বলার একটি নতুন রীতিতে তিনি তাঁর রচনায় স্বতন্ত্রপথের সন্ধান দিয়েছেন।

যৌথ পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে সঞ্জীবচন্দ্র নরনারীর হৃদয়জাত প্রণয়ের সঙ্গে সতীত্বকে সামাজিক প্রথার অধীনে দেখতে চেয়েছেন। নারীর স্বাতন্ত্র্য, প্রণয় ও সতীত্বকে আশ্রয় করে বঙ্কিমযুগের সমকালীন ঔপন্যাসিকবৃন্দ তাঁদের রচনার বিষয়ীভূত করেন। বিবাহোত্তর অন্য নায়কের সঙ্গে প্রণয়কে ইংরাজপ্রভাব[১২] প্রসূত কুফল বলে সেই যুগের রক্ষণশীল সমাজ মনে করতেন।

প্রণয়ের সঙ্গে সতীত্বের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। "বৈজ্ঞানিকরা সতীত্বকে মনের ভ্রম বলিয়া বুঝাইতে পারেন, দার্শনিকেরা সতীত্বকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের একমাত্র উজ্জ্বল মণি। সতীত্বের বৃদ্ধিতে সে সমাজের সুখবৃদ্ধি হয় তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি এই প্রণয় হইতে এই সঙ্গীতটুকু বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে পশুভাব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"[১৩]

স্ত্রী ও পুরুষের সতীত্ব ও সংযমকে আশ্রয় করে সেই কালের চারিত্রনীতি ও সমাজ এবং ধর্মনীতি অনুসৃত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা' উপন্যাস নারীর প্রণয় ও সতীত্বের বিষয়কে আশ্রয় করে তৎকালীন সামাজিক বিধিনির্দেশকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

'কণ্ঠমালা'-র মূল বিষয় একটি ভ্রষ্ট চরিত্রের অধঃপতন ও প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। জীবনের খলপনা, চাতুরী ও হীনমন্যতার চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। উনিশ শতকের সামাজিক জীবনে নারী-স্বাতন্ত্র্যের যে ঢেউ উঠেছিল, তা বাঙালীর পারিবারিক জীবনকে স্পর্শ করেছিল। সঞ্জীবচন্দ্র 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে বাঙালী নারীর প্রেম-প্রতিহিংসাপরায়ণতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'শৈল' নামে একটি বিবাহিত মেয়ে এই উপন্যাসের মূল চরিত্র। শৈলর পরিণতি চিত্রণে তৎকালীন সামাজিক রীতি ও নীতি লেখকের মনকে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুতঃ আত্মনিগ্রহ ও নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কুলটা শৈলর প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। শৈলর আত্মহত্যা মনে হয় তৎকালীন সমাজ অনুমোদিত কারণ। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রগুলির সংযোগ সাধিত হয়েছে। শৈল রাজা মহেশচন্দ্রের কন্যা। আবার, মহেশচন্দ্র ছদ্মবেশী শম্ভু ডাকাত। মাধবীলতা শম্ভুর আশ্রিতা। মাধবীলতার মা জ্যোৎস্নাবতী, রাজা ইন্দ্রভূপ, পিতম পাগল ও মাতঙ্গিনীকে দেখা যায়। শৈলর স্বামী বিনোদ সকলের প্রীতির পাত্র। অপরদিকে প্রতিবেশী বিলাস। যার সঙ্গে শৈল অবৈধ জীবনযাপন করে। শৈল একদিকে নিজের স্বভাবদোষে নিজের শোচনীয় মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছিল—অন্যদিকে প্রতিবেশীদের ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা, লোলুপতার জন্যই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা দারুণ কষ্টভোগ করেছে। ঘটনাসংস্থানে নানা অসম্ভাব্যতার ছড়াছড়ি। বিনোদকে মাটিতে প্রোথিত করবার পূর্বে দীর্ঘাকার পুরুষের আবির্ভাব, বিলাসের ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে শৈলর আগমন, বৈরিণী শৈলকে শম্ভুর নির্দেশে ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে বন্ধ

করে রাখা, ভিখারী ও ভিখারিনী বেশে পিতম ও জ্যোৎস্নাবতীর অসুস্থ মাধবীর রোগমুক্তির ঔষধদান প্রভৃতি ঘটনার উপস্থাপনে লেখক পাঠককে রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে দেন। আবার পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত, গুপ্ত গৃহনির্মাণ, শত্রুর জেলে যাতায়াতের পরিকল্পনা প্রভৃতি কল্পনায় লেখকের রোমান্সসুলভ মনোভাব লক্ষিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে যে রোমান্সসুলভ অসম্ভাব্যতা, ঘটনা সংস্থানে আকস্মিকতা, নারীর সতীত্ব ও প্রণয়ের সততার বিষয় লক্ষ্য করা যায়, তা বঙ্কিম যুগেরই বৈশিষ্ট্য।

'কণ্ঠমালা' চরিত্রসৃষ্টিতে ও ঘটনাসংস্থানে রূপকথা জাতীয় মনে হলেও উপন্যাসের লক্ষ্য মানুষ, মানুষের প্রেম ও সততা। তাই অনিবার্যভাবেই এই আখ্যানের কাহিনী মানুষের হৃদয়ের খোঁজে এগিয়ে চলেছে। মহৎ প্রাণের অভাব নেই যেমন, আবার অসৎ মানুষও বিবেক দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। 'কণ্ঠমালার'র নায়ক-নায়িকারা সরল স্বভাবপূর্ণ। উপন্যাসের দেহ-সজ্জা সুগঠিত না হলেও, লেখক তাঁর কাহিনীর মধ্য দিয়ে মানুষের মর্মলোকেই আলোকপাত ঘটিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতো সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা'য় মানুষের ভেতরকে চেনার জন্য চিঠিকে কাজে লাগানো, রোমান্স, অতিলৌকিকতার স্পর্শ, ডাকাতির ব্যাপার, মহাপুরুষের প্রভাব উপন্যাসের পরিণতিবিধানে কার্যকর হয়েছে। নাটকের এত ঘটনার তরঙ্গ ও সংলাপের ভাবাবেগের চিত্র, মানুষের গোপন অনুভূতি ও চিন্তা আত্মপ্রকাশ করেছে।

দুই

'কণ্ঠমালা'র কাহিনী বা প্লট ৩৭টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। বিন্যাসের পিছনে মোটামুটি একটি পরিকল্পনা কাজ করেছে। নাটক যেমন অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত থাকে তেমনি কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষ্য রেখে পরিচ্ছেদগুলি ভাগ করা হয়েছে। পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে অগ্রগতি নাটকের মতই কৌতূহলোদ্দীপক।

প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় যে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের একটি সুখনীড়ের আশ্চর্য চিত্র। শৈল চরিত্রটি উজ্জ্বল। নাপিতানী চরিত্রটি যুগোপযোগী। বিনোদ দরিদ্র হলেও বিনোদের ভালবাসায় দারিদ্র ছিল না। বিনোদ যেন ভালবাসার প্রতিমূর্তি। শৈলকে আলতা পরানোর মধ্য দিয়ে সতী নারীর পূর্বাভাস প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিনোদের চরিত্রে সরলতা, মাধুর্য ও অকপটতা ও শিশুর প্রতি প্রেম গভীর প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত। কিন্তু বিনোদের স্ত্রীর হীনমন্যতা অনায়াস লক্ষণীয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিবেশী গোপালের শিশুপুত্রের 'কণ্ঠমালা' চুরির ব্যাপারে বিনোদের বাড়ী তল্লাসি নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ। শৈলর বাক্স থেকেই কণ্ঠমালা পাওয়া গেলে বিনোদ নিজে চুরি করেছে বলে স্বীকার করলে বিনোদের একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই 'কণ্ঠমালা'ই উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায়—জেলখানায় শম্ভু ডাকাত নামে এক কয়েদীর সঙ্গে বিনোদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। জেলখানায় শম্ভু ডাকাত তাকে ঘানি টানায় সাহায্য করলে জেল-দারোগা তাকে বেত্রাঘাত করে। খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে শম্ভু কয়েদী তাকে শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করা যয়ে যে, যে রাত্রে বিনোদ জেলখানায় বেত্রাঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সেই রাত্রে গোপালের ছেলেমেয়েরা বিনোদের জন্য কান্নাকাটি করে। বিনোদের প্রতি এই অদৃশ্য টান লেখকের অনু-চিন্তারই কার্যকারণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা গেল—বিনোদ জেলখানার বেত্রাঘাতে মরণাপন্ন হলে জেলখানা থেকে মুক্তি পায়। বিনোদ ও শম্ভু ডাকাতের কথাবার্তায় অনুমান করা যায়—শৈলর কারণেই বিনোদকে কয়েদী হতে হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিনোদ স্ত্রীর কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল। শৈলর স্বপ্নে বিভোর হয়ে গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরে কোনমতে পৌঁছায় এবং খিড়কির দ্বার দিয়ে শয়ন ঘরের নিকট পড়ে যায়। তারপরের চিত্র—আরোও করুণ। শৈল তখন অবৈধ প্রণয়ী বিলাসের সঙ্গে মত্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদে শৈলর নির্দেশে বিলাস কর্তৃক বিনোদ নিগৃহীত এবং তাকে কবরস্থ করবার সময়ে হঠাৎ শম্ভুর আগমনে ও হস্তক্ষেপে উপন্যাসের গতিপ্রকৃতির মোড় ঘুরে গেল। শৈলর স্থান হ'ল পাষাণ কক্ষে। বিনোদ শম্ভুর সহায়তায় সুস্থ হয়।

নবম পরিচ্ছেদে শম্ভু ডাকাতের কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে। রামদাস সন্ন্যাসী ও মোহান্তর সঙ্গে কথোপকথনে শম্ভু ডাকাতের মহত্তর পরিচয় পাওয়া

যায়। শম্ভু ডাকাতই আসলে ছদ্মবেশী মহারাজ মহেশচন্দ্র। শম্ভুর নির্দেশ মত বিনোদকে ভুবনপুরে মহারাজের বৈঠকখানায় রাখা ও চিকিৎসা করা হয়।

দশম পরিচ্ছেদে শম্ভু কয়েদীর আচরণে জেল-দারোগার সন্দেহ হয়। শম্ভুর ও জেলদারোগার সঙ্গে সম্প্রীতি জন্মে। দারোগার মাসিক দুইশত টাকা আর্থিক ব্যবস্থায় সে প্রতিরাত্রে মুক্তি পায়।

একাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় শম্ভুর আদেশে রামদাস কর্তৃক শৈলকে অন্ধকার পাষাণ কক্ষে রাখা হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় নির্জন পাষাণ কক্ষে শৈল অস্বস্তির মধ্যে পাপের শাস্তি ভোগ করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বিলাসবাবুর মনোবিকলনের প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে গোপালবাবুর বাড়িতে বিলাসের গ্রেপ্তারের কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। শৈলর মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিনোদের মনোযন্ত্রণা পাঁচখানি পত্রের দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিনোদের মনে হয়েছে—"সংসার অকারণ, পৃথিবী অকারণ, সৃষ্টিই অকারণ।" লেখকের বর্ণনায় বিনোদের অকৃত্রিম প্রণয়জনিত সূক্ষ্ম তন্ত্রীর সুর অনুরণিত হয়েছে। ষোড়শ পরিচ্ছেদে বিনোদের প্রকৃতি ও সঙ্গীত প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে মহারাজ মহেশচন্দ্রের বাড়িতে সঙ্গীগণের সঙ্গে আলাপ এবং গায়িকার কাছ থেকে মহারাজের সবিশেষ সূত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে যুবতী গায়িকার-প্রতি বিনোদের শ্রদ্ধা ও সমীহ প্রকাশ পেয়েছে। বিনোদের অবচেতন মন অপরিচিতা গায়িকার প্রতি আকৃষ্ট। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে যুবতীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বিনোদ জানতে পারে যে শৈল মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা। রাঘবরায়ের পালিতা কন্যা। বিংশ পরিচ্ছেদে মোহান্তকে লেখা শম্ভু কয়েদীর চিঠিতে 'মহাকুলীন' সম্প্রদায় পরিকল্পনার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। রামদাস ও মোহান্ত শম্ভুর দুটি হস্তস্বরূপ। একবিংশ পরিচ্ছেদে শম্ভু ডাকাতের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার ও সেই সূত্রে তাঁর হাজতবাসের কাহিনী ও কারণ বর্ণিত হয়েছে। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে শম্ভু কয়েদী মরেনি, জেলখানা থেকে পালিয়েছে। ফলে জেল-দারোগার পদচ্যুতি। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে সাহেবের পদচ্যুতির সংবাদে শম্ভু ডাকাতের এক লক্ষ টাকা প্রেরণ ও জেলদারোগা সাহেবের প্রতিক্রিয়া। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসী রামদাস মাধবীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে বিবাহ করার

ইচ্ছা প্রকাশ করে। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে পাষাণকক্ষে আত্মশাসনের মধ্য দিয়ে শৈল পাপের শাস্তি ভোগ করে আত্মশুদ্ধি ঘটায়। ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে শৈলর নিঃসঙ্গ জীবনে মাধবীর সাহচর্য। শৈলর অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব অনায়াস লক্ষণীয়। শৈলর ও মাধবীর মিলন করুণাত্মক। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে শৈল ও মাধবীর কথাবার্তার মধ্যে পরস্পরের অনুভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। স্মৃতি-বিজড়িত সুরপুর গ্রামের নিখুঁত চিত্র উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে ধরা পড়েছে। অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদে মাধবীর কাছ থেকে শৈল জানতে পারে—বিনোদ জীবিত। ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করা যাবে যে কামনা জর্জরিত সন্ন্যাসী রামদাস মাধবীকে পাওয়ার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত ও শূলাগ্র মাধবীর বুকে স্থাপন করে। সঙ্গীতের মধ্যে মাধবী নিজেকে ভুলিয়ে রাখে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদে পাষাণ কক্ষে রামদাস সন্ন্যাসীর বন্দীজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মনিগ্রহ। একত্রিংশ পরিচ্ছেদটি নাটকীয় ঘাত-সংঘাতে পূর্ণ। বিলাসবাবুর বিচারের চিত্র। শৈল ও বিনোদের আকস্মিক আগমনে বিচারের রায় বদলে যায়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে—মানসিক যন্ত্রণায় শৈল পাগল হয়ে যায়। ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদে শৈল পাগল হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। প্রকৃতি তার সহায়ক। চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়েই শৈলর মৃত্যুদৃশ্যটি অতিশয় করুণ। এই পরিচ্ছেদে মাধবী ও বিনোদের বিবাহ প্রসঙ্গ আছে। ফলে মাধবীর মানসিক সংঘাতের চিত্রটি বাস্তবোচিত।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে বিবাহের ইচ্ছা ও মহারাজের প্রতি রামদাসের হীন চক্রান্ত ও রামদাসকে মাতঙ্গিনী দ্বারা শাস্তিদানের দৃশ্যটি বর্ণিত হয়েছে। ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদে মাধবীর চিকিৎসার জন্য ভিখারিনীর আবির্ভাব ঘটেছে। এদের মধ্যে একজন পিতম পাগল। এই দুজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা মাতঙ্গিনীর পরিচিত। সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদে মাধবীর সঙ্গে বিনোদের বিবাহের দৃশ্য অঙ্কিত করা হয়েছে।

তিন

কণ্ঠমালার প্লট গঠন বিশ্লেষণ করলে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়:

কাহিনীর আরম্ভ ভারাক্রান্ত নয়। চমৎকার একটি ছোট পরিবারের চিত্র প্রথম পরিচ্ছেদেই লক্ষ্য করা যায়। শৈলর ও নাপিতানীর আলাপকে আশ্রয় করে লেখক শৈলর রূপটি বর্ণনায় সংযত শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন।

নাপিতানী আলতা পরাতে পরাতে বলে—"পা দুখানি যেন ননীতে গড়া, চাঁপাফুলের বর্ণ, তাতে আলতার সঙ্গে কত শোভা হয়। ইচ্ছা করে, তুমি দুগাছি হীরাকাটা নুতন মল পর ; আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি।"

সুন্দরী (শৈল) অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা আর এজন্মে হয়েছে, নিত্য যে অন্ন পাই, এই যথেষ্ট, আর হীরাকাটা মল কোথায় পাব ?

শৈলর সংলাপে বিনোদের সংসারের দারিদ্র্যের ছবি যেমন লেখক চিত্রিত করেছেন, তেমনি হীরাকাটা মল পরার সাধের কথাও বলা হয়েছে।

শৈলর গহনার প্রতি লোভ বরাবরই ছিল, তারই ইঙ্গিতে লেখক কাহিনীর আরম্ভেই দিয়েছিলেন। কিন্তু পাত্র-পাত্রীর মানসিক রূপ বিশ্লেষণে লেখক সজাগ ছিলেন বলে মনে হয় না।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক শৈল ও বিনোদের দাম্পত্য জীবনের প্রেম-স্নেহ সুধামাখা বাসগৃহের আদর্শরূপ চিত্রণ করেছে। কিন্তু পাত্র-পাত্রীর মানসিক বিশ্লেষণ ব্যাপারটি উপেক্ষিত প্রায়। মানসিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। ফলে বিনোদের ভালবাসার প্রাচুর্য থাকা সত্বেও তাদের দাম্পত্যজীবন মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল না। একটি ঘটনার স্রোতে উপন্যাসের উপাদানগুলি প্লটে জট বাঁধতে না বাঁধতে ভেসে গেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঘটনাতরঙ্গের আকস্মিক উৎক্ষেপ লক্ষণীয়। গোপালবাবুর ছেলের 'কণ্ঠমালা' চুরির ব্যাপারে বিনোদের ঘর তল্লাসী। শৈলর বাক্সে কণ্ঠমালা পাওয়ার মধ্যে তাঁর গহনার প্রতি লোভ নারীসুলভ আকাঙ্ক্ষার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। শৈলর প্রতি বিনোদের ভালবাসার গভীরতা ছিল বলেই সে নিজে থেকে জেলখানায় কয়েদী জীবন কাটাতে লাগল। বিনোদ চরিত্রের সহানুভূতিশীল মনটি সমগ্র উপন্যাসে সঞ্চারিত।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ডাকাত চরিত্রের অবতারণায় লেখকের গঠন বিশিষ্টতার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানধারণাজাত। কাহিনী বা প্লটের বিন্যাসে এই ডাকাত চরিত্রের বিশেষ ভূমিকা স্বতঃসিদ্ধ। জেলখানাতেই শম্ভু কয়েদীর সঙ্গে বিনোদের পরিচয়, আলাপ এবং তারই সাহায্যে মুক্তিলাভ। উপন্যাসের শেষপর্যন্ত এই শম্ভু ডাকাতই সমস্ত উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেছে।

সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বিনোদের শৈলর প্রতি পবিত্র প্রেমাকর্ষণ ও আকুলতা বিনোদকে দুর্নিবার করেছে। প্রেমিক

বিনোদের শৈলকে স্বপ্নে দর্শন গুরুত্ব পেয়েছে। শৈলর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনন্ত প্রেম বিনোদের চরিত্রকে অপূর্বতা দান করেছে। কোনপ্রকারে টেনে টেনে বাড়ী এসে দেখল তার স্ত্রী প্রণয়ী বিলাসের সঙ্গে পাপাসক্ত। শৈলর ইঙ্গিতে বিনোদ বিলাস কর্তৃক নিগৃহীত হল। শুধু তাই নয়—মৃত ভেবে তাকে কবরস্থ করার আয়োজন করা হয় শৈলর নির্দেশে। হঠাৎ শম্ভু ডাকাত আসায় সে এ যাত্রায় রক্ষা পায়।

বিলাসের সঙ্গে শৈলর অবৈধ প্রণয়, কিংবা প্রণয়ী বিলাসের সাহায্যে স্বামীকে জীবন্ত কবরস্থ করার চেষ্টা তাঁর পূর্ব ও পরবর্তী আচরণের আকস্মিক পরিবর্তন সঙ্গতিহীন। ফলে উপন্যাসের জটিলতা সংসক্তি হারিয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সঙ্গে সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদের শৈলর আচরণের ও স্বভাবের বৈসাদৃশ্য অবশ্যস্বীকার্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদে ভীমাকৃতি পুরুষের আবির্ভাব যেমন নাটকীয়, তেমনি অলৌকিক ঘটনা। শৈলর সঙ্গে পাঠকও মন্ত্রমুগ্ধ। শৈলর অন্ধ অসংযম প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির জন্যে যেন দীর্ঘাকার পুরুষের আবির্ভাব। পাঠক তখনও পর্যন্ত জানেন না যে আসলে এই দীর্ঘাকার পুরুষ শৈলর পিতা; মহারাজ মহেশচন্দ্র ওরফে শম্ভু ডাকাত। শম্ভুর ডাকে শৈল শিউরে উঠে। শৈল ভাবে—'এ স্বর অপরিচিত নয়।' এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও শৈল মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথায় চলে।

নবম পরিচ্ছেদ থেকেই শম্ভু এই উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে। রামদাস ও মোহান্ত তার সহায়ক। শম্ভুর একটি নিজস্ব রাজত্ব আছে। তার শাসনব্যবস্থা আছে, পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে। মোহান্তের সঙ্গে কথাবার্তায় জানা যায় সে পশ্চিমদেশ হতে বাঙ্গলায় আসে। কথাবার্তায় আরো পরিস্ফুট হয়েছে যে তার দ্বারাই দীনদুঃখী গৃহনির্মাণ ও যথাসময়ে মেয়েদের বিবাহ নিমিত্ত বাৎসরিক টাকা বরাদ্দ করা হতো। লেখক তার কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রটির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে শিল্পের দিক থেকে মৃত্যু ঘটেছে।

দশম পরিচ্ছেদে লেখক ডাকাতির উদ্দেশ্যে শম্ভুর মুখ দিয়েই ব্যক্ত করেছেন জেলদারোগার কাছে। শম্ভু কয়েদীর আচরণে আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ইংরাজ জেল-দারোগাকে আকর্ষণ করে। ডাকাতি আর যুদ্ধ করা—শম্ভুর কাছে সম-তাৎপর্যপূর্ণ। শম্ভুর মুখ দিয়েই তা প্রকাশ হয়েছে—'আমরা যুদ্ধে যাই না,

কিন্তু আমাদের সে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ডাকাতি করিয়া সে বীরপ্রবৃত্তির কতক ক্ষমতা করি, আমরা দশ হাজার ফৌজ লইয়া কেল্লা লুটিতে যাই না দশজন কি পনেরজন একত্রে যাই এবং পনের জনের উপযুক্ত কেল্লা দখল করি। কিন্তু দশজনে গৃহস্থের ঘরই আক্রমণ করা যায়, কিংবা দশজনে কেল্লাই আক্রমণ করা যাক্, সাহসীর সুখ উভয়স্থলেই সমান।

একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লেখক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য শৈলকে ভূগর্ভস্থ পাষাণ পিঞ্জরে বন্দী রাখার পরিকল্পনা করেন। শৈলর রাগ, ভয়, ঘৃণা, সংস্কার, অজানিত পাপবোধ তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তার যত রাগ একটি টিক্‌টিকির উপর গিয়ে পড়ে—সেই প্রাণিটিকে পদতলে দলিত করে বলে—"কেমন, এখন ইচ্ছামত যাতায়াত কর। আমি কয়েদী, আর সামান্য টিক্‌টিকি স্বাধীন। ইচ্ছামত এই ঘরে যাতায়াত করে। এই ঘরে আমাকে আবদ্ধ করিল, কিন্তু এই পোড়া ক্ষুদ্র জন্তুকে কয়েদ করিতে পারিল না। যত যন্ত্রণা আমারই জন্য ছিল।" —শৈলর সব হারানোর শূন্যতাবোধ তীব্রাকার ধারণ করেছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনীর কথা মনে পড়ে, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হয়েছে—"যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল।"—অসতী নারীর নরকভোগে অজানিত বিশ্বাস তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরো অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। কিন্তু শৈলর চরিত্রে তা অনুপস্থিত।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বিলাস চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক নীতিবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সমাজসংস্কারজাত পাপবোধ বিলাসের অবচেতন মনে নিহিত,—সেই অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভ্রান্তি ও স্বপ্নে। আলোচ্য দুটি পরিচ্ছেদে বিলাসের নিদ্রা ও স্বপ্নে নরকদর্শনের যে চিত্র অঙ্কণ করা হয়েছে তা উদ্দেশ্যমূলক। সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে 'ভ্রান্তি দর্শনে'র পরিচয় পাওয়া যায়।' এই ভ্রান্তিদর্শন ভারসাম্যহানির ফলে ঘটে। বিলাস ভারসাম্য হারিয়েছিল সমাজসংস্কারজাত পাপবোধে। কিন্তু লেখক মানবচরিত্রের রহস্য উন্মোচন ও আভ্যন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা নীতিবোধকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বিলাসের অপরাধপ্রবণ মনের দ্বন্দ্ব যতখানি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার চরিত্রের বর্ণনায় উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকে শ্লথ করেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কয়েকটি চিঠির মাধ্যমে বিনোদের মনোযন্ত্রণা সার্থক হয়ে উঠেছে ফলে শিল্পচিত্তের বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠিগুলির মধ্যে

সঞ্জীবচন্দ্রের কবিসত্তা উদ্ভাসিত হয়েছে।

"ভাবিলাম, লতা স্ত্রীজাতি, তাহা না হইলে কাতরের প্রতি এত দয়া কেন? যাহারে সকলে ত্যাগ করিয়াছে, লতা তাহারে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে; লতা সেই অঙ্গারাবিষ্ট দেহ আপন পল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া আবার ফুলফলে শোভিত করিবে। দগ্ধ তরুকে শীতল করিবে, সতত কাছে থাকিবে, কেবল বাহুদ্বারা তাহাকে আপন হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবে।"

সঙ্গীত সঞ্জীবচন্দ্রের প্রিয় বস্তু। 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে সেই উপাদান কাহিনীতে (১৬শ পরিচ্ছেদ) সম্পৃক্ত হয়েছে। সঙ্গীত মাত্রই মানবহৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে ও নৈরাশ্যকে ভরিয়ে দেয়। মাধবীর কণ্ঠে

"আমি শ্যাম-সায়রে হংসী ছিলাম,
ডুবিতাম, উঠিতাম, ভেসে যেতাম,
কত উলটি পালটি ভেসে যেতাম।"

সঙ্গীত শুনেই বিনোদ তাঁর ব্যক্তিত্বের সিঁড়িটি খুঁজে পেয়েছিল। অপরিচিতা মাধবীর গান শুনে বিনোদ যেমন মুগ্ধ, পাষাণকক্ষে শৈলও তেমনি তার গান শুনে শুভবোধে উদ্বুদ্ধ ও তৃপ্ত। সঞ্জীবচন্দ্র সঙ্গীতকে কাজে লাগিয়েছেন পাত্রপাত্রীর হৃদয়-সংযোগের মাত্রা হিসাবে। মাধবীর সঙ্গীতসুধা বিনোদ শৈলের জীবনে ভাব সঞ্চারণের যোগসূত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ পরিচ্ছেদে মাধবীর আবির্ভাব রীতিমত নাটকীয় উপকাহিনী গুণে তাৎপর্যমণ্ডিত এবং মূল বিষয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিনোদ ও শৈলর কাহিনীর পরিপূরক হিসাবে মাধবীর চরিত্রটির দায়িত্ব অনস্বীকার্য। মাধবী চরিত্র সংহত ও যথাযথ। নেপথ্যচারিণী হিসেবে তার কার্যকলাপ মূল কাহিনীকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে। মহারাজ মহারানীর সম্যক বৃত্তান্ত মাধবীর থেকেই বিনোদ জানতে পারে। মহারানীর বিবাগিনী হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে চলে যাওয়ার কাহিনীর সঙ্গে শৈলর জীবনের যোগাযোগ ঘটানো হয়েছে। মহারাজ-মহারানীর ঔরসজাত কন্যা শৈল—এই আখ্যানে বিনোদকে বলতে গিয়ে পাঠককে জানানো হয়ে গেছে। মাধবী সামাজিক কাহিনীর নায়িকা হতে গিয়ে রোমান্সের নায়িকা হয়েছে। লেখক অপরিচিতা মাধবীর পরিচয় গোপন রেখে পাঠকের কৌতূহল বেশী সন্ধান করেছেন। মহারাজের সঙ্গে শৈলর যে রক্তের সম্পর্ক তা পাঠকের হৃদয়বীণায় ঝঙ্কার তোলেনি, এসব নেহাত ঘটনাজাত সংযোগ। যোগাযোগের মধ্যে

যথার্থ কোন সংহতি ছিল বলে মনে হয় না।

তাছাড়া, আলোচ্য পরিচ্ছেদগুলোতে মাধবী বিনোদ কাহিনীটি শুধুমাত্র মানবিক গল্পরসে বদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে রোমান্স-সুলভও। মাধবীর রূপে বিনোদের বিমুগ্ধচিত্ততা অনায়াস লক্ষণীয়। সঞ্জীবচন্দ্র তার আভাসও দিয়েছেন।

বিনোদ বলে—"তোমার অঙ্গের কি আশ্চর্য সদ্‌গন্ধ?"

মোহান্তকে লেখা শম্ভু কয়েদীর চিঠিতে 'মহাকুলীন' গঠন পরিকল্পনার বিষয়টি বিংশ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়। সন্ন্যাসী-মহাপুরুষ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক কাহিনীর মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত উপাদান আরোপিত করেছেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন পরোপকারী, ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বার্থপরতাশূন্য পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত কুলীন ব্যক্তিগণ। পূর্বেকার পরিচ্ছেদে দেখা গেছে ডাকাতি এই উপন্যাসের একটি মুখ্য বিষয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে 'মহাকুলীন সম্প্রদায়, গঠনের ইচ্ছার মধ্যে 'আনন্দমঠের' সন্তানসম্প্রদায়ের সাদৃশ্য প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য। 'আনন্দমঠে' সন্তানসম্প্রদায়ের বিপ্লব প্রয়াস দেশবিস্তৃত। প্রধান চরিত্র সত্যানন্দের নেতৃত্বে সন্তানদলের উদ্দেশ্য ও দেশের দুর্দশার কথা সত্যানন্দ স্বয়ং মহেন্দ্রকে বুঝিয়ে বলেছেন। কিন্তু 'কণ্ঠমালায়' সন্তানসম্প্রদায়ের কার্যাবলীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই মহাকুলীন সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি শম্ভু ডাকাতবেশী রাজা মহেশচন্দ্র। মহেশচন্দ্রের সঙ্গে আছেন ব্রহ্মচারীবেশী মাতঙ্গিনী, মোহান্ত ও রামদাস সন্ন্যাসী। মাধবীর প্রতি রামদাসের আসক্তি ও তার পতনের পরিমাপ কাহিনীটি অসংবৃত করেছে। অথচ আনন্দমঠের সন্তানদলে ভবানন্দের স্খলন ও তার অনুশোচনার মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আত্মদানের মধ্যে ভবানন্দ সন্তান সেনারূপে তাঁর মহত্ত্ব রেখে গেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদে শম্ভু কয়েদীর জেলখানা থেকে পালানোর সূত্র ধরেই আসল পরিচয় জ্ঞাত করানো হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারী ও কুপরামর্শদাতা হিসাবে লেখক রামদাসকে দেখিয়েছেন। রামদাস ব্যক্তিগত জীবনে মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে নিযুক্ত ছিলেন। রামদাসের পরামর্শে মহারানী গৃহত্যাগিনী হন ও একটি চটিতে তারই ষড়যন্ত্রে মহারানীকে আক্রান্ত করা হয়। মহারানী স্বয়ং তাকে চিনতে পারেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সেই রামদাসকে বাঁচাতে গিয়ে ব্রহ্মচারীবেশী মহেশচন্দ্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে শম্ভু ডাকাত নামে পরিচিতি লাভ করে। রামদাস তখন থেকেই রামদাস সন্ন্যাসী

হয়ে মোহান্তের অধীনে কাজ করে। এই ঘটনাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর কৌশলটি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অবাস্তব কল্পনামাত্র।

দ্বাবিংশ ও ত্রাবিংশ পরিচ্ছেদ দুটিতে সাহেব জেল-দারোগার শম্ভু কয়েদীর জেলখানা থেকে পালানোর কারণে পদচ্যুতির ঘটনা মামুলী ও অবিশ্বাস্য। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে মাধবী ও রামদাস সন্ন্যাসীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভেকধারী সন্ন্যাসী রামদাসের নারীলোলুপতার কদর্য দিকটি লেখক চিহ্নিত করেছেন। যাই হোক, অবশেষে রামদাসের সাহায্যেই মাধবী পাষাণকক্ষে বন্দিনী শৈলর সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ পেয়েছে। পঞ্চবিংশ থেকে উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে পাষাণকক্ষে শৈলর আত্ম-অবক্ষয়ের ঘোর মোহ থেকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়ে তোলা হয়েছে মাধবীর সান্নিধ্যে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদগুলিতে শৈলর প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্য অতীব করুণ। শম্ভু কয়েদীর গৃহান্তর্গত পাষাণকক্ষে বন্দী শৈলর আত্মযন্ত্রণার মধ্যে তার পাপের শাস্তি ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীর সঙ্গে শৈল চরিত্রের আচরণগত সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যাবে। শৈবলিনীর দ্বিচারিণীত্বের পাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য জীবন্ত অবস্থায় নরকভোগের চিত্র বঙ্কিম অঙ্কন করেছেন। কিন্তু শিল্পী বঙ্কিম শৈবলিনীর মনের দিকটা সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করে নরনারীর চিরন্তন সমস্যার কথাই উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে কুলটা হৃদয়হীনা করে রূপদান করেননি।

লেখক শৈলর তীব্র অনুশোচনার মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। ২৫ ও ২৬ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় যে, বিবেক দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার আত্মশুদ্ধি ঘটেছে। বিনোদের প্রতি হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। হঠাৎ মাধবীর গান শুনে তার নিঃসঙ্গতাবোধ দূরীভূত হয়, সে বেঁচে ওঠে—পৃথিবীতে বাঁচতে চায়।

শৈলর সঙ্গে মাধবীর মিলন ঘটনাটি মূলকাহিনীর সঙ্গে সর্বাধিক জড়িত। মাধবী শৈলকে চৈতন্যদান করেছে। মাধবীর সান্নিধ্য শৈলর কাছে প্রাণস্বরূপ। শৈল ভুল-ভ্রান্তি, ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ প্রতিটি দিক বুঝতে পেরেছিল মাধবীর সংস্পর্শে। আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে সে তার ভ্রান্তির কারণ খুঁজে পায়। প্রায়শ্চিত্তের পর সে বিনোদকে পাবার জন্য পাগল হয়ে যায়। লেখক শৈলর পরিণতি চিত্রণে তৎকালীন সামাজিক অনুশাসনকেই গ্রহণ করেছিলেন।

মাধবীর চরিত্র অঙ্কনে লেখকের প্রথম থেকেই পক্ষপাতিত্ব ছিল। তার আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একটি মধুর ও কৌতুকোজ্জ্বল ভাব লক্ষিত হত যা স্বভাবসিদ্ধ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে রামদাসের ধর্মচ্যুতির ও নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে ধর্মকে আশ্রয় করে সেই মহাকুলীন সম্প্রদায় বা সন্ন্যাসীরা আত্মশক্তিক্ষয় করে মানুষকে বঞ্চিত ও নারীর সতীত্ব অপহরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করত না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কল্যাণীর প্রতি ভবানন্দের হৃদয় ব্যাকুলতা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু রামদাস সন্ন্যাসীর নিষ্ঠুরতা খুবই ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে শূলাগ্র দিয়ে মাধবীর বুকে বিঁধে দেওয়া ঘটনাটি সভ্যসমাজের চিন্তার বহির্ভূত। এই জাতীয় চরিত্র চিত্রণে লেখক মনস্তাত্ত্বিক শিল্পরীতির পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয় না। রামদাসের নারীলোলুপতা ছাড়া তার মাধবীর প্রতি প্রেমের বিন্দুমাত্র লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদে পাষাণকক্ষে রামদাস বন্দী হল—পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। শৈলর পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়েছে। তাকে সুরপুর গ্রামের কাছাকাছি বৃন্দানদীর তীরে একটি কুটিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সঙ্গে মাধবী। এই সুরপুরে রাখার পিছনে লেখকের পরিকল্পনা কাজ করেছে।

রামদাসের আত্মনিগ্রহের মধ্যে তার অতীতের জীবন ফ্ল্যাশবাকে অঙ্কন করেছেন লেখক। মহেশচন্দ্রের রাজ্ঞীর মৃত্যুর হেতু রামদাস স্বয়ং। বন্দী অবস্থায় মানসিক যন্ত্রণায় নরক দর্শনে মৃত রানীকে দেখতে পায়। নিজের স্বভাবদোষে কি অনিষ্ট ঘটে, তা দেখাবার জন্যই লেখক পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তিদানের বিধি নির্দেশ করেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদে বিলাসের বিচারের ফলাফল বিবৃত হয়েছে। কিন্তু লেখক যেন বিচারকের আসনে বসে বিলাসের ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দেন নি। শৈলকে দিয়ে বিনোদকে খুনের কথা স্বীকার করিয়ে নিয়ে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। বর্তমান পরিচ্ছেদে শৈলর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমন নাটকীয় অথচ নাটকের মত সঙ্ঘাতপূর্ণ নয়। এই ঘটনা মূল কাহিনীর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে নি। আরো অসম্ভাব্যতার লক্ষণ বিনোদের নাটকীয় আবির্ভাব।

'মিথ্যা কথা। আমি হত হই নাই, আমি এই জীবিত রহিয়াছি' বলিয়াই আর এক ব্যক্তি জজসাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—গ্রামবাসীরা চিনিতে পারিয়া, একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমাদের বিনোদ।"

আগন্তক ব্যক্তির নাম-ধাম-পরিচয় লইয়া জজসাহেব মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন।"

শৈল এতদিন পরে তার স্বামীকে (বিনোদ) চিনতে পারল—"দেবতারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মান।"

দ্বাবিংশ ও ত্রয়বিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে শৈল কঠিন মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি না পেয়ে সে পাগল হয়ে যায়। স্বামীকে পাবার আশায় সে ব্যাকুল হয়। কিন্তু লেখক উপন্যাসের শেষরক্ষা করলেন না—স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার কোন লক্ষণ বিনোদের চরিত্রে পরিস্ফুট হল না। শেষ পর্যন্ত শৈল আত্মহত্যা করে।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে শৈলর মৃত্যুতে মাধবীর মানসিক বিপর্যয়ের বর্ণনাটি শিল্পীর গভীর জীবনদর্শন আকৃষ্ট করে। আবার শৈলকে হারিয়ে শম্ভু ডাকাতের ব্যক্তিগত ধ্যানধারনা ও জন্মমৃত্যুবোধ চরিত্রের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। ধনদৌলতের প্রতি তার বৈরাগ্য, গৃহ, রাজ্যশাসনের উপর অনীহা মহাকুলীন সম্প্রদায়ের আদর্শবাদের আবরণ ভেঙে আত্মপ্রকাশ করেছে। মোহান্তের সঙ্গে শম্ভুর আলাপ-আলোচনার মধ্যে তার ব্যক্তি হৃদয়ের দ্বন্দ্ব অনুভব করা যায়। কিন্তু শম্ভুর বা মহেশচন্দ্রের স্বাধীন রাজ্য অনেকটা কাল্পনিক ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে ভবানী পাঠকের কল্পনার রাজ্যের মত। বাস্তব সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মতই সেই ইংরাজবিরোধী জাতীয়তাবাদের চেতনাকে উপন্যাসের বিষয় করেছেন।

শৈলর মৃত্যুর পর মাতঙ্গিনীকে মাধবীর কাছে পাঠিয়ে ও বিনোদের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাব কতখানি বাস্তবিক, তা চিন্তার বিষয়। মাতঙ্গিনীও তাই ভাবে—

"মহারাজের নিকট মৃত্যু আর বিবাহ তুল্য কথা। এই শোকের সময় বিবাহের কথা কিরূপে মহারাজের অন্তঃকরণে আসিয়াছে? আশ্চর্য অন্তঃকরণ। কেবল, পাথর। তাই বুঝি কন্যার নাম শৈলকুমারী হইয়াছিল?"

মাধবীর প্রতি বিনোদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে ভালোবাসার উদ্ভব। মাধবী ও বিনোদের বিবাহের পরিকল্পনাটি এই মুহূর্তে কতখানি রুচিসম্মত, তা বিচার্য, যদিও মাধবীর কর্তব্যবোধ ও বিনোদের সঙ্গে

বিনম্র আচরণে তার মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্রটি মহিমা দান করেছে। তার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে অসুস্থতাবোধ, তা বাস্তবোচিত। বিনোদ ও মাতঙ্গিনীর সংলাপে যে অন্তরঙ্গতা পরিস্ফুট হয়েছে তা সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানবজীবনের প্রতি লেখকের অপরিসীম সহানুভূতি ছিল বলেই তিনি মাধবী ও বিনোদের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে লেখক রামদাসের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও দুরভিসন্ধির কাহিনীর জাল বিস্তৃত করেছেন। মহারাজের আদেশে ভূগর্ভস্থ পাষাণকক্ষের সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সেই সুযোগে রামদাসও খালাস পায়। রামদাস খালাস পেয়ে কৌশলে মহারাজকে পাষাণকক্ষে বন্দী করে। তারপর, মাতঙ্গিনী এসে সন্ন্যাসীদের নিয়ে মহারাজকে উদ্ধার করে ও রামদাসকে শাস্তিদান করে। মহারাজের সঙ্গে রামদাসের বিরোধিতা ও খলতা উপন্যাসের গোড়া থেকেই দেখা যায়, কিন্তু বর্তমান পরিচ্ছেদে তার দুরভিসন্ধি তুঙ্গে উঠেছে। সেইজন্য তাকে ফলও পেতে হয়েছে কঠোর। 'ভিলেন' চরিত্ররূপে রামদাসের চরিত্র অঙ্কনে লেখক কৃতকার্য হয়েছেন, তবে মাতঙ্গিনীর রামদাসের ফন্দী থেকে মহারাজকে রক্ষার প্রসঙ্গ চমকপ্রদ কিন্তু অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত।

উপন্যাসের শেষ দুটি পরিচ্ছেদে (৩৬, ৩৭) একটি ভিখারী ও ভিখারিনীকে দেখা যায়। তারা মাধবীর সঙ্গে দেখা করে ও বিনোদকে বিয়ে করার জন্য উপদেশ দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মাতঙ্গিনী ও শম্ভুর উদ্যোগে মাধবী ও বিনোদের বিবাহ হয়। রাজা মহেশচন্দ্র যজ্ঞ করে মাধবীকে কন্যা হিসাবে গ্রহণের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপন্যাসের পরিণতিতে পিতম পাগল জ্যোৎস্নাবতীর কিছুক্ষণের জন্য ভিখারী ও ভিখারিনী বেশে আবির্ভাব একেবারে আকস্মিক। লেখকের হয়তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরূপকে দুর্বল করেছে। 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় সমালোচক যথার্থ বলেছেন —"কোন ধনবান ব্যক্তি অট্টালিকা নির্মাণ করিতে করিতে যদি সহসা দুরবস্থায় পতিত হন তবে সেই অট্টালিকার যে দুর্দশা ঘটে, তাহার সেই অসম্পূর্ণ অবস্থায় যেন-তেন-প্রকারেণ যেরূপ কুৎসিৎ আকারে তাহার পরিশেষ করা হয়, সেই অট্টালিকার প্রতি চাহিলে দর্শকদের যে প্রকার দুঃখবোধ হয়, কণ্ঠমালা পাঠেও আমাদিগের সেই প্রকার মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল।"[১০]

চার

লেখক কণ্ঠমালা উপন্যাসে ঘটনাসংস্থাপনে কৃতকার্য হন নি। নানা আকস্মিক ঘটনা এজন্য দায়ী। ঘটনার আতিশয্য উপন্যাসের আবহাওয়াকে উত্তেজিত করে তুলেছে। শৈলর নির্দেশে বিলাস কর্তৃক বিনোদকে ভূপ্রোথিত করবার পূর্বে দীর্ঘকায়পুরুষের ঘটনাটি অবাস্তবতার পর্যায়ভুক্ত।

বিলাসের ফাঁসির পূর্বকালে আকস্মিকভাবে শৈলর আবির্ভাব ঘটনা প্রস্তুতি-হীন বলে নেহাৎ ভাবালুতায় পর্যবসিত।

মাধবীর অসুস্থতাকালে পিতম ও জ্যোৎস্নাবতীর যথাক্রমে ভিখারী ও ভিখারিনী বেশে আবির্ভাবে ঘটনাটি নাটকীয়ভাবে তরঙ্গিত হলেও বস্তুধর্মী হয়ে ওঠে না।

ঘটনাবর্তে চরিত্রের প্রবেশ, অবস্থান ও উপস্থিতি নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র আদৌ চিন্তা করেননি। ঘটনার বহুলতা সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে নাট্যচমকিত উপভোগের বস্তু করে তুলবার চেষ্টার আগ্রহ ছিল না কিন্তু তা অবিশ্বাস্য। শম্ভু কয়েদীর আচরণ, তার শাসনব্যবস্থা, শাস্তিদানের বিধি, গুপ্তগৃহ নির্মাণ, জেলে যাতায়াতের পরিকল্পনা, শম্ভুর হস্তক্ষেপের ফলে বিনোদের রক্ষা ও শম্ভুর ইচ্ছানুযায়ী বিনোদের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে প্রভৃতি ঘটনাগুলির মধ্যে লেখকের কৌশল সূত্রযুক্ত নয়।

সমস্ত উপন্যাসের ঘটনা-নিয়ন্ত্রণে শম্ভুর অবদান অবশ্যস্বীকার্য, তবু মাধবী-বিনোদ ঘটনাবিন্যাসটি তাৎপর্যপূর্ণ।

লেখকের 'মহাকুলীন' সম্প্রদায় পরিকল্পনার ঘটনাটি ইতিহাস-আশ্রিত। এই ঘটনাটি মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি মাতঙ্গিনী কর্তৃক রামদাসকে শাস্তিদানের ব্যাপারটি ঘটনার কার্যকারণ সাপেক্ষ নয়। উদ্ভট কল্পনামাত্র।

শৈলর বাক্স থেকে গোপালবাবুর পুত্রের 'কণ্ঠমালা' বের হওয়া ঘটনাটি কাহিনীর মূলসূত্র। এই সূত্র ধরেই শৈলর অধঃপতনের কাহিনীটি উপকাহিনীর সঙ্গে মিশেছে। শৈল বিনোদ অপেক্ষা মাধবী-বিনোদ কাহিনী ঘটনাচক্রে নিঃসন্দেহে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শৈলর পাষাণকক্ষে আত্ম-অবক্ষয়ের ঘটনাটি অপরিহার্য নয়। বলা বাহুল্য, 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসে যেমন বাস্তবতার অভাব স্পষ্ট, তেমনি রোমান্সের অসম্ভাব্যতা লক্ষণীয়।

পাঁচ

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেন, তথাপি তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই বঙ্কিম-এর চরিত্রের মতো পূর্ণ বিকশিত হয়নি। 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে শৈলকে কেন্দ্র করেই অপরাপর চরিত্রের সংযোগ ও ঘটনার গ্রন্থন সংঘটিত হয়েছে। শৈল রাজা মহেশচন্দ্রের কন্যা। মহারাজের অন্তঃকরণ ছিল আশ্চর্য। ছদ্মবেশী শম্ভুকয়েদীই হল মহেশচন্দ্র। মাধবীলতা শম্ভুর আশ্রিতা। রামদাস সন্ন্যাসী ও মোহান্ত শম্ভুর চরিত্র বিকাশে সহায়ক।

বিনোদের ভালবাসা গভীর। শৈলর প্রতি তার ভালোবাসায় খাদ ছিল না, আর মাধবীর প্রতি তার বিশ্বাস অটুট ছিল। বিনোদ শিশুর মত সরল ছিল, পাড়ার শিশুরাও তাকে খুবই ভালবাসত, পাড়া প্রতিবেশীদের নিকট প্রিয়পাত্র ছিল। বিলাস ও গোপালবাবুরা তাকে সমীহ করত।

কেন্দ্রীয় চরিত্র শৈল। উপন্যাসের (১ম, ২য়, ৩য়, ৭ম, ৮ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৮শ, ১৯শ, ২৪শ, ২৫শ, ২৬শ, ২৭শ, ২৮শ, ২৯শ, ৩১শ, ৩২শ, ৩৩শ, ৩৪শ পরিচ্ছেদ) অর্ধেকের বেশী অংশ জুড়ে বিরাজ করছে। মূল চরিত্রের গুরুত্ব অনুযায়ী তার অবস্থান কালের ব্যাপ্তি গ্রথিত করেছেন। মূল চরিত্রের কার্য-কারণকে সবদিক থেকে বিকশিত করে তোলবার জন্য এবং অন্যান্য চরিত্রের কত বেশী প্রভাব বিস্তার করান যায়, তারই নিদর্শন হিসাবে শৈলর চরিত্রের গুরুত্ব। ভ্রষ্টা নারী চরিত্রের পরিস্ফুটনে সামাজিক অনুশাসনকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে লেখক শৈল চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সঙ্গত বিশ্লেষণে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। শৈলর পরপুরুষাসক্তি বা নৈতিক পতন ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে মৃত্যুবরণ তার চরিত্রের পূর্ব ও পরবর্তী কার্যকারণে সামঞ্জস্যহীন। শৈলকে এখন থেকে গুণবান স্বামীর প্রতি উদাসীন ও বিমুখ বলে মনে হত, তথাপি তার চারিত্রিক দুর্বলতার কোন লক্ষণ জানা যায়নি। বরং তার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল বলে মনে হয়। বিনোদ ও শৈলের কথাবার্তায় তার পরিচয় মেলে।[১৫] অথচ শৈলের গোপালবাবুর পুত্রের কণ্ঠমালা চুরি ও বিলাসের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় এবং বিলাসের সাহায্যে বিনোদকে জীবন্ত কবর দেবার চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে চরিত্রের স্বাভাবিকতা ফুটে ওঠেনি, বরং প্রবল প্রবৃত্তির অন্তরালে সামাজিক সংস্কার ও নীতিবোধ লেখকের মনকে প্রভাবিত করেছিল।

শৈলর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রেম প্রকাশ পেয়েছে শম্ভু কয়েদীর তৈরী পাষাণকক্ষে। প্রেমের শাশ্বতরূপ তাকে নবচৈতন্য দান করেছে। আত্মশুদ্ধির মধ্যে বিনোদের প্রতি চিরন্তন প্রেম উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিনোদের প্রতি তার প্রত্যয় জন্মেছে। সে মনে মনে ভাবে - বিনোদ যেন দেবতা। মাধবীকে সে গাঢ় কণ্ঠে বলে— "দেবতারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মান।" (৩১শ)। এই উক্তি থেকে তার মানস তাৎপর্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাই পাষাণকক্ষের বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বামীকে পাবার জন্য তীব্র বেদনাবোধ করে এবং না পেয়ে পাগল হয়ে যায় এবং নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র এখানে বিশ্লেষণপন্থী। প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়েই মৃত্যুবরণই কুলটা শৈলর একমাত্র পরিণাম হওয়া উচিত—তারই বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। আত্মশুদ্ধির মধ্যে শৈলর শুভবোধ চিত্রনে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সে বিলাসকে ক্ষমা করেছে, যদিও মানুষরূপী সমাজের কালসাপের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল—তারও ইঙ্গিত দিয়েছে মাধবীকে। আবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনোদের প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে—

—'শৈল তখন আদরে মাধবীর একটী হস্ত আপনার ক্রোড়ে লইয়া বলিল, 'দিদি! আজ আমার ফুলশয্যা।' মাধবী উত্তর করিলেন,—"তবে আর এখানে কেন? চল, তাঁহার কাছে যাই।' শৈল বলিল, "না এখনও তিনি আমায় ডাকেন নাই।' (৩৩ পরিচ্ছেদ) শৈলর মনের শূন্যতা ও পাপভীতি থেকে উন্মাদাবস্থায় কথাগুলিতে তার জটিল বিকারগ্রস্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুত, প্রায়শ্চিত্তের পরেও শৈলকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার মত কোন লক্ষণ বিনোদের চরিত্রে পরিস্ফুট হয়নি।

বিনোদ 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র। শৈলর প্রতি তাঁর প্রেম প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই উজ্জ্বল। বিনোদের আহারে-বিহারে, স্বপ্নে, নিদ্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে শৈল নাম। শৈলর জন্যেই চুরির সমস্ত অপরাধ মাথায় নিয়ে সে হাজত বাস করে, তার প্রিয়তমাকে কেউ অপবাদ দেবে বিনোদ তা চায় না। শৈল গোপালবাবুর দেড়-বছর বয়সের ছেলের গলা থেকে 'কণ্ঠমালা' চুরি করতে পারে, তা ভাবতেই পারে না। বিনোদ, বাস্তবিকই উদার ও প্রেমের মূর্ত মানুষ। শৈলর কপটতা ও স্বার্থপরতা সত্ত্বেও বিনোদের স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ এতটুকু নিষ্প্রভ হয়নি। চৌর্যবৃত্তির মতো ঘৃণ্য কাজ,

লম্পট প্রতিবেশী বিলাসের সঙ্গে অবৈধজীবন, মূর্চ্ছাগ্রস্ত দুর্বল স্বামীকে মৃত ভেবে কবর দেওয়ার মত দুষ্কর্ম প্রভৃতি ঘটনাগুলিতে কুলটা হৃদয়হীনা শৈল-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, অথচ সেই শৈলর প্রতি বিনোদের মন বিষিয়ে যায়নি। বোধহয় শিল্পী সঞ্জীবচন্দ্রের তা অভিপ্রেত ছিল। সর্বগুণাধার বিনোদ স্ত্রীর রূপে-গুণে মুগ্ধ। শৈল ছাড়া বিনোদের জীবন অচল। শৈলর অপকর্ম বা দুষ্কর্মের জন্য বীতরাগ না হয়ে বরং স্ত্রীর প্রতি অকপট ভালবাসা তার চরিত্রকে অনায়াস মাধুর্য দান করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, জেলখানা থেকে ফিরে এসে শৈল নির্দেশিত, বিলাস কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার সেই রাত্রের ঘটনাটি বিনোদের কাছে স্বপ্নমাত্র—সত্য নয়। বিনোদ মাধবীকে জিজ্ঞাসা করে—'তবে কি সে রাত্রের ঘটনা সত্য'? (১৯শ পরিচ্ছেদ)। এই সংলাপের মধ্যে বিনোদের মর্মজ্বালা শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিনোদ চরিত্রের মানসিক পরিবর্তনের ধারাটি অনেকটা স্বাভাবিক।

বিনোদের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে দেবার প্রস্তাবে বিনোদের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। সে আত্মভোলা সরল অমায়িক যুবক। সারল্যই তার চরিত্রের বিশেষত্ব। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয় তার চরিত্রকে মাধুর্য-মণ্ডিত করেছে, শৈলর প্রেম তার কাছে অবিস্মরণীয়—তাই মাধবীর অঙ্গের মাধুর্যে ও সৌগন্ধে শৈলর কথা মনে পড়ে। বিনোদ ভাবে—'এ আমার শৈলর অঙ্গ সৌরভ'। তাই মাধবীকে বিয়ে করা বিনোদের পক্ষে অসম্ভবপ্রায় ছিল। তাছাড়া শম্ভুকে লেখা বিনোদের চিঠিগুলিতে শৈলর জন্যে বিনোদের মনোযন্ত্রণা অনুভূত হয়। উপন্যাসের শেষাংশে শৈলর মৃত্যুর পর মাধবীর সঙ্গে বিনোদের শুভবিবাহে কাহিনীর পরিসমাপ্তি নিতান্তই ছেলেভুলানোর ব্যাপার হলেও লেখক বিনোদমাধবীর প্রণয় সংঘটন ও বিকাশের ক্ষেত্রে একটি পরিমার্জিত ও রুচিসম্মত শিল্পরীতির পরিচয় প্রদান করেছেন।

শম্ভু কয়েদী এই উপন্যাসের ঘটনানিয়ন্ত্রণের প্রধান চরিত্র। জেলখানায় শম্ভু কয়েদীর সঙ্গে বিনোদের আলাপ পরিচয়। তিনি কখনও ডাকাত, কখনো পরহিতব্রতী সন্ন্যাসী, কখনও মহাকুলীন। জেলখানায় কয়েদী হিসাবে আনন্দে ঘানি টানে। জেলখানার বাহিরে সে এক মস্ত রাজা। সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধনে তার প্রাণ উৎসর্গীকৃত। তার নিজস্ব ভূগর্ভে নির্মিত একটি পাষাণকক্ষ আছে। দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের নির্জনান্ধকারে বন্দী করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন। শম্ভু ডাকাত যেন রূপকথা রাজ্যের রাজা।

তার দুই সঙ্গী—রামদাস সন্ন্যাসী ও মোহান্ত। শম্ভুর দুটি অস্ত্রস্বরূপ।

শম্ভুর সেবায় বিনোদ জেলখানায় সুস্থ হয়। শম্ভুকে সে খুড়ো বলে ডাকত। বিনোদকে ভূপ্রোথিত করবার সময় প্রাচীরগাত্রে ভয়ংকর পুরুষের কণ্ঠস্বরে শৈল কেঁপে ওঠে, তার বাল্যস্মৃতি ভেসে ওঠে। এই বাল্যস্মৃতি ভেসে ওঠার কারণও রোমান্সসুলভ। কারণ শম্ভু নাকি শৈলর বাবা, রাজা মহেশচন্দ্র। শম্ভু কয়েদীর নির্দেশে শৈলর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্জন পাষাণ কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়। শৈলর চরিত্র থেকে গ্লানি ও কলুষতা দূরীভূত হলে সে মুক্তি পায়। মুক্তি পেলেও চিত্তদংশন থেকে রেহাই না পেয়ে জলে ডুবে মারা যায়।

শৈলর মৃত্যুর পর রাজা (ছদ্মবেশী শম্ভু কয়েদীর আচার আচরণের মধ্যে অতি রোমান্টিকতার বাধাবন্ধনহীন চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ফলে কাহিনী উপন্যাসের পথ ধরে চলেনি, পুরোপুরি রূপকথা হয়ে উঠেছে।[১৩] বিশেষত দারোগা সাহেবের সঙ্গে মাসোহারা ব্যবস্থা মত প্রতি রাত্রে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরিকল্পনা, গুপ্ত গৃহনির্মাণ ও তার শাসনব্যবস্থায় শাস্তিদানের বিধি রীতিমত অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত। শম্ভু চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের কোথাও বস্তু নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে না।

মাধবী চরিত্রটি অনবদ্য। লেখক মাধবী চরিত্র অঙ্কনে সত্যই বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। শৈল ও বিনোদের চরিত্র পরিস্ফুটনে মাধবীর অবদান অবশ্যস্বীকার্য। শৈলর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী মাধবী। আবার, বিনোদের কাছে প্রেরণাময়ী। নিঃসঙ্গচারিণী মাধবীর কোমলতা, সরলতা ও মাধুর্য তার ব্যক্তিত্বের দ্যোতক।

"সেই উদ্দীপ্ত দীপালোকে সুন্দরীর উন্নত মুখমণ্ডল আর একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সে মুখের তাৎকালিক সুখ মাধুরী পটে অংকিত করা অসাধ্য।" বস্তুত, মাধবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার রূপবর্ণনার মধ্যে বিধৃত হয়েছে। লেখক মাধবীর চরিত্র অঙ্কনে রমণীয় ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিনোদের সঙ্গে বিয়ের কথায়, তার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি যথাযথ। মাধবী শৈলর কাছে যেমন মমতাময়ী, বিনোদের প্রতিও তেমনি সংবেদনশীল। বিবাহের ইচ্ছায় তার অস্বস্তিবোধ বাস্তবোচিত।

গৌণ চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বভাবের দ্যোতনা পরিস্ফুট নয়। রামদাস সন্ন্যাসী চরিত্রের স্বকীয়তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মাধবীর প্রতি তার আকর্ষণ

স্বভাবজাত। সে-ও রক্তমাংসের মানুষ। তার ক্রুরতা, ধূর্ততা ও নারীকামনা আশৈশব। কিন্তু তার মানবিক চেতনার মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিচয় অনুপস্থিত। তার প্রতি মাতঙ্গিনীর শাস্তিদান অলৌকিক ও উদ্ভট কল্পনামাত্র। বিলাস অপদার্থ ও কামুক মানুষ। ব্যক্তিত্ব বলতে কিছুই তার ছিলনা।

মাতঙ্গিনী মাধবীর সহচরী। মহারাজের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে লালিত। কিন্তু মহারাজের প্রতি তার আনুগত্য ও বিশ্বাস ছিল অটুট। কিন্তু তার চরিত্রের সম্যক বিকাশ ঘটেনি। মোহান্ত একটি গৌণ চরিত্র। তবে মহারাজের সহায়ক হিসাবে তার ভূমিকা নগণ্য নয়।

পরিশেষে 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের রচনারীতি বঙ্কিমচন্দ্রীয়। পরিচ্ছেদে, পরিচ্ছেদে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, অলৌকিকতা, নাট্যরীতি, স্বপ্ন, গান প্রভৃতি উপাদানের মধ্যে বঙ্কিমরীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমের মার্জিত শিল্পচেতনা তাঁর উপন্যাসের উপাদান প্রয়োগে সংকুচিত ছিল। ফলে কাল্পনিক ঘটনা, ডাকাতির অতিরঞ্জিত প্রসঙ্গ, দেবতামহাপুরুষ মেশানো কাহিনী তাঁর উপন্যাসের বিন্যাস কৌশলকে, ঘটনাসন্ধিকে, চরিত্র-ব্যক্তিত্বকে শিথিল করেছে। একাধিক ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের অবতারণের ফলে উপন্যাসের ঐক্যবিধান ক্ষুণ্ন হয়েছে।

নির্দেশিকা

১। গোপাল হালদার : উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি (পরিচয়, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৫)

২। The Amusements of Modern Baboo-The friend of India (Quarterly) No. XIII, October 1875, page 303.

৩. "His best work is Alaler Gharer Dulal, which may be the first novel in the Bengali language". (Bengali literature, Bankim Chandra, Calcutta Review 1871).

৪. 'Hutam Pyancha', a collection of sketches of city life, something after the manner of Dikens, sketches by Boj, in which the follies and pecularities of all classes—are described in Rocynigorous language (Bengali literature, Calcutta Raview, 1871).

৫. —"his little volume of historical tales—is enough to show taht he might have done a great deal more than he actually has done. (Bengali literature ; Bankim Chandra, Calcutta Review 1871)

৬। Concise Oxford Dictionary.

৭। Sb. Frank and Wagnall—New Standard Dictionary.

৮। 'I do not if Sir Walter Scott gave a taste for his history or if my taste for history made me an admirer of Scott ; but no subject nor even poetry had such a hold upon me as history.

(Literature of Bengal—R. C. Dutta)

৯। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা।

১০। কণ্ঠমালা, ১৮৭৭, পৃঃ ১৮৪। 'ভ্রমর' নামক মাসিক পত্রিকা ১২৮১ সালের আষাঢ় থেকে ১২৮২-র জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ১২ সংখ্যায় ৩৭টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। পরে সঞ্জীবচন্দ্র যখন বই-আকারে প্রকাশ করেন তখন আরো ৬টি পরিচ্ছেদ লিখে যোগ করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'কণ্ঠমালা'র অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হয়।—সাহিত্যসাধক চরিতমালা। তৃতীয় খণ্ড।

১১। 'কণ্ঠমালা' মাধবীলতার পরিশিষ্ট—সাহিত্যসাধক চরিতমালা(তৃতীয় খণ্ড)।

১২। নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য : বঙ্গদর্শন-বৈশাখ (১২৮৭) : চন্দ্রনাথ বসু

১৩। তদেব।

১৪। "আর্যদর্শন" : ভাদ্র-১২৮৪, পূর্ণচন্দ্র বসু।

১৫। শৈল ছাদ হইতে নামিলেন। শয়নগৃহে স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "বেলা যে শেষ হইল, এখনও স্নান করিতে গেলে না ?"
অপরাহ্ন হইয়াছে শুনিয়া বিনোদ গ্রন্থ রাখিয়া উঠিলেন, সেই সময় স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বিনোদ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় রক্ত মাড়াইলে ?' শৈল বলিলেন—আল্‌তা পরিয়াছি বলে উপহাস করিতেছ, তবে আমি ধুয়ে ফেলি।'
(১ম পরিচ্ছেদ)

১৬। সঞ্জীব রচনাবলী—ভূমিকা। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২২

মাধবীলতা

'মাধবীলতা'[১] সঞ্জীবচন্দ্রের অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস। আঠারোশো শতকের শেষার্ধের বাংলাদেশের ঘটনাবলী এ-উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'কণ্ঠমালা'[২] প্রকাশের দীর্ঘ ৮ বছর পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মাধবীলতা' প্রকাশিত হয়। 'মাধবীলতা' পরে প্রকাশিত হলেও এটি 'কণ্ঠমালা' কাহিনীর প্রথমাংশ। প্রকৃতপক্ষে, সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা' উপন্যাসটি ঐতিহাসিক না হলেও পুরো-পুরি অতীতাশ্রয়ী, গল্পকথা ও রূপকথার ঢঙে রচিত। সিংহশত গ্রামের রাজা ইন্দ্রভূপকে কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে গ্রহণ করে ইতিহাসের সূত্রে কাহিনীকে গ্রথিত করা হয়েছে। রাজকীয় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর মোগলাই বিলাস-ব্যাসনের সমকক্ষ একটি বাতাবরণ তৈরী করেছে। মোঘলযুগীয় রোমান্স 'মাধবীলতা'য় প্রাধান্য পেয়েছে। একটি এক বছরের ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের ঘটনা নাটকীয় জগতে ফিরে এসেছে। চতুর চূড়াধন, রাজা ইন্দ্রভূপের পাশা খেলার সঙ্গী এবং রানীর বিশ্বস্ত পাত্র। চূড়াধনের খলতায় উপন্যাসের দ্বন্দ্বের বীজ প্রথম থেকেই সূচিত হয়েছে। আর একটি চরিত্র পিতম পাগল। সে-ই কিন্তু চূড়াধনের কারসাজি ধরে ফেলে। রাজভগিনী জ্যোৎস্নাবতীর জীবনযাত্রা ও আচারআচরণ রোমান্সসুলভ বিষয় কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারীর স্বাতন্ত্র, প্রণয় ও সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে। শিশুচিত্র অঙ্কনে, নারীচরিত্রের রহস্য উন্মোচনে, কাহিনীর ক্ষেত্রে কৌতূহল সৃষ্টিতে তিনি অনায়াস-সাফল্য লাভ করেছেন। প্রকৃতির রোমাঞ্চকর বর্ণনা এবং মা ও সন্তানের সম্পর্ক নির্ণয়ে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদান তাঁকে জনপ্রিয়তা দান করছে। বাৎসল্য ও করুণরস সৃষ্টিতে তিনি স্বভাবসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। এ-সব কারণে 'মাধবীলতা' উপন্যাস সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকসমাজে গৃহীত হয়েছিল। মাধবীলতার প্লট, কাহিনী, চরিত্রচিত্রণ ও রচনারীতি তখনকার যুগে প্রত্যাশিত। উনিশ শতকের সামাজিক জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঢেউ এসেছিল, বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিকদের রচনায় তার স্পর্শ লক্ষণীয়। বাঙালী যৌথ পারিবারিক জীবনে ক্রমশ ফাটল ধরতে দেখা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা' উপন্যাসে যৌথ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ত্যাগ ও স্বার্থের

কথা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পিতম ও জ্যোৎস্নাবতীর ত্যাগ এবং চূড়াধন ও তক্ষপুরের দেওয়ানের ক্রূরতার চরিত্র চিত্রণে পারিবারিক জীবনের ভালমন্দের দুটি দিকই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তবে তিনি প্রাচীন সনাতনরীতির পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রাচীন সমাজ ও ধর্মাদর্শকে তেমনি আবিষ্কার করেছেন হিন্দু অতীতকে। পরিবর্তনশীল সমাজ ধারায় সেই হিন্দু অতীতকে খুঁজেছেন হিন্দু নৃপতি ইন্দ্রভূপের চরিত্রে। নারী ও পুরুষের সতীত্ব ও প্রণয়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সততার স্বীকৃতি। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নরনারীর হৃদয় উৎসারিত প্রণয়কে সামাজিক প্রথার অধীনে দেখতে চেয়েছেন।

স্ত্রী ও পুরুষের সতীত্ব ও সততাকে আশ্রয় করে অনুসৃত হয়েছে বঙ্কিমযুগের উপন্যাসের চারিত্ররীতি ও সমাজ-ধর্মনীতি। সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' বা 'মাধবীলতা' উপন্যাসে সেই সততা ও সতীত্বের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীব-সমকালীন যুগের অন্যান্য কথা-সাহিত্যিকদের রচনায় সেই ধারা লক্ষ্য করার মত। প্রসঙ্গক্রমে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'যোগেশ্বরী'[২] দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'পুণ্যপ্রভা',[৩] (১৩০৩), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'প্রেম প্রতিমা'[৪] বা 'প্রিয়ম্বদা' (১৮৮৬), অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'সংসার সঙ্গিনী'[৫] (১৮৮৫) প্রভৃতি উপন্যাস-গুলি উল্লেখযোগ্য।

'কণ্ঠমালা' বা 'মাধবীলতা' উপন্যাসের মধ্যে যেমন ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় প্রতিপাদ্য বিষয়, তেমনি দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'যোগেশ্বরী' উপন্যাসে ধর্মবোধ জাগাতে লেখকের আত্যন্তিক মনোভাব লক্ষণীয় বিষয়। 'মাধবীলতা'র পিতম চরিত্রের সঙ্গে 'যোগেশ্বরী'[৬] উপন্যাসের নায়ক ধার্মিক উমাশংকরের সাদৃশ্য মূলত এক ধরণের।

যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' বা 'মাধবীলতা' উপন্যাসে যেমন সততা, সতীত্ব ও ধর্মমত উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে, আবার অন্যদিকে রাজা-রাজড়ার কল্পিত প্রসঙ্গ বা রাজ্যবঞ্চিত রাজার কাহিনী লেখকের কল্পনার রঙে উপস্থাপিত হয়েছে। এর ফলে সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা' উপন্যাসে অলৌকিকতা বা অবাস্তবতার অস্তিত্ব একটু বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কাহিনী কাল্পনিক হলেও মাঝে মাঝে উপন্যাসের মধ্যে মধ্যে মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও নিরাশার চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এছাড়া, লঘু পরিহাস তাঁর উপন্যাসকে হাস্যরসোজ্জ্বল করেছে। বলা বাহুল্য, লেখকের পর্যবেক্ষণক্ষমতা, বিশ্লেষণধর্মিতা

তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও চিন্তাশীলতার ছাপ 'মাধবীলতা' উপন্যাসে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। সাধারণভাবে ভাষা প্রাণবন্ত, বর্ণনা গতিময়, বিবরণ-বর্ণনা-সংলাপ আবেগোচ্ছ্বসিত। লেখক সুযোগ পেলেই আলোচ্য উপন্যাসে সৌন্দর্যপ্রিয়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন এবং পাঠককে নীতিবাক্য ও ধর্মোপদেশ শুনিয়েছেন। বর্তমান যুগের রূঢ় পরিবেশে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যখন বিপন্ন ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদ যখন শিথিলপ্রাপ্ত, তখন সঞ্জীবচন্দ্র অতীতের প্রতি তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন। বস্তুত, 'মাধবীলতা' উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের ভিড়। চরিত্রগুলির মধ্যে পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ গুণগুলি মূর্ত হয়েছে এবং প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ গুণের আধিক্য দেখা যায়। যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে এসমস্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করা চলে না। সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানত হৃদয় বা আবেগের দ্বারা চালিত হতেন। শিশুর মত সরল চিত্তে তিনি জীবনকে উপভোগ করেছেন এবং সেই যুগের পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দদান করেছেন। এই মুহূর্তে ইংরাজী সাহিত্যের ভিক্টোরীয় যুগের স্বনামধন্য ডিকেন্স ও বেন জনসন-এর কথা মনে পড়ে। ডিকেন্সের মতই সঞ্জীবচন্দ্রও শিশুর মত সরল চিত্তের মানুষ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। যেহেতু উভয়েরই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, সেহেতু মধ্যবিত্ত চরিত্রাঙ্কনে উভয়ের কৃতিত্ব সমভাবাপন্ন। আবার বেন জন্সন-এর 'কমেডি অব হিউমার্স'-এর চরিত্রগুলির মত সঞ্জীবচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যেও পাপ, পুণ্য, ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রবৃত্তিগুলির সমধর্মিতা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে লেখকের আশ্রয় হারা, রাজ্যহারা, বন্ধুহারা, আত্মীয়স্বজনহারা শিশু নারী ও পুরুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়বস্তু।

দুই

'মাধবীলতা'য় মোট আটত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে। পরিচ্ছেদগুলি ভাগ করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু মূল ভাবের পর্যায়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। ফলে বইটির গঠন-কাঠামোয় পারিপাট্য দৃষ্টিগোচর হয়না। কাব্যসুরভিত ভাষা, আবেগের প্রবলতা, বর্ণনার আধিক্য প্রভৃতি উপাদান উপন্যাসের প্লটের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। তথাপি প্রকৃতির রহস্যময় অনন্তশক্তির বোধ এই উপন্যাসের মূলে দেখা যায়, এছাড়া নৈসর্গিক ঘটনাগুলির গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অতিলৌকিকের ব্যঞ্জনা রোমান্সের অপরিচয়ের রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যাবে—সিংহশত গ্রামে ক্ষয়িষ্ণু রাজা ইন্দ্রভূপ বসবাস করেন। তিনি সাধারণ লোকের মতই শান্ত ও সরল। রাজা সুখী। সজ্জন ব্যক্তি, সুশ্রী। দেওয়ান কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রজারা রাজভক্ত ও রানী রাজার প্রতি অনুরাগিনী। শুধু চতুর চূড়াধন রাজার পাশা খেলার সাথী হলেও তার দুরভিসন্ধি বড়ো ভয়ানক। অকস্মাৎ দেওয়ানের গৃহে আগুন লাগানো ও গৃহদাহ থেকে দেওয়ানকে উদ্ধার করবার প্রচেষ্টার মধ্যেই চূড়াধনের চরিত্রের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদই উপন্যাসটির পটভূমিকা, আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠক যাতে অবহিত হতে পারেন, সে-জন্য লেখক মূল কাহিনীটিকে পরিণামমুখী করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের এইখানেই কৃতিত্ব। চূড়াধন রাজার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, তাঁর অনুগত ও নীরবভাষী। লেখক এইরূপ অলক্ষ্যচারী খল চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক চূড়াধনের আচার-আচরণের ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাঁর মানবচরিত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করেছেন। চূড়াধন মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের অতিপরিচিত চরিত্র। উপন্যাসের রোমান্স-সুলভ পরিবেশেও তিনি চূড়াধনের মত বাস্তবোচিত খল চরিত্র অঙ্কনে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। চূড়াধন রাজবাড়ী থেকে প্রায়ই সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন। যাবার সময় দ্রুতপদে যেতেন। লোকে বলত—'ঐ চূড়াধনবাবু প্রদীপ নিবাইতে যাইতেছেন।'

—"বাস্তবিক সে কথা কতকঅংশে সত্য। গৃহে তাঁহার প্রতীক্ষায় অনর্থক প্রদীপ না জলে, অনর্থক তৈল নষ্ট না হয়, ইহা তাঁহার সাংসারিক বন্দোবস্তের কথা বটে। তাহার যে নিতান্ত দৈন্যদশা ছিল, এমত নহে। গৃহে দাসদাসী ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া অনর্থক তৈল নষ্ট কেন হইবে? এইজন্য গৃহে প্রদীপ বড় জ্বলিত না।"

চূড়াধনের প্রদীপ নেভানর মধ্যে লেখক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার দ্বারা চরিত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। চূড়াধনের খলতার পূর্বলক্ষণ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সেই চূড়াধনের ধূর্তামি একমাত্র পিতম পাগলা ধরে ফেলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে পিতম পাগলাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে ঘটনার সূত্র ধরেই। প্রিতম রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

পিতমের প্রভাব চতুর্থ পরিচ্ছেদেরও বিস্তৃত হয়েছে। পিতম পাগলের

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করবার জন্য লেখক তার প্রবৃত্তির রহস্যময় দিকগুলিই উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। পাগল রাজার আশ্রয়প্রার্থী, কিন্তু সে অতিথি-শালায় থাকতে রাজী নয়, কারণ অতিথিশালায় দরিদ্ররা থাকে। তাই যে ব্যাঘ্রের পাশের ঘরে কেন থাকতে চায়, রাজা তা বুঝতে পারেনা। রাজা সংস্কারবশত কিছুটা বিস্মিত হয় এই ঘটনায়। পিতম প্রায়ই বিমর্ষ থাকে। কিন্তু তার কথাবার্তার মধ্যে দার্শনিক সুলভ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র পিতম পাগলের কবিত্বশক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। পিতম পাগলকে একমাত্র চূড়াধন চিনতে পারে, চূড়াধন মনে মনে ভাবে—"তাহারে পাগল কেন বলি? সে নির্বোধ কিসে? পিতম আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান, আমি, এপর্যন্ত আপনার কার্যসাধন করিতে পারি নাই। পাগল হইয়াও পিতম আপনার কাজ হাসিল করিল। আমার নিজের ঔদাস্যে সকল হারাইতেছি।"

বস্তুত, চূড়াধন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বারবান রামদীন, স্বয়ং রাজা ইন্দ্রভূপের মনে পিতমের অলৌকিক প্রভাব ভর করেছিল। রাজার সঙ্গে পিতমের কথায় ভবিষ্যৎমুখী, রহস্যদ্যোতনাও তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন—

পিতম। আমি মানুষ পশু, একপ্রকার নরসিংহ, নৃসিংহদেব

রাজা। নৃসিংহদেব। তোমার প্রহ্লাদ কই?

পিতম। তুমিই আমার প্রহ্লাদ, তুমিই আমার ভক্ত।

রাজা। আর তোমার রাজা হিরণ্যকশিপু কই?

পিতম। (চূড়াধনবাবুকে দেখাইয়া) ঐ আমার হিরণ্যকশিপু।

রাজা। চূড়াধন ত রাজা নহে।

পিতম। শীঘ্র হবেন।

হঠাৎ রাজা ও চূড়াধন উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন।" পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে অগ্রগতির সূত্রটি অপূর্ব নাট্যচমকে সূত্রবদ্ধ করেছে ও উপন্যাসে পরবর্তী ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

আরো লক্ষণীয় যে, পিতম পাগলের ভবিষ্যৎবাণীর দ্বারা কাহিনীর মধ্যে আশংকার মেঘ ঘনিয়ে তোলা হয়েছে ও উপন্যাসের অনিবার্য পরিণতি লক্ষণগুলি সূচিত হয়েছে। পশুশালায় পিতমের কথাবার্তায় রাজার হৃৎকম্প হয়েছিল, রাজ অন্যমনস্ক। রাজা পারিষদবর্গ, রাজপুরোহিত, চিকিৎসক, দ্বাদশ অধ্যাপক ও চূড়াধনকে নিয়ে বিকালে অতিথিশালা পরিদর্শন করে রামসীতা মন্দিরে যাত্রা করলেন। রাজার বেশভূষা অতি সামান্য। রাজার পাদবিক্ষেপের

মধ্যেও অন্যমনস্কতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভাবে ভাষায় দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ রাজা চূড়াধনকে ডেকে আশীর্বাদ করলেন—'তুমি অরোগী হও, তুমি চিরজীবী হও'।

'চূড়াধনবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, নম্রমুখে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এমন সময় দেবমন্দিরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল।'

রাজার হৃদয়েও না-বলা আর্তনাদ আরও বেশী করে শোনা গেছে যখন তিনি রাম-সীতা মন্দির পথে ক্রন্দনরতা ব্রাহ্মণ বালিকাকে বুকে তুলে নিয়ে মুখচুম্বন করলেন। ঘটনাটি যথার্থ নাটকীয়—তথাপি ইঙ্গিতবহ। রাজা এই একবছরের কন্যাটিকে কোলে নিয়ে যেন তারই আত্মজার সান্নিধ্য উপলব্ধি করেন। বলা বাহুল্য রাজা যেন দুর্ভাবনার মধ্যেও কন্যাটির কাছে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পান। একবছরের মেয়েটিও রাজার বুকে নিরাপদ আশ্রয় পায়। বস্তুতঃ এই ঘটনাটি পরোক্ষভাবে উপন্যাসকে মনোজগতের অভিমুখী করেছে। মেয়েটির নাম পুঁটু। রাজা নাম দেন—'মাধবী' থেকে উপন্যাসের নামকরণ 'মাধবীলতা'।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একজন ব্রহ্মচারীর ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। তিনি রাম-সীতা মূর্তিকে প্রণাম করেননি, অথচ দেশের জনগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনিও রাজানুগত ও প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এই পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে দুটি কারণে রাজার প্রতি প্রজারা অসন্তুষ্ট। এক, রাজা একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে অপহরণ করেছেন। দুই, রাজা দেওয়ানজীর পরামর্শে পিতম পাগলাকে বাঘের পাশের কক্ষে বন্দী করে রেখেছেন। রাজার প্রতি এই দুটি অপবাদ রটানোর ঘটনায় প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনদের চারিত্রিক ছাপ দেবার ইচ্ছা থেকেই এসেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে একজন হিন্দুস্থানী চোপদার রামসা৺ পাড়ায় রাজপথে পায়চারি করছে। তাকে ঘিরে পাড়া-প্রতিবেশীদের ঔৎসুক্যের অবধি নেই। বিশেষত, যে বাড়ীর সম্মুখে চোপদার দাঁড়িয়ে আছে, সেই বাড়ীর লোকজনের প্রতি কটাক্ষ আলোচ্য পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

গৃহকর্তা রামসেবক বাড়ীতে ছিল না। বাড়ীতে ফেরার পথেই চোপদার তাকে প্রণাম করে যোড় করে বলল—'আপনার সেবায় যে সকল দাসদাসী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা আগত-প্রায়। বস্ত্র, অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি

লইয়া আসিতেছে। আপাততঃ চারিজন দ্বারবান উপস্থিত আছে, আপনার যেরূপ অনুমতি হয়।'

দারিদ্র্যক্লিষ্ট রামসেবক চোপদারের কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ কাউকে বড়লোক করে দেওয়ার ঘটনা পরিচিত সামাজিক জীবনে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না। একমাত্র রূপকথার রাজ্যেই এ ধরণের রোমান্সের কল্পনাবিস্তার সম্ভব।

এই পরিচ্ছেদে লেখকের ব্যাঙ্গাত্মক বিবরণে অনায়াস নৈপুণ্য ব্যক্ত হয়েছে। যখন রাজবাটি হতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামসেবকের বাড়ীতে লোভনীয় জিনিসপত্র আসতে সুরু হলো, তখন প্রতিবেশীদের উপহাস, ব্যঙ্গবিদ্ধ ভাষা বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। যেমন—'ধনাঢ্যের প্রতি উপহাস, যুবতীর প্রতি উপহাস, বৃদ্ধের প্রতি উপহাস, সতীত্বের প্রতি উপহাস ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল।"

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিকগণ নারীর সতীত্ব ও প্রণয়ের বিষয়টিকে তাঁদের উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

বস্তুত আলোচ্য পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামসেবকের স্ত্রীর সতীত্বের পরিণাম ইঙ্গিতে প্রদান করেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদে রামসেবকের স্ত্রী রাজপ্রদত্ত অলংকার ও পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে মাধবীলতাকে নিয়ে রাজান্তঃপুরে পৌঁছেছে। অলংকার ও পোষাকের ভারে রামসেবকের স্ত্রী রীতিমত ব্যতিব্যস্ত, যেন দরিদ্রের প্রতি ধনাঢ্যের পরিহাস। তবে, লক্ষণীয় যে এক বছরের মেয়ে মাধবীলতা অন্তঃপুরে রানীর কোলে গিয়ে স্বর্ণখচিত আঁচল নিয়ে খেলা করার মধ্যে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়।

রাজা-রানীর কথাবার্তার মধ্যে মেয়েটির প্রতি তাঁদের পরস্পরের একটা অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভূত হয়। শিশু চরিত্র বর্ণনায় সঞ্জীবচন্দ্র অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাছাড়া, লেখকের সংলাপের ভাষার প্রধান লক্ষণগুলি আলোচ্য পরিচ্ছেদে চমৎকার ভাবে প্রকাশিত। তিনি ঘটনার বিবরণ না দিয়ে পাত্রপাত্রীদের সোজাসুজি পাঠকের সামনে এনে হাজির করেন। পাত্র-পাত্রীদের অন্তরের আবেগ সংলাপের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে :

রাজা : মাধবীর হাসি বুঝি কতক আমার মত।

রানী : তা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, কিন্তু এর হাতের গড়ন দেখুন,

ঠিক আপনার মত।

রাজা: আবার দেখ এর চোখ দুটি নিশ্চয় তোমার মত। প্রথমে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম।

রানী: কি আশ্চর্য! মানুষের মত ত মানুষ হয়?

রাজা: এ জগতে কিছুই বিচিত্র নহে।

রাজারানীর সংলাপে পূর্বঘটনার সূত্র পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আসলে—পুঁটু রাজকন্যা। রানী মৃতবৎসা। একবার যমজ সন্তান প্রসব করেন। একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। মেয়েটিকে মৃত মনে করে দাসীরা সৎকার করতে নিয়ে যায়। রানী জানতেন না। পিতম পাগল দাসীর কাছ থেকে ছোঁ মেরে এবং ব্রাহ্মণ রামসেবকের স্ত্রীর সদ্যোমৃত শিশুটিকে সরিয়ে কোলের কাছে রেখে আসে। রাজকন্যা মরেনি। সেই থেকে দরিদ্র ব্রাহ্মণীর কাছে রাজকন্যা লালিত পালিত হয়।

লেখক উক্ত ঘটনাটির পূর্বাভাস রাজারানীর সংলাপের মধ্যে নাট্যরীতির আদর্শে প্রকাশ করেছেন এবং ঔপন্যাসিক সুচতুর কৌশলে না-জানা রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত দান করেছেন এবং মেয়েটির পরিচয় আবৃত রেখে নাট্যমুহূর্ত তৈরী করেছেন।

নবম পরিচ্ছেদে রাজার ঘনিষ্ঠা বিধবা ভগিনীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি রাজকন্যাটির জন্ম বৃত্তান্ত জানতেন। রাজভগিনীর নাম জ্যোৎস্নাবতী। লেখকের এই চরিত্রটির উপস্থাপনায় শিল্পীর মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ পাত্রী তার আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়েই যেন তার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। মূলতঃ, সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের মতই নাট্যধর্মী।

দশম পরিচ্ছেদে দেখা যায় পুঁটুর মা নিজগৃহে রাজাপ্রেরিত পরিচারিকাদের দ্বারা এমনই সমাদৃত, সজ্জিত যা একমাত্র রূপকথার রাজ্যেই শোভা পায়। পরিচারিকাদের যত্নে, পরিচর্যায় পুঁটুর মা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পুঁটুদের প্রতি রাজার অনাবশ্যক স্নেহাকর্ষণ প্রতিবেশীরা ভাল চোখে দেখে না, বরং তারা পুঁটুর মাকে জড়িয়ে নানা কুৎসা রটনা করতে থাকে।

কেহ বলিতেছে,—"রাজা নাকি পুঁটুর মাকে সোনায় মুড়েছে।"

কেহ বলিতেছে,—"তাহার কাপড়ে নাকি মুখ দেখা যায়।"

কেহ বলিতেছে,—'এই দুই দিনে পুঁটুর মা-র শ্রী ফিরেছে, রঙ ফেটে পড়িতেছে।'

কেহ বলিতেছে,—'পুঁটুর মার গলায় দড়ি, আবার লোকের নিকট মুখ দেখাবে কেমন করে ?

পুঁটুর মা একেবারেই গ্রাম্য নারী, তার সরল নিষ্পাপ জীবনে, অদৃষ্টে শনির অনুপ্রবেশ ঘটছে, তা সে আদৌ বুঝতে পারে নি। তাই এই বধুটির চরিত্রের পরিণাম নির্ণয়ে সতীত্ব রক্ষার কৃত্রিম চেষ্টা করা হয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে লেখক রামসেবক ও পুঁটির মার দাম্পত্যজীবনের একটি সুখচিত্র অঙ্কন করেছেন। অতিলৌকিক জগত হতে লেখক লৌকিক জীবনের সুখদুঃখমিশ্রিত ঘটনার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। এই পরিচ্ছেদে উপকাহিনীর পাত্র রামসেবক ও পুঁটুর মা-মূল কাহিনীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। রাজ-ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু স্নেহসুধামণ্ডিত বাসগৃহই সকল মানুষের একান্ত কামনা—তারই বাস্তবোচিত চিত্রণ এই পরিচ্ছেদে পরিস্ফুটন করা হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মূল কাহিনীর নায়ক ইন্দ্রভূপ ও প্রতিনায়ক চূড়াধন, পারিষদবর্গকে নিয়ে বায়ু সেবনে বেরিয়েছেন। ইচ্ছা একবার মাধবীলতাকে দেখা। এই দেখার মধ্যে তাঁর অকৃত্রিম প্রেমের ফল্গু ধারা প্রবাহিত। বাস্তবিক 'এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই।'

হঠাৎ পিতমের কণ্ঠস্বরে গোল বাঁধল। তাঁর দার্শনিকসুলভ কথাবার্তায় রাজা ও চূড়াধন বিস্মিত, কিছুটা চিন্তিত। পিতম পাগল আবার জ্যোতিষ জানেন। পিতম রাজাকে বলে—'আপনার সময় বড় মন্দ। গ্রহ আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে।' আর চূড়াধনকে বলে—'আপনার সময় বড় ভাল, ইচ্ছা হয়, এই সময় আপনার পোষ্যপুত্র হই।"

বস্তুতপক্ষে, পিতমের আচরণ ও কথাবার্তা নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ। পিতমের ভবিষ্যদ্বাণীতে অশুভদিনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, রাজবিদ্বেষী চূড়াধনের ষড়যন্ত্রের কথা এই পরিচ্ছেদে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। পিতম চূড়াধনের ভালোমানুষী মুখোশের মধ্যে ধূর্তামির আসল রূপ দেখতে পেয়েছিল। চূড়াধন মধ্যযুগের বাঙালীসমাজের অতি পরিচিত চরিত্র। সঞ্জীবচন্দ্র চূড়াধন চরিত্র অঙ্কনে বাস্তবজগতের পরিচয় দান করেছেন। এ যেন ঠিক কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্তের সমগোত্রীয় চরিত্র। চূড়াধন পিতম পাগলকে সহ্য করতে পারে না। তাই সে তার অনুচরদের পিতম সম্পর্কে সাবধান করে করে দেয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, প্রকৃতি বর্ণনায় লেখকের স্বভাবসিদ্ধ ভাষাভঙ্গীর অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে বাঙ্গালী চিরকালের স্বভাবটি অনন্য-সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। "স্থান-মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য, এই জন্যই তীর্থ। ভয়, ভক্তি, বিলাস, বৈরাগ্য—এ সকলই স্থানের গুণে আপনিই মনে উদয় হয়। এইজন্য অনেকে বলে, স্থানানুযায়ী মনুষ্যের প্রকৃতি। বাঙ্গালায় পাহাড়-পর্বত কিছুই নাই, একখানি কঠিন প্রস্তরও নাই, বাঙ্গালায় যাহা কিছু আছে, সকলই কোমল, মৃত্তিকা পর্যন্ত কোমল।...আমরাও ঠিক সেইমত কোমল। যে জাতিই আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করুক, সেই জাতিই ক্রমে আমাদের ন্যায় কোমল-স্বভাবই হইবে।"

রাজা ইন্দ্রভূপের কোমলস্বভাবের কথা ভাবতে ভাবতে পিতম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে। পিতম পাগল কিন্তু পরোপকারী। রাজানুগতা প্রজা। চূড়াধনের চক্রান্তে রাজার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সেই বিপদের কথা ব্রহ্মচারীকে শুনিয়ে আসে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর আসল পরিচয় লেখক এখনো আমাদের জানাননি। তার গতিবিধি, আচার-আচরণ অজ্ঞাত রহস্যপূর্ণ। বাস্তবে-অবাস্তবে মিশ্রিত রূপকথা জগতের মানুষ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে দেওয়ান পুত্র নবকুমারের সঙ্গে পিতম পাগলের কথোপকথনে পিতমের সারল্য ও সততা যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে উপন্যাসের বিশিষ্ট জীবনবোধ ধরা পড়লেও কাহিনীবিন্যাসে নিপুণতা ও সতর্কতা লক্ষ্য করা যায় না। শিবদুর্গার আজগুবি বর্ণনায় লেখকের কৌশল দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয় না।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ পরিচ্ছেদে রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়েছেন রাজকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে। শতাধিক ভাট, সেরেস্তদার, পেস্কার। তাদের মাথায় পাগড়ি। অধ্যাপকগণ ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ে পরস্পর আলাপআলোচনা করছেন। রাজভৃত্যেরা নবাবী কায়দায় পোষাকে শোভিত। লেখক আলোচ্য পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের বাংলাদেশে আদবকায়দা ও ঘটনার চিত্রণ অঙ্কন করেছেন। লেখকের ভাষা প্রয়োগে ও রচনারীতির প্রসাদগুণে সুদূর অতীতের ব্যাপারগুলি চাক্ষুস হয়ে উঠেছে।

এই পরিচ্ছেদেই জ্যোৎস্নাবতী চিকের আড়াল থেকে পিতম পাগলকে চিনতে পারে। ব্যাকুল হয়ে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করে...'মাতঙ্গিনী, তুই

এই দুঃখী—এই দরিদ্রকে চিনিস্?'

জ্যোৎস্নাবতী ও পিতম—এই দুটি চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের সহানুভূতি ও সহধর্মিতা পরিলক্ষিত হয়। স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও কঠিনতম কষ্ট ও দুঃখভোগ জ্যোৎস্নাবতী চরিত্রকে বর্ণদান করেছে। রাজকুমারের জন্মদিনে জ্যোৎস্নাবতীর চোখে জল। চোখে জল না'কি ভাল লক্ষণ নয়, এই সংস্কার আমাদের দেশে মান্ধাতার কাল থেকে চলে আসছে। লেখক এই সংস্কারটি কৌশলে উপন্যাসের উপাদান হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন। রাজা যখন রাজকুমারকে নিয়ে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন—দশরথ শর্মা নামে একজন অধ্যাপক রাজকুমারকে দেখে তাঁর সন্তান বলে দাবী করেন। সূতিকাঘর থেকে তাঁর সন্তান চুরি গিয়েছিল। জানা যায়, সূতিকাঘর থেকে তাঁর ছেলেকে শিয়ালে নিয়ে যায়, সেইদিন গ্রামের প্রান্তে একটি সদ্যপ্রসূত অর্দ্ধভুক্ত সন্তানের দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায়। আসলে চূড়াধনের ষড়যন্ত্রে দশরথ রাজকুমারকে তাঁর সন্তান বলে দাবী করেছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে চূড়াধনের চক্রান্ত প্রকট হয়ে উঠেছে দশরথ শর্মার সঙ্গে কথাবার্তায়। রাজবিদ্বেষ রাজান্তঃপুরে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিচারিকাদের মধ্যে সেই বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। দেওয়ান চূড়াধনের চক্রান্ত জানতে পেরেও প্রতিকারে সমর্থ হয়নি। অধ্যাপকরা রাজবিদ্বেষী হয়ে পড়েছেন। অজস্র ঘটনা ও চরিত্রের মিছিলে মূল ঘটনা ও চরিত্রকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অসংখ্য শাখাকাহিনীর জালে মূল কাহিনী আচ্ছন্ন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব সূচিত হয়েছে। রাজকুমারকে নিয়ে তাঁর সন্দেহ অমূলক, তথাপি দশচক্রে তিনিও বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত। রাজার সহজ প্রেমের জগত যে ভিতর থেকে ভেঙে পড়েছে তারও ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। প্রলোভন বিস্তারে জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি দাসীদের দয়ার্দ্রতার ছলনা অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। খল, হিংসাপরায়ণা, লোভী নারী চরিত্র অঙ্কনে লেখকের সচেতন অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। দাসীদের তাতানো কথায় জ্যোৎস্নাবতীর চিত্তলোকে আত্মসংযমের যে প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত।

উপন্যাসের উনবিংশ পরিচ্ছেদে জ্যোৎস্নাবতী ও পিতম কাহিনীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে পরিচারিকা মাতঙ্গিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোৎস্নাবতীর অসময়ের সঙ্গী। মাতঙ্গিনীর বারংবার অনুরোধে

জ্যোৎস্নাবতী তাঁর শ্বশুরবাড়ীর পূর্ব কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন পাঠককে। জ্যোৎস্নাবতীর স্বামীর নাম বিজয়রাজ—তিনিও রাজকুমার। অতিশয় ধর্মভীরু, মাত্রাধিক মনোকষ্টের ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করে যখন রাজ্যে ফিরে আসেন—দেওয়ানের কারসাজির ফলে তিনি আর রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারলেন না। পরে তিনি মৃত বলে ঘোষিত হন। বিজয়রাজ মরেননি, তিনিই পিতম পাগল; জ্যোৎস্নাবতী তাঁর হতভাগিনী স্ত্রী। সুদীর্ঘ ১৬ বছর স্বামীগৃহে জ্যোৎস্নাবতীর জন্যই পিতম সিংহশত গ্রামে পাগলের বেশে ঘুরে বেড়াতেন। চিকের আড়াল থেকে পিতমকে দেখে জ্যোৎস্নাবতী ঠিক তাঁর স্বামীকে চিনতে পারেন।

যদিও এই উপকাহিনীর মূলে রয়েছে অবিন্যস্ত ভাবনা, তবু নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশ পুরানো ঘটনাকে জড়িয়ে গল্পকে উত্তেজনায় ও কৌতুকরসের ও ক্লাইমেক্সে তোলা হয়েছে। উপন্যাসে বিজয়রাজ-জ্যোৎস্নাবতী কাহিনী যুক্ত হয়ে গল্পের মোড় পাল্টে গেছে। রাজপ্রসঙ্গ কাহিনীর সামনে রইল না বটে, কিন্তু তার জন্মবৃত্তান্তের রহস্যটি সমান সজীব রইল পাঠকের মনে। রাজ-পরিবার থেকে অন্য পরিবার থেকে অন্য পরিবারে, এক ষড়যন্ত্র থেকে আর এক পরিবারের ষড়যন্ত্রের ঘটনার সাদৃশ্য সমস্যার বিস্তারে ইঙ্গিত করেছে।

বিংশ পরিচ্ছেদে মাতঙ্গিনী প্রসঙ্গে লেখক রোমান্সের বাতায়ন খুলে দিয়েছেন। রানীকে না জানিয়ে মাতঙ্গিনী কাজে ইস্তাফা দিয়ে জ্যোৎস্নাবতীর শ্বশুরালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। রাত দ্বিপ্রহরে ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে রাজ-জামাতার বিশেষ পরিচয় ও বাড়ীর ঠিকানা জেনে নেয় এবং ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষপুর যাত্রা করে। মাতঙ্গিনীর স্বভাবে গতিবেগ ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি লক্ষণীয়। কিন্তু ব্রহ্মচারী চরিত্রের কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। কাহিনীর ঘটনাগ্রন্থি সচল রাখাই তার একমাত্র কাজ।

একবিংশ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় যে, পুঁটুর মা কলঙ্কের কথা জানতে পারে পাড়াপড়শি পদ্মর কাছ থেকে। রাজার সঙ্গে নাকি তার অবৈধ সম্পর্ক আছে। প্রতিবেশী পদ্মর কাছে পুঁটুর মা তার প্রথম কলঙ্ক-রটানোর কথা শোনে। পদ্ম তাকে বলে, "ওলো কালামুখী, বল দেখি, বুড়া রাজার মন কেমন করে ভুলালি।

পুঁটুর মা। আমি ভুলাই নাই ভাই, পুঁটু ভুলাইয়াছে।

পদ্ম। বই কি। এরেই বলে পোর নামে পোয়াতী বত্তায়। হা কালামুখী!

তোর মরণের কি আর জায়গা ছিল না, হয়তো বলবি, নইলে এ ধনদৌলত কোথা হইতে আসিত। তা অমন ধনকড়ি গলায় দড়ি, অমন কাপড় পরায় গলায় দড়ি, অমন গহনা পরায় গলায় দড়ি, ধিক তোর ছার-কপালী।'

লক্ষণীয় যে, পদ্মর ব্যঙ্গমিশ্রিত সংলাপের মধ্যে গ্রাম্যনারীর স্বভাবটি জীবন্ত হয়ে উপস্থিত হয়েছে। তার স্বল্পকালীন উপস্থিতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ পদ্মর উত্তেজক সংলাপে পুঁটুর মার রুষ্টতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে সঞ্জীব সমাজের ভয়ে সতীসাধ্বী পুঁটুর মায়ের গৃহত্যাগের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন অতি দরদ দিয়ে। গৃহছাড়ার পূর্বে পুঁটুর মায়ের মানসিক মুহূর্তটি ঘাতে-সঙ্ঘাতে স্বাভাবিক। স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চিত্রটি নৈতিক মানদণ্ডে উজ্জ্বল। লেখক কৌশলে সতীত্ব-অসতীত্বর সংস্কারটি পাঠকের চিত্তে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। লেখক এই চরিত্রটিকে ঘিরে মানবনিয়ন্ত্রণের অতীত রহস্যময় নিয়তিতাড়িত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছেন'—

সাধারণতঃ লোকে চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্টের প্রদর্শিত পথে চলিতে থাকে, মাধবীলতার মাও চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্টপ্রদর্শিত পথে চলিবেন, অর্থাৎ ভিক্ষা করিবেন, স্থির করিলেন। 'আমার অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাইবে কে।'

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে রাজা ইন্দ্রভূপ রাজভগিনী জ্যোৎস্নাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দৃশ্য অবতারণ করা হয়েছে। রাজকুমারের জন্মবৃত্তান্ত একমাত্র জ্যোৎস্নাবতীই জানতেন। জ্যোৎস্নাবতীর মুখের সমস্ত কথা তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করলেন,—'ভট্টাচার্যেরা যে-কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; রাজকুমার আমার পুত্র নহে। রানী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন—অদ্য ভট্টাচার্যদিগের আসিবার কথা আছে—এখনই আসিবেন, আমার ইচ্ছা এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লই।"

এই উক্তির মধ্যে রাজার পারত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্নেহকাতর রূপ ও অপার সারল্য পরিলক্ষিত হয় ঠিকই, কিন্তু চরিত্রটি ব্যক্তিত্ববর্জিত। রাজকুমারের জন্মবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে আবর্তন, সেই আবর্তনে রাজা নিশ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত।

রাজকুমার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজারই সন্তান। কারণ রানী যমজসন্তান প্রসব করেন। চূড়াধনের পরামর্শমত দশরথ শর্মা রাজপুত্রকে নিজের পুত্র বলে দাবী করেন। পিতম পাগল সমস্ত গ্রামবাসীকে জানিয়ে দিল। দশরথ

সিপাহীদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের জট তৈরী করতে এই কাহিনীটি একেবারেই নিরর্থক ও আজগুবি বলে মনে হয়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যাবে একদিকে জ্যোৎস্নাবতী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছেন, রাজপুত্র ও মাধবীলতার জন্মবৃত্তান্তের রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে রামী ধাই-এর মুখ দিয়ে। রাজকুমার ও পুঁটু দুজনেই যমজ সন্তান। অন্যত্র কলঙ্কের দায়ে রামসেবকের স্ত্রী, মাধবীর মা গৃহহারা হয়েছে। সমস্ত ঘটনাই নিয়তি-তাড়িত বলে পরিগণিত। লেখকের কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা ছিল না।

পঞ্চ ও ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে দেখি ব্রহ্মচারীবেশে মাতঙ্গিনী বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে জ্যোৎস্নাবতীর শ্বশুরের রাজত্ব তক্ষপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে। সেখানে গিয়ে দ্বারপাল রাঘবের সাহায্যে মাতঙ্গিনী তক্ষপুরের মহারাজ মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ব্রহ্মচারীবেশী মাতঙ্গিনীকে সম্ভবত দ্বারপাল আগে থেকেই চিনত—তারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মহারাজ মহেশচন্দ্র মাতঙ্গিনীকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছেন—'তোমার নাম মাতঙ্গিনী' ?

আলোচ্য দুটি পরিচ্ছেদে লেখক মাতঙ্গিনীর চরিত্র উদঘাটনে তৎপর হয়েছেন। তার আচরণে ও কথাবার্তায় সৌজন্য, সাহস, প্রার্থনা ও কর্তব্যনিষ্ঠা প্রকাশিত। স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শী মাতঙ্গিনী মহারাজের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। আনন্দমঠের ব্রহ্মচারীবেশী শান্তির প্রসঙ্গ এখানের স্মর্তব্য।

জ্যোৎস্নাবতী ভাইয়ের ঘর ছেড়ে চলে গেছে জেনে মহেশচন্দ্র খুবই উৎকণ্ঠিত। মহারাজ মহেশচন্দ্র মাতঙ্গিনীকে বলেন—

'তুমি অবিলম্বে সিংহশত গ্রামে ফিরিয়া যাও। তুমি গিয়ে মাকে বুঝাইয়া বল যে, তাঁহার রাজ্যে তিনি আসুন ; এ রাজ্য তাঁহার, ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই। আমি কিছু ভোগ করি না, অপব্যয় করি না। তাঁহার কর্মচারীর যাহা কর্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি।'

এই উক্তির মধ্যে মহারাজের মনের যে আলো উদ্ভাসিত হয়েছে তা হল তাঁর নিষ্কাম ভক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের দ্যোতনা সূচিত হয়েছে।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে আবার পিতমের ঘটনাকে কাহিনীর মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পিতম সিংহশত গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন। তার

সন্ধানে দু'জন অস্ত্রধারী পিছু নিয়েছে। এরা চূড়াধনের পুরাতন চর জনার্দন ও কালিদাস। পিতমকে খতম না করতে পারলে চূড়াধনের শান্তি নেই। কিন্তু পিতমকে কে খুন করবে—এনিয়ে দুজনের বচসা হতে থাকলে—পিতম সরে পড়ে। সমস্ত ঘটনাটি পরিকল্পনা মাফিক। পিতমকে হত্যা করলে চূড়াধনের পরিকল্পনা সার্থক হবে, ইন্দ্রভূপকে রাজত্ব থেকে হটাতে সুবিধা হবে—এসবই পরিকল্পনার অঙ্গ। কিন্তু কাহিনীর গ্রন্থিরক্ষায় এই সমস্ত ঘটনা বিন্দুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায় নি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে লেখক পুঁটুর মায়ের গৃহত্যাগের দিনটির কথায় ফিরে এসেছেন। যে রাত্রে পুঁটুর মা গৃহত্যাগ করল, তারপর থেকে বাড়ীর লোকজনদের সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজা প্রেরিত ঝি-চাকরানীদের কথায় পুঁটুর মায়ের চরিত্রটি যথার্থই পরিস্ফুট হয়েছে। পোষাক, অলঙ্কার, চুয়াচন্দন পুঁটুর মায়ের ভাল লাগত না, তাই সেইদিনেই সোহাগী রামসেবকের বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। সন্দেহ হয় পুঁটুর মায়ের সঙ্গেই হয়তো চলে গেছে। রাজানুগ্রহে রামসেবক প্রথমাবধি নীরব।

রাজা ইন্দ্রভূপের সঙ্গে রানীর আর বনিবনা হয়না। রানী রাজাকে সন্দেহ করে। জ্যোৎস্নাবতী রানীর জন্যেই দাদার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন হদিশ পাওয়া যায়নি। রাজা ইন্দ্রভূপ জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধানে নিজে গ্রাম গ্রামান্তরে গেলেন। কিন্তু রানীর সন্দেহ আরো প্রবলাকার ধারণ করে। রানীর কটাক্ষ ও ঔদাসীন্য রাজার যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। রাজা ও রানীর কথোপকথনে দুটি ভিন্নমুখী সত্তার সংঘাত প্রবলতর হয়ে উঠেছে। তবে জ্যোৎস্নাবতী খবর গোপন করে রেখে পাঠকের মনে কৌতুহল জাগিয়ে রাখতে সঞ্জীবচন্দ্র কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যাবে মাধবীলতার অনুসন্ধানে ইন্দ্রভূপের দেওয়ান প্রতাপপুরে এসেছে। প্রতাপপুরে এক পিসীর ঘরে পুঁটু আশ্রয় পেয়েছে। লেখক পুঁটুর [illegible] মাতৃস্নেহের সজীব চিত্র অঙ্কন করেছেন। দেওয়ানের সঙ্গে পিতমের পথে দেখা হয়েছে. মাধবী সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের অদৃষ্টবাদ পিতম পাগলের মন নিয়ে পাঠককে শুনিয়েছেন।

—"মাধবীলতা নিজে দুরদৃষ্ট, মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছে; অতএব তুমি পলাও। তুমি ছিন্নমস্তা দেখিয়াছ? আমি তাঁহারই পার্শে মাধবীকে দেখিয়াছি।" হয়তো তাই মাধবীই রাজার পতনের কারণ।

কিন্তু রানী সম্পর্কে পাগলের মন্তব্য যেমন নির্মম, প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর বর্ণনা তাৎপর্যমণ্ডিত।

"প্রকৃতিদেবী কি ছিন্নমস্তা? এই কি প্রকৃতির যথার্থ মূর্ত্তি? তাই কি জন্তুরা আপনার শাবক আপনি খায়? তাই কি রানী আপনার কন্যা আপনি নষ্ট করিতে চান? তবে হে প্রকৃতি! আমাদের কেন ঠকাও? তোমার এই যথার্থ মূর্ত্তি ঢাকিয়া কেন নিয়ত মোহিনী মূর্ত্তিতে আমাদের চোখে চোখে বেড়াও।"

বলা বাহুল্য, লেখক ভয়ংকর রহস্যময়ী প্রকৃতিকে তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করে একটি সার্থক পটভূমি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

আলোচ্য অধ্যায়ের পরের অংশ মহারাজ মহেশচন্দ্র ও রাঘব শর্মার কাহিনী যুক্ত হয়েছে। মাধবীলতার সন্ধান রাঘব সংগ্রহ করতে পারায় মহেশচন্দ্র খুশী। তবে সন্ন্যাসীবেশে জনার্দ্দনের প্রতাপপুরে আবির্ভাব উদ্দেশ্য প্রণোদিত। পিতম তা উপলব্ধি করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'তুমি কোন্ জাতীয় সন্ন্যাসী? বুঝি সামরিক?'

ত্রিংশ পরিচ্ছেদে লেখক একটি করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে জনার্দ্দনের কুটিলতা নিকৃষ্টতার চরিত্র অঙ্কন করেছেন। পুঁটুর মা যে বাড়ীতে থাকে, সেই বাড়ীতে রাত্রি-দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসীবেশী জনার্দ্দন আগুন লাগিয়ে দেয়। আবার সেই জনার্দ্দনই একশত টাকার লোভে বৃদ্ধ রামকল্প বিদ্যানিধির কথায় ভর করে একলাফে প্রজ্জ্বলিত দরজা ডিঙিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। এইসব অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা কাহিনী পরিকল্পনায় এবং চরিত্রের আচরণ ও পরিণতি প্রদর্শনে আলোচ্য পরিচ্ছেদটি আদৌ শিল্প-পদবাচ্য হয়ে উঠেনি।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদে সেই গৃহদাহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হঠাৎ একটি ভয়ানক মূর্ত্তি মাধবীকে নিয়ে এসেছে। যেভাবে আগন্তুক মাধবীকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা থেকে বাঁচান তা রীতিমত অলৌকিক।

যাই হোক আলোচ্য অধ্যায়ে মাধবীর মা অগ্নিসংস্পর্শে প্রাণত্যাগ করে। অপরিচিত আগন্তুক মাধবীলতাকে বাঁচাতে পারলেও তার [illegible] বাচাতে পারল না। লেখক বলেছেন—"মাধবীর মা [illegible]র ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, এবার লজ্জার ভয়ে দেহত্যাগ করল। লোকেরা সকলে দাঁড়াইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিল।" মাধবীর মায়ের মৃত্যুদৃশ্য করুণ। ঘটনাটিতে চমক দেবার প্রয়াস লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার দৃশ্য এই ঘটনাটির মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে।

চুরি, ডাকাতি, ঘরে আগুন-লাগানো সেই যুগ ও কালের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। অপরিচিত আগন্তুক চরিত্রের সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় লেখক সচেতনভাবেই দিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদের সমস্ত ঘটনাই অ্যাডভেঞ্চার জাতীয়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে লেখক জনার্দ্দন শর্ম্মার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে বেশী মনোযোগ দেন। বস্তুতঃ জনার্দ্দন অত্যাচারী ও লোভী এবং অধার্মিক। 'ভিলেন' চরিত্র হিসাবে সন্ন্যাসীবেশী জনার্দ্দনের চরিত্রচিত্রনে লেখক সার্থক হয়েছেন। রামকল্পের নিকট হতে জনার্দ্দনের টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যটি পরিকল্পিত। কিন্তু যথাযথ নয়। অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তিটি হলেন পিতম। পিতমই গৃহদাহ থেকে মাধবীকে রক্ষা করেন। পিতম সাধুতা ও সততার প্রতীক। আদর্শ চরিত্রের পাশে খল চরিত্রের সংযোজন সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা যায়। জনার্দ্দনের অগ্নিসংযোগ,—টাকা আদায়ের কৌশল প্রভৃতি ঘটনা তৎকালীন সমাজ-জীবনের দুর্নীতির স্বাক্ষর বহন করে।

ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদে লেখক পিতম চরিত্র অঙ্কনে রোমান্সের আশ্রয় নিয়েছেন। গৃহদাহের পরের দিন একটি পুকুর পাড়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় হস্তির উপর হাত দিয়ে পিতম রাজা মহেশচন্দ্রের শিবির দেখছিল। এমন সময় 'বৃহদ্দন্তেশ্বর' নামে একটি হস্তী তাকে দেখছিল।

পিতম হস্ত বাড়িয়ে হস্তীর গলদেশের এক স্থান স্পর্শ করে বলল, "বৃহদ্দন্তেশ্বর! এখন আমায় ছাড়িয়া দাও, তোমার রাজা দেখিতে পাইবেন।'

লেখক পিতমের পশুপ্রীতির অনন্যসুন্দর চিত্র অঙ্কন করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের আঁকা পশু ও প্রকৃতিপ্রীতি এবং শিশু স্নেহেব্যাকুল চিত্রগুলি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষণীয়। আরো লক্ষণীয় যে, পশুরা খুবই প্রভুভক্ত হয়, তারা তাদের আপন প্রভুকে ভুলতে পারে না। ঠিক তাই, পিতমকে 'বৃহদ্দন্তেশ্বর' হস্তীটি ভুলতে পারেনি। পিতম তক্ষপুরের রাজবংশের একজন পলাতক উত্তরাধিকারী তারই সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যেন হাতিটির কাজ। রাজা মহেশচন্দ্র ও পিতমের মিলনের দূত। যাই হোক ঘটনাটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো ব্যাপার বলে মনে হয়।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদটি পিতম ও রাজা মহেশচন্দ্রের মিলনের পটভূমি রূপে অঙ্কিত। পিতমই যে বিজয়রাজ তা চিনতে পেরেছেন রাজা মহেশচন্দ্র। বিজয়রাজই গতরাত্রের গৃহদাহ থেকে স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করেছিলেন। লেখক বিজয়রাজের যৌবনের সাহস, বলবীর্য ও পরোপচিকীর্ষার কথা স্মরণ করিয়ে

দিলেন। বিজয়রাজ খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারতেন—সেই বাঁশির সুরে বিজয়রাজের কথা তাঁর স্মরণে আসে।

—'রাজা দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিলেন।···যেন পিতম সুখসাগর মন্থন করিতেছে, কতই রত্ন তুলিয়া মালা গাঁথিতেছে, আদরে কাহারে পরাইতেছে ও আপনি দেখিতেছে, দেখিয়া আহ্লাদে কাঁদিতেছে।'

মহারাজ মহেশচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা একবার গিয়ে পিতমের সঙ্গে দেখা করে আসে। কিন্তু জ্যোৎস্নাবতীর সঙ্গে পিতমের দেখাসাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত রাজার সঙ্গে দেখা করা সমীচীন হবে না বলে লেখক মনে করেছেন। পিতম চরিত্রের মধ্যে যেন লেখকই আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদে জ্যোৎস্নাবতীর সঙ্গে প্রিতমের মিলন-চিত্র বর্ণিত হয়েছে। লেখক জ্যোৎস্নাবতীর উপর পিতমের প্রণয়ের গাঢ়তা ও আকাংক্ষার তীব্রতাকে প্রকাশ করেছেন শিল্পসম্মতভাবে। পিতমের প্রতি জ্যোৎস্নাবতীর প্রেমের জাগরণ মনস্তাত্ত্বিক। কোন এক বৃদ্ধার বাড়ীতে মুমূর্ষু জ্যোৎস্নাবতীকে যেভাবে বাঁচিয়ে এই মিলন ঘটানো হয়েছে তাতে কমেডির সুর বেজে উঠেছে। রূপায়ণরীতিতে শিথিলতা থাকলেও স্বাদের দিক থেকে এরূপ পরিণতি উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া, আলোচ্য অধ্যায়ে মাতঙ্গিনীর কর্তব্য-নিষ্ঠাও মানবিক আচরণ অনবদ্য শিল্পসুষমায় মণ্ডিত। জ্যোৎস্নাবতীকে সুস্থ করে তোলার মূলে মাতঙ্গিনীর অবদান অবশ্য স্বীকার্য।

সপ্ত ও অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদে দেখা গেছে পিতম বৃদ্ধার কাছ থেকে জ্যোৎস্না-বতীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। রাজা মহেশচন্দ্র ও রাঘব তাঁদের বিস্তর অনুসন্ধান করেছেন। পিতম জ্যোৎস্নাবতী, মাতঙ্গিনী ও মাধবীলতাকে নিয়ে 'বাইট পাইঠার' ঘাটের মন্দিরে বাস করছিলেন। মহেশচন্দ্রের জনক বহু অর্থব্যয় করে এই সুন্দর ঘাট তৈরী করেছিলেন নতুন গ্রাম বসাবেন বলে, কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। জনশ্রুতি যে তিনি কাশীযাত্রা করেছেন। কিন্তু 'বাইট পাইঠার' ঘাটের মন্দিরে একজন মুমূর্ষু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এই স্থানে আসাবধি জ্যোৎস্নাবতী তাঁর সেবা করত এবং পিতম তাঁর তত্ত্বাবধান করত। বৃদ্ধের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে লেখক পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন এবং কাহিনীকে ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার ক্লাইম্যাক্সে তুলেছে।

বৃদ্ধের চরিত্র পরিকল্পনা ও সংযোজন অস্বাভাবিক ও কৌতূহলপ্রদ। বিশেষত তাঁর কথায় কোথায় যেন একটি অব্যক্ত বেদনার সুর অনুরণিত হয়েছে। বাইট

পইঠার মন্দিরে পিতম ও জ্যোৎস্নাবতীর সেবায় ও যত্নে তাঁর মন-প্রাণ যখন পরিপূর্ণ তখন সে প্রায়ই বলত—

"শেষ দশায় আমি বড় সুখী হলাম, জন্মান্তরে তোমরা আমার কন্যাপুত্র ছিলে, এজন্মে আমার কেহ নাই—আছে, আমি বড় পাপী, তাই বঞ্চিত।" বলা বাহুল্য এই উক্তির মধ্যে তার পাপবোধ জাগরিত হয়েছে। এই বৃদ্ধই একদা তক্ষপুরের দেওয়ান ছিলেন, যাঁর ফন্দী-ফিকিরে বিজয়রাজ রাজ্যহারা হন এবং পুত্র মহেশচন্দ্র রাজা হন।

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে রাঘব শর্মার দ্বারা পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হয়েছে। 'যাইট পাইঠার' ঘাটে মহারাজ মহেশচন্দ্রকে নিয়ে রাঘব শর্মা উপস্থিত হয়ে কাহিনীতে চমক দেবার প্রয়াস স্পষ্ট। তখন বৃদ্ধের শেষাবস্থা। মুমূর্ষু বৃদ্ধ বলেন,—

'আমি তাঁকে এদেশ ওদেশ কত দেশ খুঁজিলাম, খুঁজিব বলে ধর্মকর্ম সকল ত্যাগ ক'রে আবার এদেশে আসিলাম, কিন্তু আর দেখা পেলেম না।"

রাঘব বৃদ্ধের কাছে এসে বলে,—

"আপনি যাঁকে খুঁজিতেছিলেন, তিনি ত আপনার কাছেই রহিয়াছেন।' বস্তুতঃ বিজয়রাজকে একবার দেখবার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। কারণ তিনি মনে মনে জানতেন বিজয়রাজ মারা যাননি। কিন্তু বৃদ্ধের চারিত্রিক পরিবর্তনের কোন সূত্র রচনা করেননি লেখক। শেষপর্যন্ত বিজয়রাজ ও মহেশচন্দ্রের উপস্থিতিতে বৃদ্ধের অন্তর্জলি করা হয়।

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর বিজয়রাজ অর্থাৎ পিতমকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দিতে চাইলে পিতম মহেশচন্দ্রকে সব দান করে চলে যায়। পরদিন তাদের কোথাও পাওয়া গেলনা। লেখক কাহিনীর মধ্যে কৌতূহল পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পরিশেষে, মূল কাহিনীর নায়ক নিয়তি তাড়িত ইন্দ্রভূপের বৃত্তান্ত উপস্থাপিত করে উপন্যাসের উপসংহার টেনেছেন। গ্রন্থের প্রথমাংশের কোন কোন পরিচ্ছেদে বর্ণনাধিক্য প্রযুক্ত কিছু নীরস হলেও শেষাংশটুকু বাস্তবিক বড়ই করুণ রসাত্মক ও মর্মস্পর্শী।

যাই হোক, কাহিনীর মধ্যে হঠাৎ উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয়েছে, মানবিক ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে কাল্পনিক বিষয়ের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে, প্লটে মানুষের প্রেম, যন্ত্রণাভোগ ও পাপবোধের কাহিনী চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু কার্যকারণ-সূত্র ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ নিপুণভাবে গ্রথিত করার কলাকৌশল শিল্পীর আয়ত্তের বাইরে ছিল।

তিন

সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কনরীতি প্রধানত নাট্যধর্মী। পাত্র-পাত্রীদের কথা বার্তায় ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো চরিত্রের চরম পরিচয় পাওয়া গেছে বিশেষ কতকগুলি ঘটনামুহূর্তের পরিস্থিতিতে, বিশেষত পিতম পাগলের ব্যক্তিত্ব-প্রবৃত্তি স্ফুটনে।

জ্যোৎস্নাবতী ছাড়া কোন চরিত্র জটিল নয় বলে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক অন্বিত হয়ে উঠেনি। উপন্যাসের কোনো চরিত্রের ক্রমবিকাশমান রূপ দেখান হয়নি। ঈর্ষাপরায়ণা ও অবিবেকী রানীর বিদ্রূপ ও কটাক্ষে রাজা ইন্দ্রভূপের আহত পৌরুষ জলে ওঠেনি।

সাধ্বী পুঁটুর মায়ের অহেতুক কলঙ্কজনিত মৃত্যু কষ্টকল্পিত। এযেন নিয়তি তাড়িত অদৃষ্টের পরিহাস, নাকি সমাজনির্দেশিত নিশ্চিত পরিণাম, লেখক তার কোনটারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নি।

রাজা ইন্দ্রভূপের ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহার অনেকটা স্বাধীন রাজার মত। রাজার চরিত্রের দুর্বলতার মধ্যে জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার কথা মনে পড়ে, অথচ জাতীয় চরিত্রের আত্মচেতনাবোধের উন্মেষ ঘটানো লেখকের চরিত্রাঙ্কনে প্রতিভাত হয়নি। ফলে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল রচনায় লেখকের নিশ্চেষ্টতা পরিলক্ষিত হয়।

'মাধবীলতা'র ঘটনাকাল আঠারশ শতকের নবাবী শাসনের অন্তে ইংরাজ শাসনের কাল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সঞ্জীবচন্দ্রের রোমান্সধর্মী মন অতীতের প্রতিবেশেই অধিকতর আকর্ষণ বোধ করত। ফলত, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই অতীতের পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বর্তমান বাস্তবকে অস্বীকার করেননি, বরং উপন্যাসের রোমান্সসুলভ পরিমণ্ডলে তাঁর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। চুড়াধন বাঙালীর অতিপরিচিত প্রতিবেশী চরিত্র। সতী সাধ্বী বাঙালী নারী পুঁটুর মা এবং জ্যোৎস্নাবতীর স্বামীভক্তি ও আনুগত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে দুঃসহ গ্লানির মধ্যে আগামী দিনের ইতিহাসে শাশ্বতকালের পথরেখা। সঞ্জীবচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে সাধ্বী পুঁটুর মা, কর্তব্যবোধদীপ্ত মাতঙ্গিনীও সতীসাধ্বী জ্যোৎস্নাবতী ও উদার পিতম পাগল, ধূর্ত চুড়াধন. তঙ্কপুরের দেওয়ান, রাজা ইন্দ্রভূপের জেদী রানী অতীতের পটভূমিকায় সৃষ্ট হলেও

অতীতের নন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অদৃষ্টবাদী ছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রও স্পষ্টত অদৃষ্টবাদী ছিলেন। ফলে সঞ্জীবচন্দ্রসৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এক অদৃশ্য মহাশক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর কণ্ঠমালা, মাধবীলতা ও জাল প্রতাপচাঁদ উপন্যাসে এবং রামেশ্বরের অদৃষ্ট গল্পে এই মহাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই রহস্যময় শক্তি মানবজীবনকে কখন কোন পথে অলক্ষ্যে চালিত করে তারই নিয়তি ও নীতির বিধান লক্ষ্য করা যায়।

রাজা ইন্দ্রভূপ চরিত্রাঙ্কনে লেখক নিয়তি ও নীতির বিধানকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদেই রাজা ইন্দ্রভূপের চরিত্রের ধর্মভীরুতা ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও উদারতা লক্ষণীয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে পিতমের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর দয়ার্দ্রচিত্তের পরিচয় সহজাত কিন্তু পিতম পাগলের কথায় তাঁর অদৃষ্ট গণনার ইঙ্গিত পরিবেশ-ঘটনায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এরপর থেকেই ইন্দ্রভূপ নিয়তিতাড়িত চরিত্র হিসাবে অতিরিক্ত মনঃপীড়ার কারণ হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে রাজা বেড়াতে বেড়াতে একটি পথের মধ্যে একটি একবছরের মেয়ের মধ্যে রাজত্ব খুঁজে পেয়েছেন। এই মেয়েটিকে উপন্যাসের উপাদান হিসেবে লেখক নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে অন্ধ নিয়তিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রাজার সঙ্গে রানীর দ্বন্দ্ব এই মেয়েটিকে নিয়েই সূচীত হয়। রাজা নিজ জীবনের দুঃখময় পরিণতির ভেতর দিয়ে নিয়তির বিধানকে মেনে নেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে রাজা ও রানীর সংলাপে মেয়েটার প্রতি উভয়ের অদৃশ্য আকর্ষণ মহাশক্তির দুর্জ্ঞেয় প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নবম, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ. পঞ্চদশ, ষোড়শ পরিচ্ছেদে রাজা ইন্দ্রভূপের অলক্ষ্য অস্তিত্ব বিরাজমান। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষ লক্ষণীয়। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে রাজা ইন্দ্রভূপের সঙ্গে জ্যোৎস্নাবতীর সাক্ষাৎকারের ঘটনাটির মধ্যে অসংযম অসহিষ্ণু রাজার চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। জ্যোৎস্নাবতীর ভ্রাতৃগৃহ ছেড়ে যাবার পর রাজার মনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। রানীর প্রতি রাজার ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকলেও রানীর প্রতি রাজার আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায় না। অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যাবে—রাজার সঙ্গে রানীর বনিবনা হচ্ছে না। এমতবস্থায় রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব কোন এক অজ্ঞাতকারণে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনা। লক্ষণীয় যে ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬,

৩৭ পরিচ্ছেদগুলিতে রাজা ইন্দ্রভূপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অনুপস্থিত।

বস্তুত রাজা ইন্দ্রভূপ চরিত্রের ক্রমবিকাশমান রূপ অঙ্কনে লেখক সচেতন ছিলেন না।

তথাপি খাঁটি ঔপন্যাসিক গুণের অভাব ছিল না সঞ্জীবচন্দ্রের। তাঁর অন্যমনস্ক ভাবুকতার মধ্যে মাঝে মাঝে কোনো কোনো চরিত্রের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে। রোমান্সের স্বচ্ছন্দ বায়ুসঞ্চরণের মধ্যে আমরা হঠাৎ আমাদের পরিচিত জীবনের হৃৎস্পন্দন অনুভব করি।

রাজার আত্মীয় চূড়াধনবাবু অনুরূপ বাঙালী একটি পরিচিত চরিত্র। মধ্যযুগের কাব্যের মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্তের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। রাজার বিরুদ্ধে চূড়াধনের ষড়যন্ত্র ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদন প্রচেষ্টা যথেষ্ট বাস্তব রসসমৃদ্ধ। প্রথম পরিচ্ছেদেই চূড়াধনের দুরভিসন্ধি ও দুষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। দেওয়ানের গৃহে আগুন লাগানোর ঘটনায় এবং তার আসল উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে গৃহদাহ থেকে দেওয়ানকে উদ্ধার করার মেকি প্রচেষ্টার মধ্যে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চূড়াধনের খলতার ও কৃপণতার লক্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে চূড়াধনের আচার-আচরণ ও মতিগতি একমাত্র পিতম পাগল পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজা ইন্দ্রভূপ সমস্ত বুঝেও উদাসীন। চূড়াধন রাজার ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থরক্ষা করেছেন। তাই সে পিতমকে সহ্য করতে পারে না। চতুর্থ পরিচ্ছেদে পিতমের উপর চূড়াধনের প্রচণ্ড ক্রোধের তীব্রতা অনায়াস লক্ষণীয়। চূড়াধন মনে মনে জলে—'পিতম আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান আমি এ পর্যন্ত আপনার কার্যসাধন করিতে পারি নাই।' দ্বাদশ পরিচ্ছেদে চূড়াধনের পিতমের প্রতি সন্দেহ ভুঙ্গে উঠেছে। চূড়াধন তার চেলাদের বলে—তোমরা পিতম পাগলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সে পাগল বলিয়া আর আমার বোধ হয় না, ধূর্তলোক বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছে।" তখন তার সহচর বলে ওঠে—আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি তাকে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে নরবলি দিয়ে আপনাকে সংবাদ দিব। চূড়াধন বলে—'তাহা হইলেই অর্দ্ধেক কণ্টক ঘুচিবে।' উপরিউক্ত সংলাপের ভেতর দিয়ে চূড়াধনের অস্তিত্ব হিংসা ও ঈর্ষায় উদ্ভাসিত। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে চূড়াধনের ইঙ্গিতে পিতমের সন্ধানে দুজন অস্ত্রধারী চর পিছু নিয়েছে। এরা হল জনার্দন ও কালিদাস। উদ্দেশ্য পিতমকে খতম করতে পারলে ইন্দ্রভূপকে রাজ্যচ্যুত করা সম্ভব হবে—এই

অভিপ্রায়ে তাদের স্বার্থপরতা ও নির্লজ্জতার স্বরূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে। মানুষের স্বার্থপরতার জন্য লেখকের বেদনাবোধ তাঁর চনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবার পিতমকে কে খুন করবে—এই নিয়ে জনার্দন ও কালিদাসের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা চললে পিতম সটকে পড়ে। লেখকের এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার মধ্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে বঙ্গ সাহিত্যিকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

পিতম ও জ্যোৎস্নাবতী উপাখ্যানটি উপন্যাসের সর্বোত্তম কাহিনী। ঘটনার বহুলতা ও চমৎকারিত্ব রোমান্সের বৈশিষ্ট্য। সঞ্জীবচন্দ্র সেই রোমান্সকে নানা দিক দিয়ে উপভোগের বস্তু করে তোলবার যারপরনাই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাঙালীর সামাজিক জীবনে অনুরূপ ঘটনা ও চরিত্র বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না। পরিচিত পরিবেশে সমকালীন যুগের মানুষের কর্মধারা যথাযথ প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। ফলে 'মাধবীলতা'র ঘটনা-নির্বাচন ও চরিত্র সৃষ্টিতে রোমান্সের আতিশয্য লক্ষণীয়। তাই তাঁর উপন্যাসের বর্ণাঢ্য অতীত পরিচিত মানবপ্রকৃতির চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তর মেলাতে পারেনি। বরং উপন্যাসের সর্বদেহে ছড়িয়ে আছে নাটকীয় তরঙ্গচাঞ্চল্য, ঘটনার বাহুল্য ও প্রতি পরিচ্ছেদে আকস্মিক গতি পরিবর্তন। অতীতযুগের পরিবেশ তৈরীর ফলে পাত্রপাত্রীর চিত্তভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। প্লট প্রধানত ঘটনানির্ভর হওয়ায় নায়ক-নায়িকার চরিত্রের অভ্যন্তরের প্রবৃত্তিগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে পারল না। রোমান্সের ঘটনাপুঞ্জের উত্তাল তরঙ্গে নায়কনায়িকাদের চিন্তাভাবনা মুহূর্তে মুহূর্তে পরিচ্ছেদে আলোড়িত হয়েছে। যার ফলে উপন্যাসের ঘটনা ও হৃদয়দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যে লেখক সুস্থির লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলেন না।

জাল প্রতাপচাঁদ

'জাল প্রতাপচাঁদ' কোম্পানীর আমলের পশ্চিমবাংলার সামাজিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ। 'জাল প্রতাপচাঁদে' গল্প গৌণ, ইতিহাস মুখ্য। স্বাদেশিক মনোভাব যা যা ইতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, সঞ্জীবচন্দ্র সেই আদর্শের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। বর্ধমান রাজকুমার প্রতাপচাঁদের কাহিনী ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের প্রহসন লেখক জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। মূল গল্পের ধারাটিকে লক্ষ্য রেখেই ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কোম্পানি শাসনাধীনে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক চিত্রাঙ্কনের দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ইতিহাস সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গবেষণাস্পৃহার একটি উজ্জ্বল শিল্পস্বাক্ষর। তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ'কে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার কারণ বর্ধমান রাজপরিবার সম্পর্কে লেখকের কৌতূহলের উৎস। বর্ধমানের নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত রাজকুমার প্রতাপচাঁদের পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি পিতৃসম্পত্তি-লাভের জন্য হুগলীর আদালতে মামলা করেন। এই মামলাকে কেন্দ্র করেই 'জাল প্রতাপচাঁদে' সঞ্জীবচন্দ্র কোম্পানির আমলের 'মেজেষ্টরী', দায়রা সেসন, নিজামত, সুপ্রিম কোর্টের বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়েছেন, অন্যদিকে মফঃস্বলের দারোগা-ম্যাজিষ্ট্রেটের যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচারের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিবরণের মধ্যদিয়ে প্রশাসন ও বিচারক্ষমতার অপপ্রয়োগের জলন্ত নজির তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র 'বর্ধমানরাজের গল্প' কাহিনীর উপজীব্য বিষয়বস্তু নয়, কোম্পানীর আমলের ধনী জমিদার সন্তানদের স্বভাবচরিত্র, খেয়াল খুশি ও ধর্মাধর্মবোধ সম্পর্কে লেখকের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা লক্ষণীয়। গল্পরসে সম্পৃক্ত হয়ে ইতিহাস যেমন একদিকে রসসিক্ত হয়ে উঠেছে, তেমনই ইতিহাসের পথ ধরেই "জাল প্রতাপচাঁদে'র কাহিনী হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। সঞ্জীবচন্দ্র বাংলার ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তির সাযুজ্যে তাঁর কাহিনীকে গ্রথিত করেছেন। এই উপন্যাসে লেখকের বাঙালী-প্রীতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

বর্ধমানের রাজাদের পারিবারিক কলহ ও বৈরিতার পাশাপাশি জমিদার-শ্রেণীর শিরোমণি মহারাজা তেজচন্দ্রের পক্ষীবিলাসের চিত্রটি অবিস্মরণীয়। এছাড়া সেই যুগের বাঙালী রাজা-মহারাজা 'প্রমারা' খেলার (তাসের জুয়া) তথ্যটি লেখক সুনিপুণভাবে উপন্যাসে সংযোজন করেছেন। রাজা মহারাজাদের পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষেরা এই 'প্রমারা' খেলায় মেতে ওঠেন। সারা বাংলাদেশ যখন এই আবিলতায় মত্ত, তারই মধ্যে কিছু সুস্থতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় সঙ্গীতচর্চা ও মল্লবিত্তার মধ্যে। আসলে, বাঙালী জাতির ইতিহাস লেখাই লেখকের প্রেরণা-উৎস। লেখক 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বকথায় তা স্পষ্ট বলেছেন—

"আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্বে গবর্নমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের বাঙালীরা কিরূপ ছিলেন তা দেখাবার নিমিত্ত আমরা জাল রাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজপত্র সেই সময় প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টি লিখিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে লেখক নিজে সেই সময়ে হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁর বয়স অল্প, কিন্তু এই মোকর্দ্দমা লইয়া ঘরে ঘরে যেরূপ হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে।"[৫]

বাস্তবিক, সঞ্জীবচন্দ্র অতি যত্ন সহকারে আদালতের নথিপত্র ঘেঁটে জাল রাজার জীবনকথা পাঠকের সন্মুখে তুলে ধরেন এবং দেশবাসীর কাছে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি নিজে বর্ধমানের Special Sub-Registrar থাকাকালীন রাজবাড়ির কর্মচারীর কাছ থেকেও এই গ্রন্থের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। বিশেষত, বর্ধমান-রাজকুমার প্রতাপচাঁদের কাহিনী একদা বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। নিরুদ্দিষ্ট রাজকুমার দীর্ঘকাল পরে ফিরে আসার পর বাঙালীর সহজাত শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে উঠে—লেখক অসহায়, বঞ্চিত রাজকুমারের জীবনালেখ্য রচনা করে সেই সহৃদয় সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। 'জাল প্রতাপচাঁদের' মামলা একসময় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা ক্ষেত্র-মোহন সিংহ, এমনকি ডেভিড হেয়ার প্রমুখ তখনকার দিনের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্য উপস্থিত হন। এঁদের জবানবন্দীর তথ্য লেখক অতি যত্নসহকারে উদ্ধৃত করেছেন। ইতিহাস নিষ্ঠা তাঁকে ইতিহাসের

পথে পরিচালিত করেছে। তবে, রসবোধের গভীরতায়, কাহিনীর বিন্যাস গঠনে জাল প্রতাপচাঁদ চরিত্রটি সত্যিই উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

লেখকের বর্ণনাভঙ্গি এমনই সরস, ভাষা এমনই সাবলীল, রচনাশৈলী এমনই মনোহর যে 'জাল প্রতাপচাঁদের' কাহিনী পড়তে বসলে শেষ না করে ছাড়া যাবে না। দক্ষ বিচারকের অসঙ্গতি যেমন তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তেমনই বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অকৃত্রিম ভাবনাটুকু অনস্বীকার্য। ইতিহাসের বাস্তবকে অনুসরণ যেমন গ্রন্থটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য চিহ্নিত করেন, তেমনটি লেখক তারই ফাঁকে সেই কালের সমাজ-জীবনের চিত্রও দক্ষ চিত্রকরের মতো চিত্রিত করেছেন। শহর কোলকাতার হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা নবাবপুত্রেরা যখন ঘুমিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, 'প্রমারা' খেলে, বুলবুলির লড়াই-খেলা দেখে আর কবি, হাফ-আখড়াই শুনে অবসর বিনোদনে সময় কাটাতেন এবং শ্রাদ্ধ-বিবাহ পূজাপার্বণ উপলক্ষে কিভাবে মুঠো মুঠো টাকা ওড়াতেন—তার পরিচয় পাই জাল প্রতাপচাঁদ গ্রন্থে। সেকালের বাঙালীর জীবনবীমার সরু-মোটা দুটি তারই অনুরণিত হয়েছে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখনীতে। নবাব-বাদশার আমোদ-প্রমোদ, খেয়ালখুশী এবং আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের জাল উদ্ঘাটন করার পাশাপাশি সঞ্জীব সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ও সংস্কারের গ্রন্থটিও উত্থাপন করেছেন। বাঙ্গালী জাতির প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যবোধই এর অন্যতম কারণ। বাঙালীজাতির ইতিহাস পুনরুদ্ধার করে লেখক যেন জাতীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থটির রচনার উদ্দেশ্য তিনি ব্যক্ত করেন :

"আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংরেজের কীর্তিকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিষ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এ'নও হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাসোপযোগী উপকরণের অভাব না হয়, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই-চারিটি কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সেইজন্য আপাততঃ জাল রাজাকে উপলক্ষ্য করা গিয়াছে।"[৬]

লেখকের এই সঙ্কল্প থেকে স্বভাবত মনে হয় যে তিনি বাঙালীর যথার্থ ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বর্ধমানরাজের কাহিনীটি গল্প হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ যৌবনে খুবই

দুর্বিনীত প্রকৃতির ছিলেন। রাজপরিবারে অকস্মাৎ বিমাতার ভ্রাতা পরাণবাবু শনি হয়ে ঢোকেন এবং রাজকুমার প্রতাপচন্দ্রকে বিতাড়িত করে নিজপুত্রকে বৃদ্ধ মহারাজার দত্তক দিয়ে বর্ধমান জমিদারীর ভার তিনি সুকৌশলে গ্রহণ করেন। ফলে একের সম্পত্তির অধিকারী হল অপরে। সম্ভবত ১৮২০ সালে পরাণচন্দ্র এইভাবে নিজপ্রভাব বিস্তার করে এবং ২৫ বছর পর ১৮৪৫ সালে এক সন্ন্যাসী বর্ধমানে এসে নিজেকে রাজকুমার প্রতাপচাঁদ বলে পরিচয় দিয়ে পিতৃসম্পত্তি লাভের জন্য মামলা রুজু করেন। রাজবাড়ীর অনেকেই প্রতাপচাঁদকে চিনতে পারলেও এবং কোলকাতার পূর্ব্বপরিচিত সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাঁকে বহু টাকা ঋণ দিয়ে ও সাক্ষ্য দিয়ে সহযোগিতা করলেও পরাণবাবু শাসকমহলে উৎকোচ দেবার ফলে সন্ন্যাসী মামলায় পরাজিত হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারে তাঁকে জুয়াচোর বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সমস্ত অধিকার, এমনকি আপীলের অধিকার, থেকে বঞ্চিত হয়ে অতি সাধারণ ভাবে কোলকাতায় শেষজীবন কাটান। জাল রাজার জীবনকথা সঞ্জীবচন্দ্র অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। রাজপুত্র ঋণী হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সঞ্জীবচন্দ্র ঘটনাবিন্যাসে ও বিশ্লেষণে যেভাবে জাল প্রতাপচাঁদ চরিত্রটি পাঠকের মনে সহানুভূতি উদ্রেক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে তাঁকে গল্পকার হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। আর, লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল,—'জাল রাজাকে পাঠকের সহানুভূতির পাত্র করে তোলা। বলা বাহুল্য—লেখকের সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'[৭]

এই প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসপ্রীতির কথা স্মরণ করতে পারি। ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শন আর বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লেখেন—'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়। তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী পরপীড়কদের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।'[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইতিহাস প্রীতি সঞ্জীবচন্দ্রকেও প্রভাবিত করেছিল। ফলে সঞ্জীবচন্দ্র এই আবেদনের দু'বছর পরেই বঙ্গদর্শনে 'জাল প্রতাপচাঁদ' ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন। বস্তুত "স্বাদেশিক মনোভাব, যা ইতিহাসকে আশ্রয়

করে গড়ে ওঠে, বঙ্কিমচন্দ্র যার প্রধান উদ্গাতা, সঞ্জীবচন্দ্র সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলন এবং প্রতাপচাঁদের কাহিনী ও মামলা প্রসঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের প্রহসন বর্ণনা করেছিলেন।[৮]

আসলে 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থটি একটি ঐতিহাসিক কাহিনীবিশেষ। বর্ধমান রাজের গল্পরূপে চিহ্নিত। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।

দুই

'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে ঘটনাসংস্থাপনে ও কৌতূহলরক্ষায় লেখকের পারদর্শিতা লক্ষণীয়। প্রথম পরিচ্ছেদে 'পূর্বকথা' প্রবন্ধে বর্ধমানরাজের জনপ্রিয়তা পাঠকের চিত্তে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। পাঠকও জাল প্রতাপচাঁদের গল্প জানবার জন্য মনে মনে দারুণ ইচ্ছা পোষণ করে। কাহিনীর সূচনায় গল্পকারের সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন ডকুমেণ্টারি ফিল্মের মধ্যে কাহিনীর ভাবরস, নাটকীয়তা ও গল্পকারের সহানুভূতি থাকলে তথ্যনির্ভর দলিলচিত্রও দর্শকের হৃদয় কেড়ে নেয়, তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রের ইতিহাসনির্ভর 'জাল প্রতাপচাঁদে'র কাহিনীও পাঠকের হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। গল্পের আরম্ভে শিল্পীহৃদয়ের সব দাক্ষিণ্য 'জাল প্রতাপচাঁদের' উপর বর্তেছে। লেখকের গল্প জমানোর রীতিটি লক্ষণীয়। লেখকের গল্পবলার কৌশলে ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্ব গল্পরসে সরস হয়ে উঠেছে ও ইতিহাসের চিহ্নিত পথ ধরে কাহিনী হয়ে উঠেছে চমকপ্রদ।

সঞ্জীবচন্দ্র কাহিনীবিন্যাসকে ২৫টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে পটভূমি ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর একটি পরিচ্ছেদ চরিত্র বা ঘটনার সংযোজনে গল্পের একাগ্রতা রক্ষা করে নামকরণ করা হয়েছে। গল্পের মেজাজের দিক থেকে তা' কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে। কাহিনীর অভ্যন্তর—চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে পশ্চাৎপটের সম্পর্কসূত্র গ্রথিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ধমান-রাজের পশ্চাৎপটের কাহিনী গল্পের অভিপ্রেত স্বাদকে পুষ্ট করে তুলেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ধমানের বুড়ো রাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের কাহিনীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের 'বিয়ে-পাগলা' রাজার চরিত্রটি যথেষ্ট নাট্যকৌতূহল ঘনীভূত করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'কুমার বাহাদুর' প্রতাপচাঁদের শৈশবের দুরন্ত জীবনের ভূমিকা গড়ে তোলা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ছোটরাজা হিসাবে কুমার বাহাদুরের দুর্বিনীত উচ্ছৃংখল

ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি পরাণবাবুর কূটকৌশলের প্রয়োজনীয় গ্রন্থি লেখক অঙ্কিত করেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতাপচাঁদের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজপুত্রের গ্লানি ও বিবেক দর্শনের প্রতিক্রিয়া যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি মৃত্যুরহস্য পাঠকমনে অতিরিক্ত কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নামকরণ 'আলোক শা'। আলোক শা' নামে এক সন্ন্যাসী বর্ধমানে আবির্ভাবের পরে গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র ও প্লটের উপর বেশ প্রভাব পড়েছে। 'আলোক শা'কে বর্ধমানের অনেকেই 'ছোট মহারাজ' বলে চিহ্নিত করেন। ছোট মহারাজের বন্দীজীবনের দুঃখদুর্দশা ও নিজের সম্পদ হতে বঞ্চিত হবার কথা ও পরাণবাবুর চক্রান্তের রহস্যজালের গ্রন্থি লেখক উন্মোচন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ধমান যাত্রাকালে কোম্পানী আমলের ইংরেজ ক্যাপ্টেন লিটিলের নির্দেশে জাল প্রতাপচাঁদের নৌকা, বজরা আক্রমণ ও নিদ্রিত লোকজনকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করার বীভৎস ছবি আঁকা হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে ওগিলবি সাহেবকে আসামী করার অজুহাতে কোম্পানী রাজত্বের বিচারবিভাগের বিবরণের মধ্য দিয়ে প্রশাসন ও বিচারক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগের অখণ্ডনীয় নজীর তুলে ধরেছেন লেখক। নবম পরিচ্ছেদে হুগলীর মেজেস্টর (ম্যাজিস্ট্রেট) সামুয়েল সাহেব কর্তৃক জাল প্রতাপচাঁদকে অপদস্থ ও হয়রানি করার উদ্যোগ নিয়েছিল তারই ঘটনাবহুল প্রসঙ্গের অবতারণ করেছেন লেখক। হুগলীর জেলে জাল প্রতাপচাঁদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অঙ্কিত। দশম পরিচ্ছেদে জালরাজার মোকর্দ্দমা আরম্ভ দেখানো হয়েছে এবং জাল প্রতাপচাঁদ যেহেতু মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম অসৎ উপায়ে ব্যবহার করেছে, সেইহেতু তাঁকে আসামী ক'রে হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একাদশ পরিচ্ছেদে দায়রার কার্যপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে এবং আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষীদের হাজির করে বিচারব্যবস্থার ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্বেচ্ছাচারের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গবর্নমেণ্টের সাক্ষী হিসাবে বর্ধমানের কালেক্টর টাওয়ার সাহেব (C. T. Trower), গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারি প্রিন্সেপ সাহেব (H. T. Prinsep), বোর্ডের মেম্বার প্যাটল্ সাহেব (James pattle), বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের উপস্থিতির ঘটনা পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আসামীর পক্ষে স্কট সাহেব (Robert Scott), রিডিলি সাহেব (John Ridley) বিবি হেরিয়াট বিটিং, বিবি সফিয়া ক্রেন, জন

মার্শাল (ব্রিগেড মেজর) চন্দননগরের ফরাসিস ক্রানস্থয়া মুলিমন, চুঁচুড়ার হাজি আবু তালে, ডেভিড হেয়ার (David Hare), সালিখার গোলকচন্দ্র ঘোষ, রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ প্রমুখ বহু ব্যক্তির জবানবন্দীর মধ্য দিয়ে সর্বত্যাগী রাজপুত্রের প্রতি সাক্ষ্যদানে সহজাত শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রতাপচাঁদের মৃত্যুরহস্য উন্মোচনে লেখক ইতিহাস মন্থন করে সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জাল রাজা গোয়াড়ীর কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কিনা তার যুক্তি দিতে গিয়ে লেখক অনেক যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণ করেছেন। ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদে কালনায় জমিয়ৎবস্ত হয়েছিল, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে জালরাজার আত্মকথা লিপিবদ্ধ করে নায়কের মানস বিপর্যয়ের গভীরতা ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়কের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতিরূপ চিত্রিত হয়েছে। প্রতাপ-চাঁদের উচ্ছৃংখল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে লেখক এই পরিচ্ছেদে প্রয়োজনীয় গ্রন্থি উন্মোচন করেছেন। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে হুগলীর জজসাহেব (দায়রায় হুকুম) জাল প্রতাপচাঁদের পাঁচ বৎসর, ন্যূনকল্পে তিনবৎসর কারাদণ্ডের হুকুম দিয়ে নিজামত আদালতে পাঠিয়ে দেওয়ার কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে জাল প্রতাপচাঁদের সঙ্গীসাথী অন্যান্য আসামীর প্রতি দায়রার রায় ও সেই বিচারের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসঙ্গতির দিকটির আলোকপাত করা হয়েছে। বিংশ পরিচ্ছেদে খুনী ওগিলবি সাহেব বারংবার খুনের আসামী হিসাবে অপরাধী হয়েও কিভাবে মুক্তি পান লেখক তারই বিচার প্রহসনের ইঙ্গিত দান করেছেন। একবিংশ পরিচ্ছেদে নিজামত আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারব্যবস্থার পক্ষপাতিত্ব এবং নিরপরাধ জালরাজার প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জালরাজা সমস্ত অধিকার এমনকি আপীল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে সাধারণ মানুষের বিচারে কিভাবে জালরাজা নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন, তারই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে লেখক জালরাজাকে ধর্মপ্রণেতা হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং 'সত্যনাথ' নামে ভক্তসমাজে পরিচিত হন। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে জালরাজার শেষজীবন ও মৃত্যু অশ্রু অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে অঙ্কিত করে লেখক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিন

জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর ঘটনা ও চরিত্রগুলি প্রায় সমস্তই ইতিহাস আশ্রিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) প্রকাশের কাল থেকেই বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যাত্রা শুরু হয়। বঙ্কিমকাল থেকেই মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় জোয়ার আসে এবং স্থানীয় ইতিহাসকে অবলম্বন করেই বঙ্কিম সমকালীন লেখকগণ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পশ্চাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দেশের অতীত অধ্যায়ের চিত্র পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরাই ছিল লেখকদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাঙালীমানসে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতাচেতনা উদ্দীপন ঘটাতে বঙ্কিম যেমন সচেষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি সঞ্জীবচন্দ্র 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। সঞ্জীবচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধই উপন্যাস রচনার প্রেরণা। সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণায় লেখক উপন্যাস করেননি। তথ্যের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যে জাল প্রতাপচাঁদ যথার্থ শিল্প পদবাচ্য হয়ে উঠেনি। ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে অবিকৃত রেখে গল্প রচনা করতে চেয়েছেন। ফলে ঘটনা-সংস্থানের অসঙ্গতি অনিবার্যভাবে উপন্যাসগঠনে শৈথিল্য এনেছে। আকৃতিতে উপন্যাস হলেও প্রকৃতিতে কোম্পানির আমলের সামাজিক অবস্থার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। নবাবী রাজত্বের অবসানকালে একটি সংকটপূর্ণ সামাজিক জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন সেই যন্ত্রাণাকাতর রূপটি এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনা বর্ধমানের রাজপুত্র জাল প্রতাপচাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর মামলা ও পরিণামে রাজপুত্রের কারাবাস। বৈমাত্রেয় মামা পরাণবাবুর কার্যকলাপ বর্ধমানরাজের কাহিনীর সূত্র ধরেই সম্পৃক্ত। আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে বাঙ্গালী চরিত্রে অধঃপতনের চিত্র চোখে পড়ে, বীর্যহীন বাঙালী ধর্মের ভণ্ডামীতে আত্মশক্তি ক্ষয় করে মানুষকে বঞ্চিত করার চিত্র যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি দাসত্বের চরম স্তরে আত্মসমর্পণ করে বাঙ্গালী আত্মবিলুপ্তির পথ বেছে নিয়েছিল—তারই করুণতম চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। কোম্পানীর দৃষ্টি ছিল শোষণের দিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' উপন্যাসে সেই কালের

বিক্ষুব্ধ ইতিহাস চিত্রণ অনস্বীকৃত হয়েছে। অথচ সেই যুগের চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজা নন্দকুমার, অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা'[২০] ও 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ'[২১] গ্রন্থে মহারাজ নন্দকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দের উপর অত্যাচারের কাহিনী যেমন বর্ণিত হয়েছিল তেমনি সঞ্জীবচন্দ্র জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনীর মধ্যে বর্ধমান রাজের প্রতি অবিচার ও কোম্পানি রাজত্বের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

জাল প্রতাপচাঁদের অভিশপ্ত জীবনকাহিনীই আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। লেখকের উদ্দেশ্য এই গ্রন্থের আরম্ভ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের জালপ্রতাপচাঁদ চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পূর্বকথায় প্রকাশ পেয়েছে। পাঠকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে লেখকের বর্ণনায় প্রতাপচাঁদ যেমন একদিকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি মাতুল পরাণবাবুর আসল রূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

'এ অঞ্চলের স্ত্রীলোক মাত্রেই জালরাজার পক্ষপাতিনী হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা ভুলিয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাইত। প্রতাপচাঁদের 'জয় হউক' বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত।

ভিক্ষুকদের গীত বালকেরা শিখিয়া পথেঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইত। 'পরাণবাবু, হয়ে কাবু, হাবু-ডুবু খেতেছে'—এই গীত যখন তখন যেখানে সেখানে শুনা যাইত।"

প্রতাপচাঁদের সঙ্গে মাতুল পরাণবাবুর প্রথম পরিচ্ছেদেই ভিক্ষুকদের গানের মধ্যে দিয়ে ব্যাক্ত করে রাজপরিবারের দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হয়েছে। কোম্পানীর আমলে বাঙলাদেশের কি হাল হয়েছিল লেখক তা স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করেছেন। পরিচ্ছেদের মধ্যে দীর্ঘ একটি অনুচ্ছেদে জাল প্রতাপচাঁদের প্রসঙ্গে বাঙ্গালী জাতির জীবনযাত্রা ভাগ্য ও শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো বিশেষ তাৎপর্যসাধনে এই অংশকে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন—

'—বাঙালী তখনও সজীব, তখনও দশহাজার লোক একজনের নিমিত্ত একত্র চীৎকার করিতে পারিত। পেনাল কোডের ভয়ে হউক, অথবা অন্য কারণে হউক, এখন দশজন লোকের কণ্ঠ একত্র স্ফূর্তি পায় না। মানুষের নিমিত্ত একত্র চীৎকার আর শুনা যায় না।'

জাল প্রতাপচাঁদের দুর্গতির পাশাপাশি দেশের মানুষের অসহায় অবস্থার কথা লেখকের বর্ণনাগুণে যেমন পাঠকের অন্তঃকরণ স্পর্শ করেছিল, তেমনি

প্রতাপের মৃত্যুরহস্য গোপন করে কৌতূহল বা নাটকীয়তা সৃষ্টি করে ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে গল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে লেখক কাজে লাগিয়েছেন।'

প্রতাপচাঁদ কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়ে মহাপাপগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য চৌদ্দবৎসর অজ্ঞাতবাস করে ফিরে আসার মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্যমুখী পরিকল্পনা অতিশয় প্রকট হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রতাপচাঁদের প্রতি সদাজাগ্রত সহানুভূতি প্রকাশের মধ্যে লেখকের বীরপূজা ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতাপচাঁদের বৃদ্ধ পিতা তেজচাঁদের আচার ও আচরণে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরে দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক। অসচ্চরিত্র, অবিবেচক অমিতব্যয়ী বিয়েপাগল মহারাজ তেজচাঁদের কাহিনীর উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রতাপচাঁদ চরিত্রের কোন অনিবার্য যোগ রচিত হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে লেখক কিছু কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন।

বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের একমাত্র পুত্র—প্রতাপচাঁদ। মহারাজের সাতটি বিয়ে। রানী নান্‌কী দেবীর গর্ভে প্রতাপচাঁদের জন্ম। মহারাজের আরেক রানীর নাম কমলকুমারী। কমলকুমারীর ভাই হলেন গল্পের অন্যতম ধূর্ত চরিত্র পরাণচাঁদ। তিনি 'বিয়েপাগল' রাজাকে হাত করবার জন্য নিজের সুন্দরী কন্যা বসন্তকুমারীকে তাঁকে সম্প্রদান করেন। পরাণচাঁদের এই কাণ্ড দেখে বর্ধমানের লোকজন যেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় তেমনি যুবক প্রতাপচাঁদের মনকে জোরে নাড়া দেয়—তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন যেন লেখক।

বর্ধমান রাজার পূর্বপুরুষেরা বাঙালী ছিলেন বলে লেখক পাঠক-মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন। অবাঙালী পরাণচাঁদের ছেলেকে বুড়ো রাজার পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করার পর থেকেই বর্ধমান রাজগোষ্ঠী বাঙালী বলে গণ্য হতে চান না। তার পরিচয় বিবৃত হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

কলকাতার রাজামহারাজার সঙ্গে বর্ধমান রাজ মহারাজা তেজচন্দ্রের আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসনের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে 'প্রমারা'র অনিবার্য পরিণাম পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক। ফলে কোম্পানির আমলের তৎকালীন বাঙলাদেশের সামাজিক অবস্থার বিস্তৃত রূপদান করেছেন লেখক।

"প্রমারা খেলায় উন্মত্ত করে, দিনরাত্রি কখন আসে, কখন যায়, তাহা খেলওয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রমারা খেলা নাই, তাই এখনকার

লোক মদ খায়।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একটি অনুচ্ছেদে তৎকালীন সমাজের বাঙলাদেশের 'aesthetic culture' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে, 'কবি' ও নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের কার্যকারিতার উল্লেখ করে লেখক জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় দিয়েছেন।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে বিষয়ের যতটা বৈচিত্র্য ও ব্যপ্তির সমাগম ঘটেছে, ততটা জটিলতা আসেনি। তবে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের চারিত্রিক শৈথিল্য ও কামনালোলুপতার মধ্যে তৎকালীন সামাজিক অধঃপতনের বিষময় ফল দেখিয়েছেন লেখক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক কুমার প্রতাপচাঁদের বাল্যকালের কথা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যা চরিত্রবোধের বিশেষ সহায়ক। তাছাড়া, তাঁর চরিত্রের অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ বাস্তবোচিত। অল্প বয়সেই মাতৃহারা প্রতাপচাঁদের প্রতি লেখকের অনুকম্পা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পিতামহী বিষণ্ণকুমারীর আদরে যে প্রতাপচাঁদ গোল্লায় গিয়েছিল তার ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করে গল্প ফেঁদেছেন লেখক।

প্রতাপচাঁদ কোন অকার্য করিলে রানী বিষণ্ণকুমারীর ভয়ে কেহ তাহাকে কোন কথা কহিতে পারিত না। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং রাজা তেজচন্দ্র কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। সুতরাং কুমার বাহাদুর আলালের ঘরের দুলাল হইয়া দাঁড়াইলেন। কাহাকেও ভয় করিতেন না, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। এই বীজ অর্থাৎ দুর্দম ইচ্ছা, তাহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। ইচ্ছা দমন করতে শেখেন নাই।”

আলোচ্য পরিচ্ছেদের অন্য অনুচ্ছেদে বিমাতা কুসুমকুমারীর সহোদর পরাণচাঁদের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা মানুষেরই প্রবৃত্তিতাড়িত। বাস্তবিক ইতিহাসের এই চরিত্রটি রক্তমাংসের মানুষেরই মত,—কোনো তত্ত্বের প্রতিরূপ নয়।

“একা বিমাতা নয় বিমাতার সহোদর পরাণবাবু প্রতাপকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ যাহা জানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে যে একদিন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।” লক্ষণীয় যে, প্রতাপচাঁদের বাল্যলীলার ঘটনার বিবরণ মাত্র আছে। পিতামহীর আদরে প্রতাপচাঁদ

লেখাপড়া না শিখে দুরন্তপনায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন, লেখক তা দ্রুতলয়ে বলে গেছেন। ফলে পাত্রপাত্রীর সহযোগে তা জীবনীকাহিনীর রূপ পেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ছোটরাজার কীর্তিকলাপের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। যৌবনোদ্গমে তার বলিষ্ঠতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলার কুস্তিচর্চার কথা উল্লেখ করেন। প্রতাপকে একজন কুস্তিগীর পালোয়ান রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে কোম্পানি আমলের বাঙ্গালা দেশের চিত্রটি পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার কুস্তি, বাঙালীর ফৌজ, বাঙালীর যোদ্ধা ও বাঙালীর ইংরেজ বিদ্বেষের চিত্র গ্রন্থের ঘটনাকালের পটভূমি রচনায় সহায়ক হয়েছে।

জাল প্রতাপচাঁদকে মূল ঘটনার নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করে লেখক কেবল ঐতিহাসিক বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেননি, পরন্তু প্রতাপচাঁদের চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও ঔদার্য পাশাপাশি চিত্রিত করেছেন।

"প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে বড় পরিপক্ক ছিলেন। লোকে বলে তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুত ছিলেন।.... তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন। (৪ পরিচ্ছেদ)।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের অন্যান্য অনুচ্ছেদে রাজা প্রতাপচাঁদের সঙ্গে পরাণবাবুর (বিমাতার ভাই) খলতা, হিংসার চিত্র পরিস্ফুটনে লেখকের কৌশল লক্ষণীয়। পরাণচাঁদের লোভ ও নীচতা, প্রবঞ্চনা, অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা, প্রভৃতি দিকগুলি উজ্জ্বলাকারে চিত্রিত হয়েছে। পরাণচাঁদের চক্রান্তে প্রতাপচাঁদ রাজ্য থেকে বঞ্চিত হোন এবং তাঁর নিজের ছেলেকে বর্ধমানরাজের গদিতে বসানর ব্যবস্থা করেন। তার চরিত্রের গতিবিধি মূলত রাজপরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পশ্চাতে পরাণচাঁদের কৌশল গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। আগেই বলা হয়েছে পরাণচাঁদ তার ভগিনীকে বৃদ্ধরাজা তেজচন্দ্রকে অর্পণ করেছিলেন। লেখক পরাণচাঁদের নীচতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে জানালেন—'কিছুকাল পরে, এক নতুন চাল চালিলেন। তাঁহার এক পরম সুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা তেজচাঁদকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারানী বসন্তকুমারী

বলিয়া পরিচিত।” (৪ পরিচ্ছেদ)

এরপর থেকেই প্রতাপচাঁদের আশংকার কারণ হয় পরাণবাবু। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব থেকে তাঁর চরিত্রের যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় এই ঘটনার পর থেকে। লেখক প্রতাপচাঁদের জীবনে চরম সংকটের অশনিপাত ঘটিয়েছেন। পরাণচাঁদের অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায় প্রতাপচাঁদ বলেছিলেন অষ্টমগর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হইবে, যদি পরাণ ততদিন জীবিত থাকে, আমার গদিতে পরাণের পুত্র বসিবে এবং তোমরা একথা লিখিয়া রাখ।”

এই উক্তির মধ্য দিয়ে পরাণচাঁদ সম্বন্ধে তাঁর দুর্বলতা অতিমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের এই সহজাত চেতনা সত্ত্বেও চিত্ত সংযমে নিজের শক্তি সম্বন্ধে ছোটরাজা (প্রতাপচাঁদ) আস্থাবান আদৌ ছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদেই প্রতাপচাঁদকে বিষয়ী মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করার নজির লক্ষ্য করা যায়। ছোটরাজা হিসাবে প্রতাপ দাম্ভিক প্রকৃতির হলেও তাঁর বিষয়বুদ্ধির অভাব ছিল না। তিনি বিশাল বর্ধমানের জমিদারী রক্ষা করার জন্য ‘কথিত আছে, ১৮১৯ সালের ৮ আইন[১২] যাহাকে সচরাচর ‘অষ্টম’ আইন বলে, তাহা প্রতাপচাঁদ নিজে উদ্ভাবন করেন।

তাঁরই কৌশলে আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করে নেন এবং অন্যান্য জমিদারদের জমিদারী এই আইনের বলে রক্ষা পায়।

এই পরিচ্ছেদের শেষের অনুচ্ছেদের প্রতাপচাঁদ মদ্যপায়ী ও দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন বলে লেখক জানিয়েছেন। ফলে পিতা তেজচাঁদ বাহাদুর পুত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেন। প্রতাপচাঁদের এই অধঃপতন আকস্মিক নয়। কিন্তু লেখক প্রতাপচাঁদের চরিত্রে কলংকলেপনের জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করেননি, বরং ভালোমন্দে মিশ্রিত রক্তমাংসে গড়া প্রতাপচাঁদের চরিত্রের সর্বাঙ্গীন প্রকাশের জন্য লেখকের সহানুভূতি সদাজাগ্রত। সেই যুগে কুমার কৃষ্ণনাথের মতো জাল প্রতাপচাঁদের অভিশপ্ত জীবনের মর্মন্তুদ পরিণামের চিত্র অঙ্কনই লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রসঙ্গক্রমে এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে লেখকের বক্তব্য ও মন্তব্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের মত। কোম্পানি আমলের সমাজের মানুষের আচার-আচরণ, স্বভাবদোষ, ধর্মাধর্মবোধ, শঠতা ও খলতার

কথা লেখক প্রবন্ধাকারে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

'যেখানে সমাজের সকলেই অতি নীচ, সেখানে নীচ ব্যক্তিই টিকিবে; নীচ ব্যক্তিরই উন্নতি হইবে। উচ্চ-প্রকৃতির লোক সে সমাজে প্রধানত্ব পাওয়া দূরে থাক্, একেবারে লোপ পাইবে। যেখানে সমাজ পবিত্র, সেখানে ধর্ম্মিষ্ঠ ও পবিত্র লোকই টিকিবে, যেখানে নীচ ও শঠ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে এবং পরিশেষে লোপ পাইবে।" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

অত্যাচার অধ্যুষিত সমাজে ধর্মের বাহ্যিক আচরণের সংকীর্ণতায় বাঙালী আত্মবিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে, তার অনবদ্য চিত্র উপহার দিয়েছেন লেখক। বাতিকগ্রস্ত পিতার অবহেলায় কিভাবে পুত্রের মৃত্যু ঘটায় তার মর্মস্পর্শী ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে লেখক প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ঘটনার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। আটাশ বছর পর্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে জমিদারী ভোগ করে হঠাৎ তাঁর জীবনে বৈরাগ্য দেখা যায়। তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন। নিরুদ্দেশের আগে তিনি তাঁর একখানি প্রমাণ তৈলচিত্র চিনারী নামে একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় চিত্রকরের দ্বারা আঁকিয়েছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর পিতা তেজচাঁদ প্রতাপচাঁদকে রাজমহল হতে ধরে আনেন। কিন্তু প্রতাপচাঁদ আগেকার মতই বিমর্ষ থাকতেন। একদিন রাজাপ্রসাদের সমস্ত ফোয়ারা খুলে দিয়ে তিনি স্নান করেন। ফলে তাঁর সাংঘাতিক পীড়া দেখা দিল। প্রতাপ বললেন—'আমায় গঙ্গাযাত্রা কর।'

জাল প্রতাপচাঁদের চরিত্রকে ব্যাপ্তি দেবার ঘটনা যোজনায় কৌশল লেখক গ্রহণ করেছেন। জাল প্রতাপচাঁদের পাপবোধ থেকে ধর্মবোধে উত্তীর্ণের প্রয়াস এই ঘটনায় লক্ষণীয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নায়কের পাপের প্রায়শ্চিত্ত[১৩] করার দুর্নিবার ইচ্ছাকে গ্রন্থকার স্বকৌশলে ব্যবহার করেছেন। নায়ক নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, নায়ক নিজের মনকে জেনেছে। প্রতাপচাঁদের বিবেক, কামনামথিত স্বার্থত্যাগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে চেয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা মাত্র। লেখক এই ইতিহাসের ঘটনাটি অবলম্বন করে বর্ধমান রাজপুত্রের আত্মত্যাগী মহিমা প্রমাণের জন্য লেখনী ধারণ করেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাঁকে পাল্কী করে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কানাত দিয়ে ঘাট ঘিরে তাঁকে অন্তর্জলি করা হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই রাষ্ট্র

হয়—প্রতাপচাঁদ পালিয়েছেন, মারা যাননি। রাজা তেজচাঁদ সমস্ত শুনে কিছুই বললেন না। সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠা হল না। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর দুই রানী বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়ে মাসোহারা টাকা পেতেন। এই সর্বস্ব হারানোর মধ্যে লেখক প্রতাপচাঁদের শুভবোধের উদয় ঘটাতে চেয়েছেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনদের একান্ত অনুরোধে বৃদ্ধ রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর পরাণচাঁদের[১৪] (যিনি একদিকে শ্যালক, অন্যদিকে শ্বশুর) অষ্টম-গর্ভের সন্তানটিকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ ক'রে মহাতাবচাঁদ নাম রাখা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসী বেশধারী প্রতাপচাঁদকে বর্ধমানে ফিরিয়ে এনেছেন লেখক। 'আলোক শা' নামধারী সন্ন্যাসী গোপন পরিচয়ের চারপাশে ঘনীভূত কৌতূহল উদঘাটিত হয়েছে। সন্ন্যাসী রাজবাটীতে প্রবেশ করে বারদুয়ারি দেখতে দেখতে গোলাপবাগে উপস্থিত হয়ে গেটের নিকট বসে রইলেন। গোপীনাথ ময়রা তাঁকে চিনতে পেরে বলে উঠলেন, 'আমাদের ছোট মহারাজ।' ছোট মহারাজ ফিরেছেন—এ সংবাদ শহরের সর্বত্র বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল। ছোট মহারাজের রানীরা একথা শুনে একজন পুরাতন দাসীকে পাঠিয়ে খবর আনালেন। দাসী চোখ মুছতে মুছতে বলল—'আর সে বর্ণ নাই, সে মূর্তি নাই, কিন্তু গালভরা সে হাসি রহিয়াছে। আহা! ছিলেন মহারাজাধিরাজ, আজ কি সন্ন্যাসী।" একজন পুরাতন মহুরী সন্ন্যাসীকে দেখে পরাণচাঁদের মেজো ছেলে তারাচাঁদকে বলেছিল—'বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যিই।' প্রতাপচাঁদকে দেখার জন্য প্রচুর ভীড় হতে লাগল। তখন পরাণবাবুর নির্দেশে লাঠিয়ালরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করে দিয়ে এল। তখন সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের বাড়ীতে গেল, রাজা তাঁকে চিনতে পেরে সসম্মানে আশ্রয় দেন। রাজা ক্ষেত্রমোহনের পরামর্শে পরাণবাবুর কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ফেরত পাবার প্রত্যাশায় বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায় তাঁর স্বাধীন ও দুঃসাহসিক ব্যক্তিত্বের আভাস দেওয়া হয়েছে। পথে তাঁকে দেখার জন্য প্রচণ্ড ভীড় হতে লাগল। বলা বাহুল্য ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। গবর্নমেন্টের রিপোর্টে বলা হল—"একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে।" লেখক সুযোগমত তখনকার বাঁকুড়া-মানভূমের জঙ্গলে লোকদের বিদ্রোহের কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে

দিয়েছেন। আর ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সেই বিদ্রোহ দমন করার অজুহাতে কৌশলে প্রতাপচাঁদকে বন্দী করে। 'বিচারে' তার ছয় মাসের কারাবাস ও খালাসের পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত জেল-জামিন। তাঁর অপরাধ তিনি নাকি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলে লোক জুটিয়েছেন, রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করেছেন ১৮৩৭ সালে তাঁর জেল থেকে মুক্তির পরে তাঁকে মহাসমারোহে দেশের রাজা মহারাজা ও জনগণ অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জানানর মধ্যে বাঙালীজাতির জীবন নব-উপলব্ধির দিকে প্রসারিত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে প্রতাপচাঁদ তাঁর কোলকাতায় বিষয়-সম্পত্তির জন্য সুপ্রীম কোর্টে নালিশ-মোকদ্দমা করেছেন। লেখক বহু নথিপত্র ঘেঁটে জাল প্রতাপচাঁদকে আসল প্রতাপচাঁদ কিনা তার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। জাল প্রতাপচাঁদকে প্রকৃত প্রতাপচাঁদ হিসাবে প্রমাণ করবার জন্য কোলকাতায় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দীর বর্ণনায় লেখকের সহৃদয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে তখন বর্ধমানের রাজা নাবালক শ্রীল শ্রীযুক্ত মহাতাবচাঁদ। তাঁর পূর্বপিতা পরাণবাবু সেই বিশাল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনিই সুপ্রীম কোর্টের মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য মদনমোহন কর্পূর নামক এক ব্যক্তিকে ভার দেন। পরাণচাঁদ চরিত্রটির মধ্যে যেমন ঈর্ষাকাতর দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি পরাণবাবু ও প্রতাপচাঁদের সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করে লেখক কাহিনীতে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন।

জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনীর সূত্রে অনেক ক্ষুদ্র কাহিনীর জাল বিস্তৃত হয়েছে। সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহের জন্য যখন প্রতাপচাঁদ বর্ধমান যাত্রা করলেন —সেই যাত্রাপথের বর্ণনার ধারায় ডেপুটি গবর্ণর এলেকজান্ডর রশের, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা, সিঙ্গুরের শ্রীনাথবাবুর সাহচর্য, ম্যাজিস্ট্রেট ওগিলবির কার্যকলাপ মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষালের সদিচ্ছা, পরাণবাবুর চর পিয়ারালালের দুর-ভিসন্ধি, কালনার দারোগা মহিবুল্লার মূর্খামি, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট স্মিথ সাহেবের নির্দেশে, ডাক্তার চিক সাহেবের ভাঁড়ামি, পাদরী এলেকজাণ্ডার সাহেবের সঙ্কীর্ণতা ও পল্টনের ক্যাপ্টেন লিটিল সাহেবের প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রতাপচাঁদের কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ডেপুটি গবর্ণর এলেকজাণ্ডার রশের অমানবিকতার একটি

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। জাল প্রতাপচাঁদ বর্ধমান যাত্রার কালে আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করলে গবর্নরের সেক্রেটারী হ্যালিডে সাহেব তা নামঞ্জুর করেন —'The prayer of this petition cannot be complied with' কোম্পানির রাজত্বে কূট ও কুশলী ইংরাজরা বণিকের বেশে ও ধর্মযাজক হিসাবে পূর্ব ও উত্তর ভারতে শোষণ জাল বিস্তার করে, এদেশের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারাকে যেভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিল তারই কাহিনী এই পরিচ্ছেদে লেখক বিবৃত করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাপ্টেন লিটিল সাহেবের লড়াইয়ের কাহিনী ও আচরণ বর্বরসুলভ। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে প্রতাপচাঁদের বজরা ও নৌকোর লোকজনকে যেভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা ও জালরাজার সোনাদানা লুঠ করা হয়েছে তা সভ্যজগতের কাছে লজ্জাকার। ইংরাজ সরকারের শোষণ ও অত্যাচারে পিষ্ট মানুষের যন্ত্রণার কাহিনীকে প্রকাশ করে লেখক শাসকদের সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন। প্রায় তিনশত মানুষ এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রতাপকে গ্রেপ্তার করার জন্যে চতুর নাজির আসাদ আলিকে পাঠিয়েছিলেন। পরাণবাবুর এইসময় একটি বিরাট লাঠিয়ালের দল ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য পাঠান। দেখা যায়, প্রতাপচাঁদের কাহিনীর সংশ্লিষ্ট সমস্ত চরিত্র শেষপর্যন্ত কোম্পানীর প্রশ্রয় ও উস্কানিতে অত্যাচারের ফলভোগী হয়। লেখক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করে কোম্পানির উস্কানি প্রমাণ করে একটি নজির উল্লেখ করেছেন। পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে—

"persons accused of being conspiration against the Government and of resistance to the constituted authorities".

জালরাজাকে শান্তিপুরে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান জেলে না পাঠিয়ে হুগলী জেলে পাঠানর মধ্যে ইংরেজ-জাতির কূটনীতির পরিচয় লেখক দেখিয়েছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদে ম্যাজিস্ট্রেট ওগলবি সাহেবের কুকীর্তির কথা উল্লেখ করে ইংরাজকর্তা ও কর্মচারীদের অত্যাচারের অমানবিক রূপটি বাস্তব দৃষ্টির নিরিখে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট ও গিলবি জালরাজার উকিল ডব্লিউ. ডি. সা (W. D. Shaw) বিনা কারণে গ্রেপ্তার করলে (British born subject) সা সাহেব জামিনে মুক্তি পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও গিলবির নামে বে-আইনি কয়েদ রাখার জন্য পুলিশ-কেশ করেছিলেন।

"এই মোকদ্দমায় এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুপ্রীম-

কোর্টের এটর্নি ও কৌসিলিদের মধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিলেন যে ও গলবির নামে খুনের নালিস আনা উচিত।" শত শত মানুষ খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েও ইংরাজ জাতিদের বিচারে 'ওগিলবি সাহেব নির্দোষী'।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে জাল প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারের কাহিনীকে অবলম্বন করে ম্যাজিস্ট্রেট ও গলবি সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতা ও শোষণবাদের মুখোশ যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি জাল প্রতাপচাঁদের জন্য দেশের মানুষের যে সহানুভূতি জেগেছিল তার পরিচয়ও লেখক দিয়েছেন। তৎকালীন ভণ্ড ইংরাজ বিচারকদের বিচারধারার প্রতি লেখকের ধারণা অনাস্থাজ্ঞাপক।

নবম পরিচ্ছেদে হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট সামুয়েল সাহেব জালপ্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ করতে যেরূপ তৎপর হয়েছিলেন, তার চিত্র বর্ণনা করেছেন। প্রখর ইতিহাসচেতনা হয়তো গ্রন্থটিকে আবৃত করে রেখেছে, কিন্তু ইংরাজদের শঠতা ও অত্যাচারের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে 'জাল প্রতাপচাঁদ' অভিনব পরিকল্পনা বটে। ইংরাজ অত্যাচারের একটি চিত্র এখানে উদ্ধার করছি—

"জাল রাজা গ্রেপ্তার হইয়া হুগলী প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার কি দুরবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছা নাই। তবে একমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে জালরাজা আর তাঁহার সঙ্গী রাজা নরহরিচন্দ্রকে দুইখানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া পুলিস দ্বারা দুইচারিধার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। যেখানে সিপাহীরা অন্ন পাক করিত, জালরাজা সেইখানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি পাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটি সিপাহীর দয়া হইল, সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটি চাল আনিয়া দিল। জালরাজা সেদিন অতি গুরুতর আহার করিলেন।" (নবম পরিচ্ছেদে)

এই পরিচ্ছেদের অন্যান্য অনুচ্ছেদ সামুয়েল সাহেবের কর্মতৎপরতা ও স্বার্থান্বেষীর দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। প্রতাপচাঁদকে জালরাজা ও জুয়াচোর হিসাবে প্রতিপন্ন করবার জন্য নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হালকেট সাহেবের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করলেন। হালকেট সাহেবের ধারণা—জালরাজা হলেন কৃষ্ণ-নগরের শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল যিনি চার-পাঁচ বৎসর নিরুদ্দেশ। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'জালপ্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান প্রভৃতি

ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সেযুগের রাষ্ট্র ও সমাজের বাস্তব রূপটি উপস্থাপিত করেছেন। প্রতাপচাঁদকে 'জালরাজা' বলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সামুয়েল সাহেব যেভাবে সংবাদপত্রকে কাজে লাগানর চেষ্টা করেছেন তাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণ সরকারপক্ষের সংবাদগুলি যথারীতি কাগজে স্থান পেত, কিন্তু আসামীপক্ষের সাক্ষীদের কোন সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

দশম পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে সামুয়েল সাহেবের তত্ত্বাবধানে জাল-রাজার মোকর্দ্দমা আরম্ভ করা হয়েছে। মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করায় তাঁকে আসামী করা হয়েছে। এ গুরুতর অপরাধের জামিন নেই। অথচ খুনের মোকদ্দমায় ও গলবি সাহেবের জামিন লওয়া হইয়াছিল. প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জামিন লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের নিমিত্ত চারিমাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল। 'লেখকের বর্ণনায় একদিকে যেমন ও গলবি সাহেবের উপর ঘৃণা-ভৎর্সনা বর্ষিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি প্রতাপ-চাঁদের উপর প্রীতি-সহানুভূতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

দেখা যায় প্রতাপের নাম ব্যবহার করার জন্য পরাণবাবু নালিশ করলেন না অথচ গবর্ণমেন্টের কেন এত গরজ তা সত্যিই কৌতুকাবহ। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর পরাণবাবুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতখানি বিস্তারলাভ করেছিল, লেখক তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদেই চিনারী সাহেব কর্তৃক প্রতাপচাঁদের প্রমাণচিত্র পত্রখানি হুগলীর আদালতে আনা হয়েছিল। 'ছবিখানি' ও মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী, নির্লোভ নিরপেক্ষ সাক্ষী।' লেখক 'হরকরা (Hurkura) পত্রিকা থেকে সেই তথ্য সংগ্রহ করে পাঠককে উপহার দিয়েছিলেন 'Some cuaious evidence transpired concerning the 'portrait' that novel mute witness".

গবর্ণমেন্ট জাল প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য সেক্রেটারী প্রিন্সেস, সদর দেওয়ানীর জজ, হ্যাচিনসন, বোর্ডের মেম্বর প্যাটাল, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ থেকে সাধারণ সরকারী কর্মচারীদিগকে হুগলীতে পাঠান। প্রায় ৩০০ আসামীর মধ্যে জালপ্রতাপচাঁদ সহ মাত্র ৭ জনকে দায়রার সোপর্দ করবার মধ্যে সামুয়েল সাহেবের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন লেখক। প্রতাপচাঁদ সম্পর্কে তিনটি প্রধানতঃ চার্জ ছিল। (১)

জালরাজার সনাক্ত (২) প্রতাপচাঁদের মৃত্যু (৩) জালরাজা গোয়াড়ীর কৃষ্ণলাল কিনা। শেষে সামুয়েল আরেকটি চার্জ বাড়িয়ে দেন—(৪) কালনায় জমায়েত।

একাদশ পরিচ্ছেদে দায়রার কার্যপ্রণালী ত্রুটিবিচ্যুতির কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। (১) ২০শে নভেম্বর মোকদ্দমার দিন ধার্য হয় কিন্তু কোন কারণে তার পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ ১৯শে নভেম্বর মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। (২) এই মোকদ্দমায় দায়রার গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করার জন্য বিগনেল নামক একজন সাহেবকে ১৯ তারিখে যথারীতি হাজির করানো হয় অথচ আসামী পক্ষের উকিল মর্টন সাহেবকে জানানো হল না। (৩) জালরাজার মোকদ্দমা দেওয়ানীর বিচার্য, ফৌজদারীর নহে (৪) গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সাক্ষীদের যেমন-ভাবে উপস্থিত যেমন স্থযোগ-স্থবিধা বা দণ্ড থাকত, আসামীপক্ষের সাক্ষীদের তেমন কোন স্থযোগ দেওয়া হয়নি। আসামীপক্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাক্ষী দিতে এলে তাঁদের জজসাহেব কটুক্তি করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ফলে বহু সাক্ষীই সাক্ষ্য দিতে সাহস করতো না। (৫) ডাক্তার হ্যালিডে বর্ধমানের রাজবাটির চিকিৎসক ছিলেন। একবার তিনি প্রতাপচাঁদের উরুস্তম্ভ অপারেশন করেছিলেন। তিনি জানতেন—'আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।' ডাক্তার হ্যালিডে সরকারী কর্মচারী। তাঁকে সরকার নির্দেশ দিলেই আসামী পক্ষের সাক্ষ্য দিতে আসতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উদারতার পরিচয় দেননি। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ইংরাজ সরকারের কারসাজি উপস্থাপিত করেছেন।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যারা সাক্ষ্য দেন, তাঁদের পরিচয় ও চরিত্র দ্বাদশ পরিচ্ছেদে চিত্রিত হয়েছে। বর্ধমানের কালেক্টর প্রতাপচাঁদের ছবি দেখে বলেন—"প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল।" এই উক্তির মধ্য দিয়ে কালেকটর সাহেব তাঁর বক্তব্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন গ্রন্থকার। যে ডাক্তার হ্যালিডে একবার বলেছিলেন 'আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ", তিনিই দায়রায় বললেন—"আসামী কোনক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।" ডাক্তার হ্যালিডের কথাবার্তায় যে আচরণ পরিলক্ষিত হয়, তাতে ইংরাজদের মতো স্বার্থপর জাতির পক্ষেই সম্ভব। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী প্রিন্সেপ সাহেব, বোর্ডের সদস্য প্যাটেল সাহেব, দেওয়ানী আদালতের জজ হাচিনসন সাহেব, চুঁচুড়ার গবর্ণর ওবায়রেক সাহেব, বাবু

দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, হুগলীর সদর আমিন হারকুটস সাহেব, রাজকৃষ্ণ বসাক, পরাণবাবুর সাকরেদ রাধামোহন সরকার, বসন্তলালবাবু, মোহনলালবাবু, ভৈরবনাথবাবু ও পরাণবাবুর আত্মীয়স্বজন, চাকর-বাকর প্রভৃতি বহু সাক্ষী সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে প্রতাপচাঁদের বিপক্ষে মুখর হয়ে ওঠেন। লেখক যেন বিচারকের আসনে বসে লক্ষ্য করছেন যে ইংরাজরা কিভাবে পরাণচাঁদকে ক্রীড়নকরূপে গ্রহণ করে আপন স্বার্থসিদ্ধি করেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আসামীপক্ষের সাক্ষীদের কাহিনী স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্যদানে প্রতাপচাঁদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও উন্মোচিত হয়েছে। তথাকথিত স্বল্প পরিচিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানে মানুষ প্রতাপচাঁদের ঘটনাবহুল জীবনের জটিল জাল যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার স্কট-সাহেবের সাক্ষ্যদানের মধ্যে প্রতাপচাঁদের জেলজীবনের কষ্টকর জীবন থেকে ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও স্বভাবচরিত্রের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। রিডিলি সাহেবের সাক্ষ্যদানে রাজবাটির একটি বিশিষ্ট ঘটনা ও প্রতাপচাঁদের স্মৃতিশক্তি নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। চন্দননগরের ক্রানস্বরা সুলিমানের সাক্ষ্য দানে প্রমাণিত হয়েছে যে নীলকুঠী ক্রয় করার ব্যাপারে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি ঘটে। চুঁচুড়ার একজন মোগল হাজি আবু তালেব, ফরাস-ডাঙ্গার ডাক্তার জুলিয়াস নইটার্ড, সাক্ষী হিসাবে তাঁদের সওয়ালে প্রতাপচাঁদকে ছোটরাজা বলে চিহ্নিত করেন। ফরাসডাঙ্গার ম্যাজিস্ট্রেটের জবানবন্দীতে পাওয়া যায় যে প্রতাপচাঁদ লাহোরে বেশ কিছুদিন ছিলেন। সালিখার গোলকচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্যদানে জানা গেল যে তিনি প্রতাপচাঁদকে ইংরাজী পড়াতেন। রাজবাড়ীর গোপীমোহন ময়রা বলেন যে ছোটরাজা মারা যায় নি, পালিয়েছিলেন। পল্তার ঘাটমাঝি রামধন বাগ্দী চিনতে পারেন। ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপে থাকত যে আগা আশ্বাস, সে বলল—"এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ।" সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডেভিড হেয়ার তাঁর সুচিন্তিত সাক্ষ্যদানে আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলে স্বীকার করেছেন। রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের জবানবন্দীতে প্রতাপচাঁদের নিরুদ্দেশ জীবনযাত্রার একটি অধ্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। লাহোরে রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। জাল প্রতাপচাঁদের চরিত্রবিশিষ্টতার বিচিত্র পরিচয় অবশ্য এই ব্যাপক সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতাপচাঁদের পক্ষে কয়েকশত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেও জজসাহেবের মত

ফিরেনি। এবং বিচারের নামে প্রহসন নিদর্শন ও বিচারক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। জাল প্রতাপচাঁদের উকিল সা সাহেবের বক্তব্যে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। "উপস্থিত ফৌজদারী মোকদ্দমায় দেওয়ানীর প্রমাণ অনাবশুক। যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচহাজার সাক্ষী আপনাকে সোনাক্ত করিলেও জজসাহেবের মত ফিরিবে না।" (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কিনা তার রহস্য উদ্ধারে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুরহস্য বর্ণনায় মধ্যে এ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শ আছে। পরাণবাবুর আত্মীয়স্বজন ও রাজবাড়ীর সাক্ষী রাধারমণ সরকার, বসন্তলালবাবু, নন্দবাবু, ভৈরববাবু প্রমুখ পনের জন ব্যক্তির জবানবন্দীতে জানা গেল—"১২২৭ সালের ২১শে পৌষ রাত্রি দেড়-প্রহরের সময় কালনার রাজবাটি হইতে প্রতাপচাঁদকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়। তখন বড় অন্ধকার। পৌষমাসের রাত্রে বড় শীত। সেই শীতে প্রতাপচাঁদকে জলের নিকট রাখায় তাহার কম্প আসিল, কাজেই তাঁহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া যাইতে হইল। তাঁবু সেই স্থানে জলের ধারেই পূর্ব্বেই খাটান হইয়াছিল। তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। এদিকে প্রতাপচাঁদ পালংকে শুইয়া হাতী, ঘোড়া, ধন, ধান্য দান করিতে লাগিলেন। দানকরা হইলে তাঁহার অন্তর্জলি করা গেল। মোহনবাবু তাঁহার পা জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে ঘাঘিরাম তাহার মুখাগ্নি করেন।" সাক্ষীদের এই জবানবন্দীতে জজসাহেবের বিশ্বাস হয়েছিল। প্রতাপচাঁদকে গঙ্গাযাত্রা করা হয়েছিল ঠিকই' কিন্তু তিনি মারা যাননি। জালরাজার স্বীকারোক্তি—"যেকোন পীড়া আমি অনুকরণ করতে পারি, কবিরাজেরা সে অনুকরণ ছন্দাংশে বুঝিতে পারিবে না।"

পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে জালরাজার কথা কতদূর গ্রাহ্য তা প্রমাণ করবার জন্য লেখক নানা জ্ঞানগর্ভ তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে লেখক কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন। ডাক্তার টানার সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Practice of Medicine, 6th Edition' থেকে নানা আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনার উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দেহের উপর মনের একাধিপত্য অসাধারণ। লেখক প্রসঙ্গক্রমে যোগশাস্ত্রের কথা, হঠযোগের কথা বিশ্লেষণ করে জালপ্রতাপচাঁদের মৃত্যুকে

অস্বীকার করেছেন। জালরাজারও নিশ্চিত হঠযোগের অভ্যাস ছিল, পীড়ার ভাণ করবার ক্ষমতা ছিল। একটি রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ চিত্র অংকন করতে গিয়ে, জালপ্রতাপচাঁদকে বাঁচাতে গিয়ে লেখক লক্ষ্যচ্যুত হননি। ব্যক্তিগতজীবনের ব্যর্থতা, সঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে কি জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তার জলন্ত উদাহরণ পাওয়া যায় প্রতাপচাঁদ চরিত্রে। যৌবনে তাঁর বিমাতা মহারানী কমলকুমারী তাঁকে দুবার আহারের সময় বিষ খেতে দেয়। পরাণচাঁদ ও বসন্তবাবু তাঁর ক্ষতি করার নানা উপায় উদ্ভাবন করে। তারপর থেকেই প্রতাপচাঁদ প্রচণ্ড মদ খেতে আরম্ভ করে ও অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপকার্যে লিপ্ত হয়। প্রতাপচাঁদ জজের কাছে জবানবন্দীতে বলেন—আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম, শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্থ হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস।'[১৬]

প্রতাপচাঁদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ইতিহাসের এক অভিশপ্ত নায়কের সুখদুঃখ, ভালমন্দমিশ্রিত জীবনের পটভূমি লেখক ইঙ্গিতে উন্মুক্ত করেছেন। পিতাপুত্রের স্নেহ-ভালবাসা, মান-অভিমান, যন্ত্রণা ক্রোধ; অবহেলা-ঘৃণা প্রভৃতি ভাবের সংঘাতগুলি নায়কের মুখ দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি প্রতাপচাঁদের চিত্তদাহের আবেগ—গাঢ়রূপ ধরা পড়েছে জজসাহেবের কাছে জবানবন্দীতে। লেখক কৌশলে ভাগ্যের নিষ্করুণ অনিয়ন্ত্রিত ভূমিকার কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতাপচাঁদের জন্য সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে লেখক জালরাজা গোয়াড়ীর কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কিনা তার ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে বার করতে চেয়েছেন। ফকিরচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র, গঙ্গাপ্রসাদ প্রমুখ একুশজন সাক্ষীর আজেবাজে জবানবন্দীতে প্রমাণিত হয় যে জালপ্রতাপচাঁদ হলেন গোয়াড়ীর কৃষ্ণলাল। কোম্পানির আমলের একটি যুবক চাকরি না পেয়ে ব্রহ্মচারী সেজে বুজরুকী করতেন, তার কাহিনী ঘটনাচক্রে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তে মূল গল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কারণ অদৃষ্ট শনিরাজের মত যে ব্যক্তিটি জালরাজাকে কৃষ্ণলাল বলে প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর, সেই পরাণবাবু বাঁকুড়ায় জালরাজা গ্রেপ্তার হলে পাদরী উইয়র সাহেবের নিকটেও দূত পাঠিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনমত সাক্ষী সংগ্রহ করে

তার মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। বিভিন্ন সাক্ষীর বিচিত্র জবানবন্দীতে অসঙ্গতি লক্ষণীয়। এছাড়া, জজসাহেবের দুমুখো রায়ের জন্য লেখক বিচার-ব্যবস্থার উপর শ্লেষমিশ্রিত বিদ্রূপ কটাক্ষ বর্ষণ করেছেন। জজসাহেব রায়ে লিখেছিলেন—"জাল রাজা যে কৃষ্ণলাল, একথা একপ্রকার প্রমাণ হইয়াছে। আবার বললেন—প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাঁহার শবদাহ যখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদে কালনায় 'জমিয়ৎবস্ত' হয়েছিল কিনা লেখক তা আলোচনা করেছেন। যে জজসাহেব একসময় বলেছিলেন—'কালনায় জমিয়ৎবস্ত অতি সামান্য ব্যাপার সেই জজসাহেবই মহিবুল্লা দারোগা ও নাজির আসাদ আলির প্ররোচনায় এবং কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দীতে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। লেখক দক্ষ গবেষকের মতো আদালতের নথিপত্র উদ্ধার করে জালরাজার প্রতি অবিচার করা হয়েছে তা প্রমাণ করেছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে জালরাজার নিজ-কথা উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রতাপচাঁদ তাঁর জীবনের অদৃষ্টনির্ভর বিড়ম্বিত আত্মকাহিনী নিজেই ব্যক্ত করেছেন। বৈচিত্র্যময় আত্মকাহিনীটি সরলরেখায় গ্রথিত। আসামীর পক্ষ থেকে প্রথমে তাঁর দুই রানী কেন সাক্ষ্য দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং পরে আবার তাঁরাই কেন পরাণবাবুর কথায় সাক্ষ্য দিতে রাজী হলেন, তার কার্যকারণ ব্যক্ত করেছেন নায়ক। রানীদের আচরণের মধ্যে প্রাচীন সংস্কার-ধর্মে বিশ্বাসী সতীত্ববোধ প্রকটিত—"বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রানীরা মিথ্যা বলিয়াছে এবং হয়ত সেই কারণে জজসাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলংকের পসরা মাথায় লইব।"

যাই হোক জালরাজার নিজ কথার মধ্যে একটি লিখিত ফর্দে তাঁর চতুর্দশ বৎসর নিরুদ্দেশ জীবনযাত্রার বিবরণী দান করেছেন। কালনা হতে পালিয়ে তিনি সারা ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরে ধর্মপথেই জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে অসত্যকে গ্রহণ করে আত্মদলনের পথ ধরেননি। রানীদের প্রতি তাঁর অনুকম্পা বা আস্থা আদৌ কম ছিলনা। তাঁর আত্মকাহিনীতে ইতিহাসের এই ঘটনাটি লেখকের সহানুভূতিলাভে অনবদ্য। জালরাজার উক্তিতে তা পরিস্ফুট—

জালরাজা উকিলকে বলিলেন—"এবার পরাণের অনুরোধে রানীরা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছে। সে অনুরোধের অর্থ এই যে, তাঁহারা আমাকে সোনাক্ত না করেন, কিন্তু কি জানি, স্ত্রীজাতি আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাঁহারা সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না।"

প্রতাপচাঁদের চরিত্র বস্তুত ইতিহাস অনুসৃত। প্রতাপের শৌর্য ও বীর্যের পাশাপাশি তাঁর নির্লোভ ও নিস্পৃহ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গঙ্গা-যাত্রাকালে তিনি ইচ্ছা করলে পোষ্যপুত্র বা দানপত্র কিংবা উইল করে যেতে পারতেন। কিন্তু তা' না করে তিনি বিখ্যাত চিত্রকর দিয়ে তার একখানি প্রমাণ সাইজ প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। এতে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।

প্রতাপচাঁদ তাঁর জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা লিখে রাখতেন। কোন এক মুহূর্তের ভুলের জন্য স্ত্রী ও বিষয়সম্পদ থেকে পরিত্যক্ত চতুর্দ্দশ বৎসরের নিরুদ্দেশ জীবনযাত্রার করুণ চিত্র প্রতাপচাঁদের জীবনকথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কোম্পানির রাজত্বে আমলাতান্ত্রিক জালে সত্য কিভাবে মিথ্যায় পরিণত হয়, তার পরিচয় লেখক নিশ্চিত করে পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে যে দায়রার হুকুমের সঙ্গে কাজির বিচারের মত-অনৈক্য হওয়ায় জজসাহেব নিজামত আদালতে প্রতাপচাঁদের রায়ের প্রতিবেদন জানানর মধ্যে তার অক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। নিরপরাধের প্রতি অবিচার ও বিচারব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন লেখক।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ৩১০ জন আসামীদের প্রতি দায়রা সেসনের রায় অসঙ্গতির স্বাক্ষরবাহী। হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট সামুয়েল্‌স সাহেবের চরিত্রে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৩১০ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ৭ জনকে দায়রায় সেসনে সোপর্দ্দ করা হয়, কিন্তু বাকী ৩০৩ জনের সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেওয়া হয়নি, অথচ তাদের খালাসও দেওয়া হয়নি। এই আচরণ ন্যায়নীতিবোধে কলংক আরোপ করবে। এই সমস্ত নিরপরাধ আসামীরা অন্নবস্ত্রের অভাবে দিন গুনত। উকিলদের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁদের প্রতি প্রতাপচাঁদের অকৃত্রিম মমত্ববোধে নায়কের দয়াধর্ম প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটেছে। গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে কাহিনীর গ্রন্থন সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বত্যাগী

এক বাঙালী রাজপুত্রের ঔদার্য ও মহত্ত্ব লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সরকারের কাছে সমস্ত বন্দী-আসামীদের জন্য জাল প্রতাপচাঁদের করুণ আবেদন অবিস্মরণীয়—'Their whole crime consisted in believing me to be Rajah Pratap chand, if I am an Imposter, as alleged I am guilty of having deceived them, and I may therefore be to punishment'.[১৭]

এ তথ্য ঐতিহাসিক সত্য। সঞ্জীবচন্দ্র সেই সত্যকে উন্মোচনে তৎপর হয়েছিলেন।

প্রতাপচাঁদের আবেদনে ৩১০ জন আসামীর মধ্যে ১৪০ জন মুক্তি পেয়েছিল। বাকী ১৫০।১৬০ জন বেআইনীভাবে জেলখানায় বন্দী রাখার জন্য প্রতাপচাঁদের নির্দেশে তার উকিল সা সাহেব ওগিলবি সাহেবের নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন। এই পরিচ্ছেদে প্রতাপচাঁদের কাজ ও কথার প্রতিটি অংশ চরিত্রের বিচিত্র প্রবৃত্তির ভাবতরঙ্গগুলি প্রকাশ পেয়েছে। দয়া, মায়া, কর্ত্তব্যের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের দুঃসাহসিকতা লক্ষণীয়। মানুষের জীবনের ঘটনা স্বাধীন নয়—প্রবৃত্তিতাড়িত। এই সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য ইতিহাসের এক সর্বহারা বাঙালী রাজপুত্রের কাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপন্যাস লিখতে উৎসাহী হলেন সঞ্জীবচন্দ্র।

বিংশ পরিচ্ছেদে ওগলবি সাহেবকে পুনরায় কেন খুনের মোকর্দ্দমার আসামী করা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। (১) বেআইনীভাবে আসামীদের জেলে আটক রাখা (২) তাদের অন্নবস্ত্র না দেওয়া (৩) ছয়মাসের অধিককাল জেলে থাকলে নাকি বিচার করা আইনত নিষেধ, (৪) প্রতাপচাঁদ সহ আরো ৬ জনের বিরুদ্ধে দায়রায় আসামী হিসাবে সোপর্দ করা হয়েছিল —ম্যাজিস্ট্রেট ওগিলবি সাহেব তার কোন প্রমাণ নিজে নেননি বা পাঠাননি। (৫) কালনায় হত্যাকাণ্ডের পর প্রতাপচাঁদের উকিল সা সাহেবকে গ্রেপ্তার প্রভৃতি ঘটনার সন্নিবেশে সে যুগের রাষ্ট্র ও কোম্পানির কর্মচারীদের নিপীড়নের নিষ্ঠুর বাস্তব কাহিনী বর্ণিত।

তবে সা সাহেবকে বেআইনীভাবে গ্রেপ্তার ও কয়েদ রাখার জন্যই সুপ্রীম কোর্ট ওগিলবি সাহেবকে অপরাধী করে দুহাজার টাকার জরিমানা করেন। এই মামলায় ওগিলবি সাহেবের যেমন কু-কীর্তি প্রমাণিত হয়, তেমনি জালরাজার মোকদ্দমার কিছু কিছু উপকার হয়। লেখক পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাতে

সুপ্রিমকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার এডওয়ার্ড রায়ানের ওগিলবি সাহেবের বিরুদ্ধে রায় উদ্ধৃত করেছেন :

„James Balfour Ogilvy—it is my painful duty to pass the sentence of this court upon you, you have been found guilty of false imprisonment of prosecutor Mr. Shaw".

কিন্তু প্রধান বিচারক স্যার এডওয়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট ওগিলবি সাহেবকে কয়েদ দেন নি। কারণ কোম্পানীর ম্যাজিস্ট্রেটরা অবিচার ও অত্যাচার করলে দণ্ড দেবার লোক ছিল না। লেখক ইতিহাসের সেই চিত্র উদ্ধার করেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদে লেখক জালরাজার বিপক্ষে নিজামত আদালতের হুকুম সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করেছেন। নানা অভিযোগে অভিযুক্ত প্রতাপচাঁদকে জেলে পুরে রেখে নিশ্চেষ্ট করার চেষ্টা হয়েছিল। কালনায় লোক জমায়েতের ব্যাপারটি সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক ইতিমধ্যেই নাকচ করে দেওয়া হয়। নিজামত আদালতের রায়ে অন্যের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জাল প্রতাপ চাঁদের একহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয়মাসের কারাদণ্ড হয়। এছাড়া, অন্যান্য অভিযোগ হতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রতাপচাঁদের নিজামত আদালতে কাছে লিখিত অভিযোগ : (১) কোন আইনে এ মোকর্দ্দমা নিজামত আদালতে সোপর্দ্দ করে। (২) মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করলে কোন গ্রন্থে অপরাধ হয় বলে লেখা আছে ? (৩) কোন আইনমতে তাঁর একহাজার টাকা জরিমানা হয়েছে ? নিজামত আদালতের মামলা প্রসঙ্গের বিবরণদানে লেখকের ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত আদালতের কাজি সাহেবের 'ফতওয়া' তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য প্রতাপচাঁদের আদালতে লিখিত প্রশ্নের মধ্যে যে যুক্তি, তর্ক ও সংশয় পরিলক্ষিত হয়, তাতে গ্রন্থকারের জীবনদর্শন সক্রিয়।

জালরাজা নিজামত আদালতে লিখিত অভিযোগের দরখাস্ত পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে লেখক সেই পরিণাম বিশ্লেষণ করেছেন। নিজামতের হুকুমের রায় এরূপ—'বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, জালরাজা প্রতাপচাঁদ নহে, সুতরাং প্রতাপচাঁদ বলিয়া তিনি কোন দরখাস্ত করিলে আর গ্রহণ করা যাইবে না।" ফল হল (১) দেওয়ানীতে প্রতাপচাঁদ বলে সম্পত্তি দাবী করার আর্জি দাখিল করতে পারবে না। (২) প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করলে তিনি দণ্ড পাবেন। দরখাস্তখানির মধ্যে ইংরেজ-বিচারের

প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রূপ ও রাগ অভিব্যক্ত হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে সাধারণ মানুষের চোখে জালরাজার বিচার লেখকের অভিনব পরিকল্পনা। সঞ্জীবচন্দ্র সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখেননি। জাল প্রতাপের বিচারের নামে এই যে প্রহসন—সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তা সাধারণ মানুষের মর্ম স্পর্শ করে নি। কেউ কেউ মন্তব্য করে "জালরাজা সত্যিই প্রতাপচাঁদ; এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।" কেউ বলে—"যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে, তবে পরাণবাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য জুয়াচোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব্বসঞ্চিত ধন ব্যয় করিবেন কেন?" কেউ বলে—যদি এব্যক্তি সত্যিই জাল হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যয়ে পরাণবাবুর মোকদ্দমা চালাইবে কেন?…গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে জানিতেন যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রণজিৎ সিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন। রণজিতের স্বপক্ষ ব্যক্তি এখন বাঙ্গালীর মধ্যে বসিয়া অতুল ধনসম্পত্তি অধিকার করিলে ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে।" আবার যাঁরা ধর্মভীরু তাঁদের মধ্যে কেউ ভাবল—"ধর্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম ধর্ম, মিথ্যা।" যারা অদৃষ্টবাদী তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছিল—'অদৃষ্টই মূল। সকলই অদৃষ্টদোষে ঘটে। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না, তাহাও অদৃষ্টের দোষে।" কর্মফলবাদীরা বললেন—"যেমন কর্ম তেমনই ফল।"

বস্তুতঃ লোকমণ্ডলীর কথাবার্তায়, আচরণ ও কৌতুকে লেখক প্রতাপচাঁদ চরিত্রের মধ্যে যেমন উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি লোক মনস্তত্বের বিশ্বস্ত প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন। পরাণচাঁদের ষড়যন্ত্রে ও কোম্পানীর অবিচারে প্রতাপচাঁদ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে জেনে জনগণ সন্তুষ্ট নন বরং ক্ষিপ্ত। আবার শাস্ত্রের প্রতি এদের অন্ধ আনুগত্য, ধর্মীয় সংস্কার, কতখানি প্রবল, তেমনি দেশের বিচারবিবেচনা, আইন-কানুন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ততখানি সচেতন। 'কেনা সাহেব' সম্বন্ধে তাদের কৌতুকপ্রিয়তা দলবদ্ধ মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের রূপ ধরা পড়ে। 'কেনা সাহেবের' সহায়তায় পরাণচাঁদের যেমন পোবমাস, তেমনি 'কেনা সাহেবদের' কৌশলে জালরাজার সর্বনাশ ঘটেছে লোকমণ্ডলী তাই মনে করে। কোম্পানির প্রতি তাই সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা। লেখক সাধারণ মানুষের বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন।

'ধর্মপ্রণেতা'[১৮] হিসাবে জালপ্রতাপচাঁদের কথাবার্তা, চালচলন, আলাপ-আলোচনা ও আচারব্যবহারের মাধ্যমে শক্তিমান পুরুষের লক্ষণ চিহ্নিত হবার যোগ্য। ব্যক্তিচিত্তের যন্ত্রণা ধর্মীয় আদর্শবাদের আচরণে আত্মগোপন করেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বত্যাগী এই মানুষটিকে 'সাক্ষাৎ দেবতা' বা 'গৌরাঙ্গদেব' বলে অভিহিত করার মধ্যে লেখকের আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আবার, আলোচ্য পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে পণ্ডিত, জ্ঞানীগুণী ও রাজনীতিবিদ প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে সমকালীন যুগের বিশ্বপরিস্থিতি আলোচনা করতে তাঁর উৎসাহ অফুরন্ত ছিল। তবে লেখকের প্রতাপচাঁদকে সর্ববাসনা-মুক্ত ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস অপরিহার্য নয়।

পঞ্চবিংশ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদে জালরাজার মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। প্রতাপচাঁদ চরিত্রের অনিবার্য পরিণতির বিবরণে লেখকের ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ নিপুণভাবে যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে মানবিক কাহিনীতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। যিনি নতুন ধর্মের উদ্গাতা, যিনি শিষ্য-শিষ্যাদের নিকট 'সত্যনাথ'[১৯] বলে পরিচিত। স্বভাবতঃ তাঁর শত্রু অনেক। সেই সমস্ত শত্রুরা তাঁর মূর্তির সামনে সশ্রদ্ধ। "জালরাজার মূর্তি বড় প্রশস্ত ছিল। যে দেখিয়াছে, সেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে।" জালরাজার আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও সৌজন্যবোধের মধ্যে ইতিহাসের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে সামাজিক বাস্তব-মানুষের কথার সুর শোনা যায়। জীবনের শেষার্ধে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁদের কাছে তাঁর একমাত্র আর্তনাদ—'আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।" জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত ইতিহাসের নায়ক প্রতাপচাঁদ তীব্র বেদনা বুকে নিয়ে ১[illegible]/৫৩ সালের প্রথমার্ধে ময়রাডাঙ্গায় প্রাণত্যাগ করেন। সর্বত্যাগী, আদর্শবাদী ও নিষ্ঠাবান বর্ধমান রাজকুমার লেখকের সহানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল—"তাঁহাকে জাল-রাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এইজন্য আমরা তাহাকে ভক্তি করি।" (২৫ পরিচ্ছেদ)

মানুষ অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। প্রতাপচাঁদের কার্যকলাপ ও ঘটনা-সংঘাতে কোন অজ্ঞাত শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে, লেখক তা পাঠককে ভুলতে দেননি।

চার

বস্তুতঃ লেখকের লেখার কৌশল 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসের মত চিত্তা-কর্ষক হলেও প্রকৃতিতে তা বাংলাদেশের কোম্পানীর আমলের সামাজিক ইতিহাস। নবাবী রাজত্বের একটি সংকটপূর্ণ সামাজিক অবস্থার বর্ণনায় লেখকের সহানুভূতিশীল মন কাজ করেছে। তথ্যের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য, 'জাল প্রতাপচাঁদ'কে উপন্যাস হিসাবে শিল্পপদবাচ্য করা যায় না। তিনি প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে এবং ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে অবিকৃত রেখে গল্প রচনা করেছেন। ফলে অনিবার্যকারণে ঘটনাসংস্থানে ও চরিত্রচিত্রণে গ্রন্থটিকে ইতিহাস আবৃত করে রেখেছে। তথাপি 'জাল প্রতাপচাঁদ' ইতিহাস কাহিনী হইলেও লিখিবার গুণে উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।"[২০] কারণ, ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি লেখকের প্রাণের টান যেমন সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি ইতিহাসের গূঢ় সত্য উদ্ধার করে নায়কের জীবন চিত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিবেশনে লেখকের কৃতিত্ব অনায়াস লক্ষণীয়। গ্রন্থটি অনেকটা জীবনীমূলক। বর্ধমান রাজকুমারের অভিশপ্ত কাহিনী। প্রতাপচাঁদের তেজস্বিতা, খলন, আত্মসম্মানবোধ, সততা, ধর্মের প্রতি আসক্তি ইত্যাদি চিত্রণের মধ্যে বাঙ্গালীর হিন্দুত্ববোধ ও শক্তিপ্রদর্শনের কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসটি উল্লেখ্য। 'সীতারামে' বাঙালীর বাহুবল ও হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থে ঘটনার প্রত্যক্ষ উত্তেজনা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। বিশেষত আদালতের সাক্ষ্যদানব্যবস্থা পদ্ধতি—দুটি পরিচ্ছেদে যেভাবে ইতিহাসের বৃত্তান্তকে সাজিয়ে গল্পটি স্তরে স্তরে উদ্ঘাটন করা হয়েছে মোকদ্দমার সময়ে—তাতে ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে ধরে রাখার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসকার যে পদ্ধতিতে ঘটনাপরম্পরা বিবৃত করেন সঞ্জীবচন্দ্র সম্ভবতঃ সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কাহিনীগ্রথনে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণে উপন্যাসসুলভ রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। কাহিনী থেকে সোজাসুজি ইতিহাসে প্রবেশের কৌশল, ঘটনা, চরিত্র ও বর্ণনার গতিকে মন্থর করে তুলেছে। প্রতাপচাঁদকে কেন্দ্র করে অনাবশ্যক ভাবে গ্রন্থের বিস্তৃতি যেমন ধর্মপ্রণেতা হিসাবে ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি একদিকে শিষ্যাদিপূজিত ও অন্যদিকে বেশ্যাদি পরিবৃত ব্যক্তিগত জীবন

ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থের মূল বিষয়কে বিঘ্নিত করেছে। তথাপি সেই যুগে বাস্তব জীবনপটে অঙ্কিত গ্রন্থটির আবির্ভাব অভাবনীয়। একমাত্র খল চরিত্ররূপে পরাণবাবু বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। তার আচার-আচরণ অনেকটা স্বাভাবিক।

তবে এই গ্রন্থে লেখক চরিত্রচিত্রণে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই যুগে কোম্পানীর সরকারী কর্মচারী নরপিশাচ ম্যাজিস্ট্রেট ওগিলবি ও সামুয়েলের মত ঐতিহাসিক চরিত্রের উদ্ঘাটন ঘটিয়ে গ্রন্থটিকে উপন্যাসের মত বৈচিত্র্যময় করে তোলা হয়েছে। কালনার মূর্খ দারোগা মহিবুল্লা চরিত্রটি অঙ্কনে লেখকের সুস্থ হাস্যরসের যোগ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতি, ভণ্ডামি ও বিজাতীয় মনোভাব ও আচরণের প্রতি লেখকের বিরূপ কটাক্ষ আভাসিত হয়েছে। 'কেনা সাহেব'দের চরিত্রাঙ্কনে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। ইতিহাসের তথ্যপঞ্জীকে অনুসরণ করে 'কেনা সাহেব'দের অর্থলোলুপতা (বিশেষতঃ ওগিলবি সাহেবের) ও সামুয়েল সাহেবের বিচারের নামে অত্যাচারের অমানবিক রূপটি লেখক যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছেন। কোম্পানির আমলের স্বার্থপর ইংরাজদিগের অর্থলোভ ও অন্যায়পূর্বক নরহত্যা (কালনায়) শত শত অসহায় নিরপরাধিনী নারীকে গ্রেপ্তারের মর্মস্পর্শী চিত্র উপস্থিত করেছেন, যা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। একটিমাত্র পরিচ্ছেদে (জাল-রাজার আত্মকথা) প্রতাপচাঁদের হৃদয় ব্যাকুলতা ও অনুশোচনার মর্মান্তিক চিত্র সংক্ষেপে অঙ্কিত। চরিত্রের স্খলনের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আত্মগোপনের সংকল্পে তাঁর বিবেকদংশন অতি তীব্রতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। লেখক যথার্থ ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে বাঙালী জাতির জীবনের সমগ্রতার ও বিশালতার সুর আনতে চেয়েছেন। প্রতাপচাঁদকে দেখার জন্য হুগলী-বর্ধমানের পথেঘাটে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ ভক্তেরদল ও জাল-রাজাকে ঘিরে বেশ্যার দল এবং অগণিত সাক্ষীসাবুদ প্রভৃতি বিচিত্রশ্রেণীর মানুষ ভীড় জমিয়েছে। পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে উদ্বেল জনতার চিত্র অঙ্কনে লেখক নিঃসন্দেহে তাদের প্রাধান্য দিয়েছেন।

কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রের গভীরতা জটিলতা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে 'জালপ্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে অনুপস্থিত। ভারত-ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এক বাঙালী রাজপুত্রের ত্যাগ ও মহত্বের কাহিনী বিন্যাসে বিচিত্র মানুষের জীবন ও ভাগ্যের বিপুল ঐকতান বাজলেও 'জালপ্রতাপচাঁদের' আত্মোদঘাটনে তাঁর হৃদয়-বিপর্যয় প্রসঙ্গ যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয় নি, অথচ তার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে

ক্ষতবিক্ষত প্রতাপচাঁদকে 'ধর্মপ্রণেতা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্ব মানসিকতাও প্রতিবিম্বিত। কাহিনীটি নিঃসন্দেহে ঘটনা-বহুল। কিন্তু শিল্পমূল্যের বিচারে উপাখ্যানের বিন্যাস খুব উচ্চস্তরের নয়। তবু বর্ধমান রাজপরিবারের মামলা-মোকদ্দমার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রতাপচাঁদের ছায়াময় ব্যক্তিত্ব অঙ্কনে লেখকের একটি আগ্রহমূলক কাহিনী-বয়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

নির্দেশিকা

১। 'মাধবীলতা' উপন্যাসখানি সঞ্জীব সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ (১২৮৫-৮৭) সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মাধবীলতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে (ইং ২০ এপ্রিল, ১৮৮৫), পৃঃ ১৮৭

২। যোগেশ্বরী, বাং ১৩০৪ সাল, ইং ১৮৯৮, পৃঃ ৬০৪, মোট ১২টি খণ্ডে বিভক্ত।

৩। পুণ্যপ্রভা, বাং ১৩০৩. পৃঃ ২৩৪, উৎসর্গপত্রের তারিখ ২৮শে চৈত্র ১৩০২।

৪। প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা। ১৮৮৬। সংসার সঙ্গিনী—১৮৮৫, পৃঃ ১৩৩।

৫। সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : পূর্বকথা—জাল প্রতাপচাঁদ (বর্ধমানরাজের গল্প) বসুমতী কার্যালয়, প্রকাশিত ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২।

৬। ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র শ্রাবণ সংখ্যা থেকে জাল প্রতাপচাঁদ গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে।

৭। সঞ্জীব রচনাবলীর ভূমিকা—জাল প্রতাপচাঁদ : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ।

৯। সঞ্জীব রচনাবলী : ভূমিকা—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। মহারাজা নন্দকুমার, ১৮৮৫, পৃঃ ৩৯২—চণ্ডীচরণ সেন, প্রথম সংস্করণ।

১১। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১২৯২) ১৮৮৬, পৃঃ ১০৮ ঐ।

১২। "বর্দ্ধমান রাজার জমিদারী বিস্তর তাহার খাজনা নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপচাঁদ স্থির করিলেন—গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্যবর্ত্তী জমিদারের স্কন্দে তাহা ফেলিয়া খাজনা তহসিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী পাওনাদার রাখিব। জমিদার নিয়মিত মুহূর্ত্তমধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারী নীলাম করিয়া লন আমিও সেইমত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নীলাম করিয়া সে নীলামের টাকা গবর্ণণ্টেকে খাজনা দিব। 'জাল প্রতাপচাঁদ—ছোটরাজা (পরিচ্ছেদ ৪)

১৩। সঞ্জীবচন্দ্র 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থ রচনার জন্য বর্ধমানের রাজবাড়ির কর্মচারীদের কাছ থেকে পত্রাকারে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার অনুলিপির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"প্রকৃত প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধানের বিবরণ—

যাহারা জাল প্রতাপচাঁদ কহে, তাহারা বলে যে প্রতাপচাঁদের মৃত্যু তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়া ও তাঁহার শবদাহ করিয়াছে।

অপর দলে বলে, প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত ঘটনা নহে। একদিবস তিনি তাঁহার বিমাতার গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উপবিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য নিরুদ্দেশ হন। তিনি পীড়ার ছলনা করিয়া কালনায় গঙ্গাতীরে যান ও তথায় কানাত ঘোরাইয়া তন্মধ্য হইতে গঙ্গার জলে চলে যান ও ডুব দিয়া প্রস্থান করেন। তৎপর একটি খালি কাষ্ঠের সিন্দুক প্রতাপচাঁদের শব বলিয়া দগ্ধ করা হয়। তিনি ১২ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া পুনরায় বর্ধমানে আসেন এবং জাল প্রতাপচন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।" —(বর্ধমান, ২০ জুলাই ৮২)

(সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য—গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ১০৪)

১৪। সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানের রাজবাটী থেকে পত্রাকারে পাওয়া পরাণচাঁদের জীবনতথ্য সংগ্রহ করেন। সেই চিঠির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল—"পরাণচন্দ্রবাবু ১২৫১ সালের অগ্রহায়ন মাসে মরিয়াছেন। পরাণবাবুর পিতার নাম কাশীনাথবাবু; তিনি জগন্নাথ দর্শন মানসে এতদ্দেশে আসেন। সেই সময় তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। পরাণবাবুর মাতা লোকের বাড়িতে সূতা বেচিয়াছেন (অম্বিকাচরণ দাস নামে এক ব্যক্তি খুনি বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়াছে।)

লোকে বলে পরাণবাবুও ছেলেবেলায় সূতা ও কাপড় বেচিতেন। পরাণবাবুর ভগ্নী কমলকুমারীকে দেখিয়া রাজা তেজচন্দ্র তাহাকে বিবাহ করেন। তাহার পর হইতে ক্রমশ তাহার অবস্থা ভাল হয়। কেহ কেহ বলে যে পরাণচন্দ্র কালনার নীলকুঠিতে চাকরি করিয়াছিলেন। কি চাকরি তাহার ঠিক নাই।"
—সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য—গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ১০৫।

১৫। জাল প্রতাপচাঁদের পাদটীকা : দশম পরিচ্ছেদ : Hurkura 5th September 1838.

১৬। সঞ্জীবচন্দ্র এই তথ্য পেয়েছিলেন বর্ধমানের রাজবাড়ীর কর্মচারীদের কাছ থেকে। ১৮৮২ সালের ২০ জুলাই একপত্রে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে এই তথ্য সরবরাহ করা হয়। "এক দিবস তিনি তাঁহার বিমাতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উপবিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের নিরুদ্দেশ হন।"

(সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য—গোপালচন্দ্র রায়। পৃঃ ১৯।

১৭। জাল প্রতাপচাঁদ ১৯ পরিচ্ছেদ পাদটীকা।

Extract from petition dated 30th November 1838.

১৮। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে জালরাজাকে ধর্মপ্রণেতা হিসাবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন লেখক। জালরাজা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শেষজীবনে ধর্মপ্রণেতা হিসাবে বেঁচে থাকাটা তার ব্যক্তিগত জীবনের বিষাদের ছায়া ফেলেছে।

১৯। "শেষদিকে তিনি 'সত্যনাথ' নামে ভক্তসমাজে পরিচিত হয়েছিলেন এবং বোধহয় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ আদর্শ প্রচার করে বহু শিষ্য-শিষ্যা জুটিয়ে নিয়েছিলেন"।

—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সঞ্জীব রচনাবলী—ভূমিকা পৃঃ ৩৪

২০। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৫ম সংস্করণ, পৃঃ ২৪০।

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'[১] বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ভ্রমণকাহিনী বলে পরিচিত। তাঁর ভ্রমণকাহিনীটি 'বঙ্গদর্শনে' ছ'টি পৃথক পৃথক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। তিনি 'প্রমথনাথ বসু' নামের আদ্যক্ষর 'প্র. ন. ব.' এই সংক্ষেপিত ছদ্মনামে রচনাটি প্রকাশ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৪৬-৪৮ বছর। ছদ্মনামের আড়ালে সম্ভবত তিনি বৃদ্ধত্বের মুখোশ পরেছিলেন।

'পালামৌ' রচনার ১৬/১৭ বছর পূর্বে (১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ) সঞ্জীবচন্দ্র যৌবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে 'পালামৌ' প্রদেশে[২] যান, তখনকার ভ্রমণ-স্মৃতি এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত। কিন্তু যৌবনে পালামৌ তাঁকে আকৃষ্ট করে নি, তাই চাকরি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন ১৮৬৬ সালের প্রথমার্ধে। সঞ্জীবের বয়স তখন ৩২ বছর। সঞ্জীবের পালামৌ ছেড়ে চলে আসার কারণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' (১৮৯৩) সংকলনে লিখেছিলেন—"গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি; বন্যপ্রদেশ মাত্র। সুহৃদ প্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যেদিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেইদিনই পালামৌ-র উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন।"

পালামৌ হতে ফিরে আসার পর তাঁকে অনেকেই পালামৌ সম্বন্ধে লেখবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু পালামৌর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীর হয়নি বলেই হয়তো তখন তিনি কিছু লেখবার প্রেরণাবোধ করেননি। পালামৌ ত্যাগ করবার ১৬/১৭ বছর পর দুবছর ধরে তিনি এই ভ্রমণস্মৃতি 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা'য় তা বই আকারে প্রকাশ করেন (১৮৯৩)।

'পালামৌ'-র সর্বশেষ অংশটি 'সঞ্জীবনী সুধা'য় কি কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেন নি। এমনকি, বসুমতী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত (আষাঢ় ১৩১২) সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই শেষ পরিচ্ছেদটি সঞ্জীবচন্দ্র ১ বছর ৫ মাস পরে বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন এবং প্রবন্ধটি আরম্ভ করেন এইরূপে—"বহুকালের পর পালামৌ

সম্বন্ধে দুইটা কথা লিখিতে বসিয়াছি। লিখিবার একটা ওজর আছে। এক সময়ে এক বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাঁর রোগ ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেইখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিতেন; কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না; শুনিবারও তাহাতে কিছু থাকিত না। অথচ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে। একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন 'তা কেমন করিয়া হবে এখনো ত গল্পের অনেক বাকী। আমারও সেই ওজর। যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছুক হন, আমি বলব যে, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে 'পালামৌ'র অনেক বাকী।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

উপরের উদ্ধৃতিটি পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে এটি নিশ্চিত সঞ্জীবের লেখা। লেখকের লেখার নিজস্ব স্টাইল ও পরিহাসপ্রিয়তা এখানেও সুস্পষ্ট। 'পালামৌ'র সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। যে কোন কারণেই হোক বঙ্কিমচন্দ্র শেষ প্রবন্ধটি 'সঞ্জীবনী সুধা'তে বাদ দিয়েছিলেন অথচ বঙ্কিম নিজেই জানিয়েছেন—

"আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি ঐগুলি লিখিয়াছিলেন; অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা, তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই।"[৩]

যাই হোক 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি 'পালামৌ' গ্রন্থে সংযোজন করে সঠিক কাজই করেছেন। 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যের চির-কালের সম্পদ। বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা'য় বলেছেন—" 'পালামৌ'য়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাংলা সাহিত্যে রহিয়া গেল। 'পালামৌ' শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সংকলিত হইয়াছে; তা সেই পালামৌ যাত্রার ফল।"[৪]

সঞ্জীবচন্দ্র দুবার কর্মোপলক্ষে পালামৌ গিয়েছিলেন, কিন্তু পালামৌ তখন তাঁর আদৌ ভালো লাগেনি, বরং পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতি ও কল্পনায় 'পালামৌ অপরূপ রূপ লাভ করেছিল। ভ্রমণের আনন্দ বেদনাকে ধরে রাখার জন্য লেখকের অদম্য আগ্রহ জন্মে। 'পালামৌ' তাঁর সেই ঐকান্তিক আগ্রহের ফলস্বরূপ।'

সঞ্জীবচন্দ্রই প্রথম তাঁর জীবনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে যে কয়েকটি মধুর প্রবন্ধ লিখলেন, তাই বাংলা সাহিত্যে সার্থক 'ভ্রমণ সাহিত্য' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। লেখকের নির্মল ও গভীর রসবোধ, সহানুভূতি

ও সূক্ষ্ম কৌতূহলী দৃষ্টি আসক্তি ও নিরাসক্তির যোগবন্ধন, রূপমুগ্ধতা ও দার্শ-নিকের নির্লিপ্ততা এবং ভাষার মনোহারিত্বে 'পালামৌ' বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির দিগন্ত উন্মোচন করে।

দুই

'পালামৌ' রচনার আগে এরূপ ভ্রমণকাহিনী বাংলা সাহিত্যে কেউ রচনা করেছেন বলে মনে হয় না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭) গ্রন্থটির কথা মনে পড়ে। কিন্তু এটি কাল্পনিক ভ্রমণ কথা। চোখে দেখার রসবোধ এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। কাল্পনিক কাহিনী দিয়ে গল্প জমানো যায়—প্রাণরসের উৎস পাওয়া যায় না। কবি নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯৮) বাদ দিলে এরূপ অনবদ্য ভ্রমণকাহিনী রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে আর লেখা হয়নি। 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী। বনফুল বলেছিলেন—'বাংলা ভাষায় বহু ভ্রমণকাহিনী লেখা হইয়াছে; ভ্রমণকাহিনী হিসাবে সেগুলির হয়ত মূল্য আছে, কিন্তু কোনও ভ্রমণ কাহিনীই 'পালামৌ' বইটির সমকক্ষ নয়। ইহার একটা স্বাতন্ত্র্য রস আছে, যে রসটি কাব্যরস এবং তাহা নিঃসৃত হইয়াছিল কবি সঞ্জীবচন্দ্রের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা হইতে। এই গ্রন্থে আমরা একটি সজীব পরিহাস-রসিক রূপদর্শী বিদগ্ধ মনের যে স্পর্শ পাই তাহা অন্যত্র দুর্লভ।'[৫] বাস্তবিক বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা-সাহিত্যের বুকে সৃষ্টির ঢেউ উঠেছিল, তাতে অনেকেই সেই যুগে সম্মানের স্বর্ণশিখরে উঠেছিলেন, কিন্তু কালস্রোতে তাঁদের সেই সম্মান ভেসে গেছে, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' স্বতন্ত্র রসে বাঙালী পাঠকের চিত্তে চিরকালের রসাস্বাদ-নীয় বস্তু। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে পথের সান্নিধ্য যতখানি পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশী পাওয়া যায় তাঁর অন্তরলোকের রস-জগৎ।

এই স্বতন্ত্র ও সহজাত রসটি সঞ্জীবচন্দ্রের অনন্য ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। সম-কালীন অন্যান্য লেখকদের লেখা হতে সঞ্জীবচন্দ্রের দেখা পৃথক, বস্তুনিরিষ্ট তন্ময়দৃষ্টির বদলে আরেকটু মন্ময় দেখা কিংবা পাঠককে দেখানো।

শুধু তাঁর দেখার চোখই ছিলনা, তা প্রকাশ করবার অসামান্য প্রতিভাও লক্ষণীয়। তিনি যা দেখেছিলেন, তিনি তা পাঠককে আরও রমণীয় করে দেখিয়েছেন; কানে যা শুনেছেন, পাঠকের মর্মে তা পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং পালামৌ নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়। ভ্রমণ কাহিনী একটি গতিশীল

চিত্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দিনলিপি বা বিবরণ মাত্র। যাত্রাপথের দুধারের মানুষের জীবনের ঘটনা ও প্রকৃতির রূপরসগন্ধ পরম্পরা চিত্র ভ্রমণকাহিনীতে প্রতিফলিত হয়। 'মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরিসিন্ধুমরু কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে।' তারই চিত্র ভ্রমণ-কাহিনীর বিষয়বস্তু, কিন্তু সঞ্জীব কেবলমাত্র তথ্য সরবরাহ করেননি কিংবা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে ক্লান্ত হয়েছেন, তাও নয়, তিনি অতীতের ঘটনাটিকে সূত্রমাত্র অবলম্বন করে স্মৃতিলোক হতে পিছনে ফেলে আসা জীবনের সুখদুঃখকে গ্রথিত করেছেন। ফলে 'পালামৌ' গ্রন্থে অনুচিন্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। প্রত্যক্ষ বর্ণনা অপেক্ষা অনুচিন্তন প্রবল হওয়ায় স্মৃতিকাহিনী করুণরসে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে।

তাইতো মনে হয় 'পালামৌ' নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়। ভ্রমণকাহিনীর স্থান সৃজনধর্মী সাহিত্যের বহিরাঙ্গনে। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টি করবার অবকাশ কম। ভ্রমণকাহিনী মূলতঃ প্রবন্ধসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত যদিও প্রবন্ধ নিরপেক্ষ মনের ফসল। তন্ময়তাই (objectivity) প্রবন্ধকারের প্রকৃষ্ট গুণ।

সাধারণত, প্রবন্ধ দুই শ্রেণীর। একশ্রেণীর প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিসত্তা অনুপস্থিত থাকে, সেখানে বিষয়ই মূল লক্ষ্য। লেখকের মন একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ। বিষয়ের উপর তাঁর যত অধিকার ও প্রবেশ, তত তিনি সার্থক বস্তুনিষ্ঠ। দ্বিতীয়শ্রেণীর প্রবন্ধে বিষয়ের প্রাধান্য কম। স্রষ্টার মনটি বড়ো কথা, লেখকের প্রাণাবেগ অনুভবের বিচিত্র রশ্মিজালে বন্দী। বিষয় এখানে বড়ো নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি পড়ে রসাস্বাদনে তৃপ্ত হওয়া যায়, আনন্দ পাওয়া যায়। এরূপ আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিকে ইংরাজীতে বলা হয় informal or personal Essay ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তথ্যজ্ঞাপন, তথ্য উপস্থাপন ও যুক্তিবিস্তার অপেক্ষা সৃষ্টির অনুভবটা বেশী। 'পালামৌ'এ লেখকের কল্পনার স্বচ্ছন্দচারণ আত্মকথনে ভরে উঠেছে। এগুলিকে তাই 'informal Essay' বলাই ভাল। এই কারণেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র 'পালামৌ'-কে কয়টি মধুর প্রবন্ধ বলে চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবিক মধুর প্রবন্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন—'তুমি প্রশংসা কর আর নাই কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমার পুরাতন কথা শুনাবে। তুমি শুন বা না শুন, সে তোমায় শুনাবে, পুরাতন কথা এইরূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহারও পুঁজি বাড়িবে না, কেননা, আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি,

তোমরা শুনিয়া চিরবাধিত কর। (৩য় প্রবন্ধ)

সঞ্জীবের বর্ণনার মধ্যে আত্মকথনের ভাবটাই বেশী, লেখকের ব্যক্তিস্বরূপ লেখার স্টাইলের মধ্যে ধরা পড়েছে। হয়তো এই আত্মকথনের ফলে ভ্রমণ-কাহিনীর রস ধর্মচ্যুত হতে পারে, কিন্তু লেখকের আত্মপ্রাণের স্ফূর্তি সবিশেষ বিকাশলাভ ঘটেছে। যদিও ভ্রমণকাহিনীর মূল আকর্ষণ অভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতাগুলিকে ছাড়িয়ে অহংসর্বস্ব আত্মকথনে মগ্ন হলে 'ভ্রমণকাহিনী'র রস ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ অনেকেই মনে করেন। সঞ্জীব এব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাই হয়ত বলেন—'আমার নিজের পুঁজি নাই'। বস্তুত 'পালামৌ' গ্রন্থে ভ্রমণ-কাহিনীর প্রত্যক্ষতা বর্ণনা অপেক্ষা অনুচিন্তনের ভাগই বেশি। অর্থাৎ তিনি জানতেন—তাঁর অভিজ্ঞতা সীমিত। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা হতে মাঝে মাঝে সরে গিয়ে কখনও তিনি অনুভবের গভীরতায় মগ্ন হয়ে যেতেন। তাইতো বরাকর পাহাড় দেখে তাঁর বাল্যকালে দেখা বৈরাগীর আখড়ার চুনকাম করা গিরি গোবর্ধনের কথা মনে ভাসে, মহুয়া গাছে মৌমাছির গুঞ্জন শুনে ছেলে-বেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে পথেঘাটের হরিনামের কথা মনে পড়ে—কখনো 'পলাণ্ডু'র অর্থ নিয়ে, মানুষের বাসগৃহের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে, পর্বতস্তরে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে, কখনো বা জাতিলোপের হেতু নিয়ে কিংবা মহুয়ার 'ব্রাণ্ডি' নিয়ে আত্মকথনে মগ্ন হন। ফলে, ভ্রমণ কাহিনীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা অপেক্ষা অনুচিন্তাই প্রবল হয়ে উঠেছে। অনুচিন্তাগুলি মনে হয় বক্তৃতারই সামিল। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন—'সঞ্জীববাবুর এই ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এমন অনেক বক্তৃতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহা পাশ কাটাইবার যোগ্য, যাহাতে রসের ব্যাঘাত করিয়াছে এবং লেখকও অবশেষে বলিয়াছেন 'এখন এ কচকচি থাক', কিন্তু এই সকল কচকচিগুলিকে সযত্নে বর্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবতই ছিলনা সে-কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।"[৬]

সঞ্জীবচন্দ্রের বিচিত্র ভাবনা তাঁর মূল বক্তব্যকে সত্যিই গ্রাস করেছিল, ফলে 'ভ্রমণ কাহিনী'র বিষয়বস্তুর সংহতি বারংবার প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটিয়েছে; এবং ঘটেছে জেনেও যথোচিত সাবধান হতে পারেননি; কারণ 'নিরুদ্যমতা' কিংবা 'গৃহিনীপনার' অভাব। অথচ সঞ্জীবচন্দ্র জানেন—'এবার ইচ্ছা রহিল, মূল বিবরণ ভিন্ন অন্যকথা বলিব না, তবে যদি দুই একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে বয়সের দোষ' বুঝিতে হইবে।' (প্রথম প্রবন্ধ)

কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র কথা রাখতে পারলেন না। কারণ তাঁর পক্ষে কোন মূল সূত্র ঋজুভাবে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না, মাঝে মাঝে আত্মভাবনা উপসূত্রের মত চেপে বসত, সূত্র ছিন্ন হয়ে যেত। তাছাড়া, এই ছোট্ট রচনাটুকু একটানা লেখা হয়নি—বছর দুই ধরে লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন—'তাঁহার মধ্যে যে-পরিমাণ ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উত্তম ছিল না।'[৮]

বস্তুত সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' নিছক ভ্রমণকাহিনী হয়ে ওঠেনি এবং ভ্রমণকাহিনী বললে এর প্রতি অবিচার করা হবে। কবি সঞ্জীবচন্দ্রের কবিমানসের আলেখ্য—কোন ভ্রমণ কাহিনীই 'পালামৌ' রচনার সমকক্ষ নয়। যেমন মহাকালের ফোটোগ্রাফি 'নিত্য মুহূর্তে এক-একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে ফোটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধস্পর্শ সকলই থাকে, ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে কথা থাক।' (ষষ্ঠ প্রবন্ধ)

এ-রচনা শুধুমাত্র ভ্রমণকাহিনী বা মধুর রচনা নয়—রূপ রস গন্ধ মন সবই আছে, শুধু দুচোখের দেখা রূপবর্ণনা নয় বরং অভিজ্ঞতালব্ধ স্মৃতি রোমন্থন,—হৃদয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ বাংলা সাহিত্যের একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি বলেছেন—'পালামৌ' ঠিক ভ্রমণকাহিনী নয়, ইহাতে লেখক একস্থানের কথাই বলেছেন। ইহাকে বরং 'জীবনস্মৃতি' না হউক 'স্মৃতিকথা' বলা যাইতে পারে।[৯]

যাই হোক, 'পালামৌ' বাংলাসাহিত্যে বোধ করি প্রথম মনোহারিত্বে মধুর রচনা এবং মিষ্টতায় উপন্যাসের সমতুল্য। বিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু ঠিকই ধরেছিলেন—পালামৌ 'মিষ্টতা মনোহারিত্বে'[১০] উপন্যাসের সমতুল্য এবং পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক ঐ একই কথা লিখেছিলেন—" 'পালামৌ' ঠিক প্রবন্ধ নহে, মুখ্যত ভ্রমণ কাহিনী, তবে ইহার মধ্যে উপন্যাস ও প্রবন্ধের কিছু কিছু উপাদান দেখা যায়।'[১১] আবার ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন—"'পালামৌ' একটি তুলনাহীন ভ্রমণস্মৃতি"[১২]। বিষয়বস্তুর বর্ণনা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, সৌন্দর্যদৃষ্টি, গভীর রসবোধ সূক্ষ্মানুভূতি, ব্যঙ্গমিশ্রিত লঘু পরিহাস রসিকতা, সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনা ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পরিবেশনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য 'পালামৌ' পাঠকের কাছে খুবই উপভোগ্য গ্রন্থ।

তিন

সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্যচেতনা অসাধারণ। সঞ্জীবচন্দ্রের দেখবার চোখ আশ্চর্য; তাঁর দেখা কখনোই যান্ত্রিক নয়, তাঁর অনুরাগরঞ্জিত প্রসন্ন দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিকেও সুদূরপ্রসারী করে তোলে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা দেখা আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তাঁর যৌবনে দেখা অভিজ্ঞতার ছবিগুলি আমাদের চোখে সজীব ও প্রাণময় বলে মনে হয়। বহুকালের ব্যবধানে বিস্তৃত বনভূমি অঞ্চলে নিঃসঙ্গ পরিবেশও লেখকের কাছে মনের মাধুরীতে চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। প্রকৃতির দৃশ্যশব্দ কী অপরূপ রসগন্ধে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে। বর্ণনার মনোহারিত্বে তিনি অবিস্মরণীয়। পাঠকগণ তাঁর রচনায় স্বাদিষ্ট ভোগবতী জলের সন্ধান পেয়ে পরিতৃপ্ত ও রসসম্ভোগে তৃপ্ত। কোল-বালকদের বর্ণনায় তাঁর প্রাণাবেগ প্রশান্তিতে ভরপুর "তথায় কতকগুলি কোল বালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই, সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী; ধুকধুকীর পরিবর্তে এক একখানি আরসী; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল, কেহবা মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহবা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কালপাথর পশুও পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ।" (দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

পর্যবেক্ষণশক্তি ও বর্ণনানৈপুণ্যে তাঁর সৌন্দর্যবোধ অপরূপ রম্যতালাভ করেছে।

বাস্তবিক, তাঁর বর্ণনানৈপুণ্যে পর্বতের ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া মর্তলোকের মেঘের মতো, যুবতীদের মৃত্তিকা রঞ্জিত আপন আপন বান্ধব প্রতি আড়নয়নে চাওয়া আর হাসা (১ম প্রবন্ধ), পর্বতের উপর মোষ দেহের কুঞ্চিত লোমরাজির মতো অরণ্য (২য় প্রবন্ধ), পাহাড়ে চিৎকারে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রতিধ্বনি (২য় প্রবন্ধ) নীরস পাষাণের বটগাছ (২য় প্রবন্ধ), মোষের গলায় কাষ্ঠঘণ্টার বিষণ্ণকর শব্দ (২য় প্রবন্ধ), লাতেহার পাহাড়ের কোলে পৃথিবীর রঙ (৩য় প্রবন্ধ), অরণ্যের মধ্যে দলছাড়া শ্বেত কপোতীর ন্যায় লেখকের তাঁবু (৩য় প্রবন্ধ), মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া ব্যাঘ্রের নিদ্রা (ঐ) ঝরে পড়া মহুয়ার ফুলে মাছি ও মৌমাছির হট্টগোল (৬ষ্ঠ প্রবন্ধ) প্রভৃতি ছবিগুলি কবি সঞ্জীবচন্দ্রের অভিজ্ঞতার ফল নয়, আত্মময় সৌন্দর্যচেতনার

সহজাত ফসল, মহাকালের অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় 'পালামৌ' (১৮৯৩) প্রকাশের দুবছর পরে (১৮৯৫) খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবপ্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিক কথাই বলেছেন "পালামৌ ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বার্ধক্যের লক্ষণ আছে—আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ...কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না।"[১৩] বাস্তবিক, সঞ্জীবচন্দ্রের হৃদয়ে জরার রাজত্ব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন—"পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিষটা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোলরমণীই হউক, বনসমাকীর্ণ পর্বত-ভূমিই হউক, জড় হউক, চেতন হউক, ছোটো হউক, বড়ো হউক—সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।"[১৪]

শিশুর কাছে যেমন এই জগৎ সৌন্দর্যের আধার, সঞ্জীবচন্দ্রের কাছেও তাই। তাঁর সৌন্দর্যবোধ অন্তরের উদার ঐশ্বর্যের মধ্যেই লালিত পালিত। কবি Blake-এর মত তাঁর কাছে বস্তুমাত্রেই সুন্দর ও পবিত্র—"All existing thing are sacred". For everything that lives in holy, life delights in life"[১৫]

সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে কুৎসিত বলে কিছু নেই। সমস্ত বস্তুর মধ্যে সুন্দরকে খুঁজে পেয়েছেন। মানুষও যেমন তাঁর কাছে সুন্দর, ছাগশিশুও তাঁর কাছে তেমনি সুন্দর। লতা ও যুবতী তাঁর কাছে সমান সুন্দর। অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট নিসর্গমাত্রই সুন্দর—সমস্ত জগত সংসার সুন্দর—"Beauty in things exists in the mind which contemplates them."[১৬] লেখকের অন্তরসত্তা সৌন্দর্যলীলায় অভিভূত, মগ্ন। তাই তাঁর অনুভাবনার মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মনে হয়, তাঁর সৌন্দর্যবোধ নিগূঢ় Pantheism থেকে জন্মলাভ করেছে। সঞ্জীবচন্দ্র জলে স্থলে নদীতে অরণ্যে পর্বতে, মনুষ্যদেহে ও অবলা জীবদেহে অসীম আনন্দময় সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন —"শিশুকে সর্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে

পাইতাম না। অনেকদিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। (৪র্থ প্রবন্ধ)। সঞ্জীবচন্দ্রের এই সৌন্দর্যবোধ বিশ্বসত্তারই আধার। ভারতের প্রাচীন উপনিষদের কথা স্মরণে আসে—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" সুন্দর তো চিরকাল রূপে রূপে বিভাসিত।

চার

মানবজীবনের অসঙ্গতিই হাস্যরসের মূল উৎস তবে হাস্যরসের উৎস কি তা নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন। Aristotle মনে করতেন যে মানুষের স্বাভাবিক অসঙ্গতি চোখে পড়লে তা স্বভাবতই আমাদের হাসিরউদ্রেক করে। অর্থাৎ মানুষকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে হীন করে দেখালেই কৌতুকের বা হাসির পাত্র হয়। বেন জনসন হয় তো ঠিকই বলেছেন—কোনো কোনো অন্তরের নীচ অনুভূতিকে আলোড়িত করলে হাসিক উদ্রেক হয়। আর হেজলিট্ তাঁর 'Wit and Humour' গ্রন্থে বলেছেন—

"The essence of the laughable, is the incongruous, the disconnecting of one idea from another, or the jostling of one feeling against another."

অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে কথায় ও কাজে বিপরীতধর্মী দুটি বিষয় যদি একই সমান্তরাল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তবেই হাসির কারণ ঘটে। ফরাসী দার্শনিক ম. বার্গসঁ-এর মতে হাসির মূলে থাকে অসামাজিকতা, নির্বুদ্ধিতা, যন্ত্রের মতো স্বয়ংক্রিয়তা এবং অদ্ভুত চরিত্র। হাস্যরসকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) বিদগ্ধ হাসি (wit) (২) স্নিগ্ধ হাসি (humour)। স্বভাবতই স্নিগ্ধ হাসি বিদগ্ধ হাসি থেকে ভিন্নতর। নিকলের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—"Humour, like wise, has been found to differ from the unconsciously ludricrous, and from the conscious play of fancy as expressed in wit. Wit is brilliant ; humour never so. Wit is clear and refined and cultured ; humour is whimsical. Wit is modern in its expression and aristocratic in its tone ; humour has always some half-wistful

glance at the past and is generally humble in its utterance."[১৭]

কৌতুক হাস্ত বা বিদগ্ধহাসির মধ্যে তিক্ততা বা জ্বালা থাকে না। কিন্তু বিদ্রূপের হাসি তীব্র ও জ্বালাময়।

বাংলাসাহিত্যে হাস্তরসের অবতারণা নিতান্তই ইংরেজি সাহিত্যসংযোগের পরিণাম ফসল। প্যারীচাঁদের বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর, ঠকচাচা কিংবা দীনবন্ধুর নিমচাঁদ সৃষ্টির চমৎকার নিদর্শন। তবে বাংলা সাহিত্যে হাস্তরসের চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে। তাঁর 'কমলাকান্তে' একদিকে যেমন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অসংগতির উন্মোচনে যে নির্মল হাস্তরসের স্ফুরণ ঘটেছে তা বাংলাসাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর যাঁদের হাতে হাস্তরসের নির্মল ও স্বচ্ছ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সঞ্জীবচন্দ্র। তাঁর হাতে তৎকালীন যুগের ধর্ম ও সমাজনীতির অন্তর্নিহিত অসংগতি ও অন্তঃসারশূন্যতা হাস্তরসের বিষয়রূপে নির্বাচিত হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' গ্রন্থে উন্নত হাস্যপরিহাসের প্রাচুর্য লক্ষ্যণীয়। সঞ্জীবের হাস্যরস তাঁর সহজ সরল ব্যক্তিত্বের প্রসন্নতা থেকে উৎসারিত। 'পালামৌ' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের এক পরিহাসকুশল হালকা মনের কল্পনাপ্রবণ কবিকে দেখা যায় যিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে গল্প করে চলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) রচনা দুটির ন্যায় 'পালামৌ গ্রন্থে সরস রঙ্গ ও লঘু কৌতুক সুলভ। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের হাস্যরসের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টার চিহ্ন নেই—অনায়াসলব্ধ ও স্বচ্ছ। বাঙালীর পর্বত সম্পর্কে ধারণার অভাবের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি অপরূপ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন—'পর্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটি কালীয়দমনের কালীয়, কাজেই যে পর্বতের উপর কালীয় উঠিয়াসে, সে পর্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে, ইহার আর আশ্চর্য কি ?" (১ম পরিচ্ছেদ)

গোবরের টিপির চেয়ে কিছু বড়ো মৃত্তিকাস্তূপ, তার উপরে ইট বসিয়ে পাহাড়ের চূড়া বানানো ব্যাপারটি যতখানি হাস্যকর, তারচেয়ে বেশী হাস্যকর পর্বতের চূড়ার তুলনায় কালীয় সর্পের ফণার আকারটি। সঞ্জীবচন্দ্র যেন গল্প-কারদের মতো মুখের ভাষাকে অনবদ্য ভঙ্গিতে বন্দী করেছেন। বর্ণনার মধ্যে কৌতুক-কণিকা ছড়ানো আছে। যেমন 'সর্পটি যে কালীয় দমনের

কালীয়', 'বঙ্গবাসী মাত্রই সজ্জন', 'বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা' 'ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী', 'বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস', 'বিবিরা ইহার প্রমাণ দিতে পারেন,' প্রভৃতি মন্তব্যে বিচিত্র রঙ্গকৌতুক-ব্যঙ্গের অন্তরালে লেখকের বাকচাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পরিবেশনের গুণে সামান্য বিষয়ই অসামান্যতা লাভ করে পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

লেখক কখনো নিজেকে আত্মগোপন করে রাখেন নি, পাঠকের কাছে উজাড় হৃদয় মেলে ধরেছেন, তাঁর সামান্যতম দুর্বলতা বা অক্ষমতা ঢেকে রাখতে চাননি। বাঘ মারার প্রসঙ্গে নিজের প্রতি বিদ্রূপ করে পাঠকের মনোযোগ যেমন আকর্ষণ করেছেন, তেমনি ঘটনার প্রতি কৌতুকের অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের হাসি উচ্ছলিত করে দিয়েছেন—

"আমি সাহেবের বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা একথা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল। তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। (৩য় পরিচ্ছেদ)

মুহূর্তে মুহূর্তে পঙক্তিগুলির মধ্য হতে হাসির স্বতোধার প্রস্রবন উপলখণ্ডের মতো সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে—(১) "বাঙ্গালার পথে ঘাটে বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়" (২) "পরাজিত অসুরগণ ভাল ভাল স্থান আর্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড়-পর্বতে গিয়া বাসস্থাপন করে।"

মাঝে মাঝে সঞ্জীবচন্দ্র সমাজ-সভ্যতা ও ধর্মনীতির অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। যেমন—"ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ যে অবস্থা হয় নাই, কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে অথবা সভ্যদেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্যদেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না।" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

আবার লেখক তাঁর সমকালীন বাঙালীর চারিত্রিক অবনতি, কুরুচি ও কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু তাতে লেখকের ব্যক্তিমনের অকপট প্রকাশ বৈঠকী মেজাজের রম্যতায় অম্লমধুর হয়ে উঠেছে।

১. "মনের মধ্যে যেখানে সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালায় ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌ পরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। (২য় পরিচ্ছেদ)

২. "যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী পরিত্যাগী গৃহী।. ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথমদিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে; তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিনী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে।"... (১ম পরিচ্ছেদ)

৩. "সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এইজন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

বাস্তবিক, সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা ছোটো নদীটির মতো তির্ তির্ তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হয়ে যায়, passion বা আবেগের উন্মত্ত স্রোতে পাঠককে প্রকম্পিত করে তোলে না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বার্ধক্যের ছদ্মবেশে পাঠকের প্রতি কৌতুকের অঙ্গুলি নির্দেশন করে সচকিত করে তোলেন—"এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাহার ভূয়সী প্রশংসা করি। (প্রথম পরিচ্ছেদ)। বলা বাহুল্য, সঞ্জীবের চিত্তের প্রসন্নতা তাঁর ভাষাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

'পালামৌ' রচনায় লেখকের কবিমন সহজপথে বেরিয়ে পড়েছে। কোন তত্ত্ব নয়, কোন উপদেশ নয়, এ ধরণের উল্লেখযোগ্য রচনা—বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' রচনার (১৮৮৭-৮৯) তের-চৌদ্দ বছর আগে এধরণের রচনায় ধর্মনীতি ও রাজ-নীতির অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-জীবনকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র অন্তরঙ্গ কথকের আসনে বৃদ্ধের জবানিতে দেশের পরাধীনতার জন্য, সমকালীন বাঙালীর প্রবঞ্চনার প্রতি লঘু পরিহাসে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিসাহিত্যের ডি. কোয়েন্সির 'confession of an opium eater'—এর অনুবর্ত্তনে এই 'রসসাহিত্য' রচনা করেছিলেন। 'পালামৌ'কে 'রসসাহিত্য' হিসাবে চিহ্নিত না করলেও এর মধ্যে যে ভাষার রম্যতা ও মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়, তা রম্যরচনার মতো আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। 'পালামৌ' গ্রন্থে যেমন স্নিগ্ধ হাসি (humour) লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ব্যঙ্গের হাসি

বিষয়ের হাসি প্রকাশ পেয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬৫) গ্রন্থে যেমন তৎকালীন কলকাতা সমাজের নানা রুচি ও কুরুচির চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, 'পালামৌ' গ্রন্থে সমকালীন বাঙালী জীবনের অসংগতির চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এশ্রেণীর রচনা কথকতাধর্মী। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী লেখক মঁতেনের হাতেই এরূপ রম্যরচনার আদিরূপ দেখা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র যেন মঁতেনের (Montaigne) মতো বলতে চান—

"I assure thee I would most willingly have portrayed myself fully and naked. Thus, gentle Reader, myself am the ground work of my book".

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের চার্লস ল্যামের হাতে এরূপ রচনারসের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' সেই রম্যরচনার দুর্লভ দৃষ্টান্ত। একদিকে বুদ্ধিদীপ্ত মনীষা, অন্যদিকে রম্যতা ও মাধুর্য্যে সর্বজন স্বীকৃত।

সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনার অগ্রদূত না হলেও তাঁর 'পালামৌ' রচনায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের লঘু চাল ও হালকা মেজাজ লক্ষণীয়। 'পালামৌ' গ্রন্থে গল্প-উপন্যাস-নাটকের মতো চরিত্র বা কাহিনীগ্রন্থের বালাই নেই, কাব্যের মতো কোন গভীর ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সংযত রূপায়ণ নেই—আছে বন্ধনহীন বাগ্জাল, কথার ফুলঝুরি এবং কিছু কিছু সমাজের খণ্ড চিত্র। তাই 'পালামৌ' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের বাচনভঙ্গির রমনীয়তা অনস্বীকার্য। দুঃখে-সুখে, হাস্যে-করুণায়, মায়া-মমতায়, ক্রোধে-বেদনায় লেখকের চিত্ত যখন যেমন আন্দোলিত হয়েছে, তারই স্পর্শ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত চিন্তা, মনন ও জীবনের স্পর্শে লেখকের রচনা রম্যরচনার মত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। তথাপি 'পালামৌ' রম্যরচনা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা এই মুহূর্তে স্মর্তব্য—"পালামৌ সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত।"

বস্তুত, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের মাঝে মাঝে বাক্চাতুর্যের সাহায্যে হাস্যরসের ফুলঝুরি পরিবেশন করেছেন। তাতে লেখকের স্বভাবগত চিন্তাধারা স্রোতধারার মতো স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। 'ইহা পলাণ্ডু নহে, ইহাকে পিঁয়াজ বলে'—রাজার এই অসামঞ্জস্য কথায় হাসির উদ্রেক করে, 'চারিদিকে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাস্টার মহাশয় থাকেন', বালকদের এই উক্তিতে পাঠকের মনে হাসি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়।

সুইফ্‌টের গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তে রূপকের আবরণে যেমন ব্যঙ্গরস পরিবেশন করা হয়েছে, তেমনি শিশু, পশু, দেব-দেবী, ভূত-প্রেত প্রভৃতির রূপায়ণে মানুষের চরিত্রই তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে পরিস্ফুট করেছেন। আবার শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সাহেব, ঋষি, রাজা এবং রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি চরিত্র চিত্রনে তাঁর হাস্যরসের বিচিত্র স্পন্দন লীলায়িত। সঞ্জীবচন্দ্র বৈঠকী গল্প জমাতে ওস্তাদ শিল্পী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে ছিল প্রাচীনকালের কথকের মত সজীবতা। তাই তাঁর পালামৌ গ্রন্থে স্যাটায়ের (Satire) বহ্নিদীপ্তি নেই, আছে সহজ প্রসন্নতা ও কৌতুকের স্নিগ্ধতা। তাছাড়া করুণা ও মাধুর্যের স্পর্শে মূলত তাঁর হাস্যরস সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

পাঁচ

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার Style ই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত গদ্যের পথ ধরেই তাঁর যাত্রা। যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের গদ্য নিঃসন্দেহে কথ্যরীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি তিনি টেকচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল"-এর মত কথ্যরীতিকে গ্রহণ করেননি। তিনি মূলত কথক,[১৮] আলাপী লোক।[১৯] বঙ্কিমচন্দ্রের মত সঞ্জীবচন্দ্রের কথ্যরীতির উপর যত্ন ছিল। বিদ্যাসাগরীয় তৎসম শব্দঝংকারবহুল গদ্যপথকে পরিহার না করেও চলিত ভাষার ব্যবহারের দিকে আগ্রহী ছিলেন। অবশ্য লেখার Styleটি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, মনের ঝোঁক। সঞ্জীবচন্দ্র নিজেও খুব গল্প করতে ভালবাসতেন। ফলে, তিনি অনায়াসেই পাঠকের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতেন।

'পালামৌ' গ্রন্থে তিনি কথক ঠাকুরের মত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বৈঠকখানায় বসে বালিশে হেলান দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে শান্ত মন্থর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন একটি মাদকতা আসে, যাতে গল্প জমে উঠে, স্মৃতি চিত্রে করুণ মধুর অভিজ্ঞতাকে সঞ্জীবিত করে, তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ভাষাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্রও কথকের আসন নিয়েছিলেন। ভাষার ব্যাপারে বিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু যথাযথ মন্তব্য করেছেন বলে মনে হয়। তিনি বলেন—"তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গালাসাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ, সরল, মিষ্ট,....। আর এই যে বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীব ইহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কথাও

তেমনি লিখিয়াছেন।"[২০]

ঠিকই কথা, তখনকার দিনে সংস্কৃতানুগ ভাষারই প্রতিপত্তি। সেই সময়ের খুব কম লেখকই এমন সহজ, স্বচ্ছ, সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। নিচের উদ্ধৃতি হতেই 'পালামৌ' গ্রন্থের ভাষার লাবণ্য, সরসতা ও স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়—

"হঠাৎ একটি লতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি-পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা আর গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। এক কালোকালো বড়গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাতে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে।" (৩য় পরিচ্ছেদ)

প্রকাশের স্টাইলটি সত্যিই অনবদ্য। উপরের উদ্ধৃতিটি চলিত ভাষায় লেখা নয়। কিন্তু ভাষার ভঙ্গিটি চলিত ভাষার মতো সরল ও সহজবোধ্য। 'কালো কালো' শব্দটি ব্যবহারে বাক্যগঠনে অনায়াস দক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট। বাস্তবিক সঞ্জীবচন্দ্র শব্দ বা বাক্যগঠনে ভাষার নতুন তাৎপর্যদান করেছেন। আবার বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের মত তৎসম, ইংরাজি, আরবী, দেশী শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি। শ্যামপেন (ফ্রান্সের champagne থেকে উদ্ভব), লিবর (ইংরাজী Liver), ধেনে (দেশী মদ), বাউটি, হাইল্যাণ্ডের পল্টন, পেনাল কোড (ইংরাজী), উমেদ (ফারসী-উম্‌মেদ), সাহেব (আরবী সাহিব), বাঙ্গালোর (ইংরাজী, Bunglow), আওলাত (আরবী আওলাদ) প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রচলিত শব্দগুলিকে তিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতেন। আবার, শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি—যেমন অশীতিপরায়না (অশীতিপর), নিরাবৃত (অনাবৃত বা নিরাবরণ), সাবকাশ (অবকাশ), চাক্ষুষ হয় নাই (চাক্ষুষ পরিচয়) প্রভৃতি। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িয়ে আছে।

তাঁর রচনার মধ্যে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হলেও 'পালামৌ' গ্রন্থটির নির্মল ও গভীর রসবোধ ব্যাপক সহানুভূতি তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতিকে ঢেকে দিয়েছে। আসলে তাঁর মনটা ছিল—কিশোরসুলভ। কিশোরের মত পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু কৌতূহলের সহিত পর্যবেক্ষণ করতেন। ভাষাও ছিল বালকের মতো। প্রাচীন চিত্রকরের মত দৃশ্যগুলি গ্রহণ করতেন এবং বালকের

মতো সেই সমস্ত অংশগুলিকে হৃদয়ের রসে জারিত করে গ্রথিত করতেন। তথাপি তাঁর প্রচেষ্টা সৎ। কারণ তাঁর ভাষারীতি পরিহাস-রসিকতায় সর্ব-সাধারণের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। লেখক যখন 'পালামৌ' লেখেন তখন সংস্কৃতপ্রধান পণ্ডিতী ভাষা ও কথ্য ভাষায় বিরোধ চলে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্যাসাগরীয় ও টেকচাঁদি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করে 'বঙ্কিমী' ভাষার প্রবর্ত্তন করেছিলেন এবং বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্র যে ভাষার অনুশীলন করেছিলেন—তাই-ই ভবিষ্যৎ বাংলাভাষার ভিত্তিরূপে চিহ্নিত। সঞ্জীবচন্দ্র ভাষা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন, ভাষাকে জনগণের ভাষার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে যে শব্দ তাঁর মনে এসেছে তাকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এব্যাপারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমধর্মী।[২১]

পালামৌ গ্রন্থে সাধুভাষা সম্পর্কে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ও মন্তব্য উপভোগ্য—"সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধু ভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাই একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয়, অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয়, এইজন্য এক-একবার ইতস্তত করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এইজন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন।....সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন। এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলেনা, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি একথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বলুন, সাধু ভাষা গোল্লায় যাক।" (ষষ্ঠ প্রবন্ধ)

তবে, তাঁর ভাষায় স্টাইল হৃদ্যতায় কখনো কখনো বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত পাঠকের মুখোমুখি হয়ে তিনি অজস্র কথা বলেছেন। তাঁর মুখে গল্প শুনে পাঠক খুশী হতেন। তিনি মনেপ্রাণে সরল সহজ জীবনের অভিলাষী ছিলেন, এবং সেই কারণেই তার ভাষার স্টাইল নিজস্ব ঢঙে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর রচনায় তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিসত্তা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকাশের মধ্যে লেখকের স্টাইল ধরা পড়ে—Pnrsonality clothed in expresson। 'পালামৌ' গ্রন্থে লেখকের স্পর্শকাতর বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশের অন্তরাল হতে লেখকের ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভবগুলি বিধৃত হয়েছে, লেখকের আত্মপ্রাণের আবেগগুলি তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বসিত হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিস্বরূপ তাঁর নিজস্ব স্টাইলের মধ্যে ধরা পড়েছে।

স্বচ্ছ নদীটির মতো তাঁর ভাষা পাঠকের আবেগকে প্রকম্পিত করে তোলে —যা পাঠক ভুলতে পারেনা।

লেখকের কৌতুক শান্ত সহজ প্রসন্নতা পাঠকের মনকে ভরিয়ে তোলে।

সঞ্জীবচন্দ্রের হাস্যরস তাঁর সরল ও নির্দোষ ব্যক্তিত্বের প্রসন্নতা থেকে উৎসারিত, যা তাঁর পালামৌর প্রতি পাতায় পাতায় হাসির স্বতোধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রাকৃতিক বর্ণনায় যেমন সেই যুগে তাঁর জুড়ি ছিলনা, সামাজিক বিষয় বর্ণনায়ও সঞ্জীবচন্দ্রের জুড়ি নেই—"যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী।"

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবপ্রতিভার সীমা নির্ণয় করেছেন এবং তাঁর মত ও মন্তব্য পরবর্ত্তীকালে সকলেই সঞ্জীবপ্রতিভা বিচারের একমাত্র টীকাভাষ্য বলে স্বীকার করেছেন। 'পালামৌ' সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই বহুল পরিচিত উক্তিটি পাঠকের অজানা নেই—'তাহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু, গৃহিনীপনা ছিলনা।' সঞ্জীবচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে তাঁর আলস্য, ঔদাসীন্য ও অপরিপূর্ণতা লক্ষিত হলেও 'পালামৌ' গ্রন্থ সম্পর্কে এ সকল কথা বলা যায় না।

শিশুর মতো অবাকবিস্ময়ে প্রকৃতির রূপরসগন্ধ তিনি উপভোগ করেছিলেন বলেই তাঁর অন্তস্থল হতে এমন অনেক শাশ্বত বাণী নির্গত হয়েছে যা চির-কালের প্রবাদবাক্যের মতো মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। সব শ্রেণীর পাঠক কোনোদিন ভুলতে পারবেন না তাঁর সেই সমস্ত উক্তি। তাঁর উদার হৃদয়ের প্রসন্নতা সেই ভাষাকে অপূর্ব প্রসাদগুণে রসাস্বাদিত করে তুলেছে। সেই তর্কবিতর্কের যুগের ভাষারীতির স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন হৃদয়ের দর্পণে (১) "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, (২) বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা; ঋষি কেবল প্রতিবাসী—পরিত্যাগী গৃহী' (৩) প্রবাসী বাঙালী মাত্রেই সজ্জন প্রভৃতি।

তাঁর পরিমার্জিত রুচিবোধে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বক্রতা থাকলেও খুনের ছুরি ছিল না, ছিল ঠাট্টার ছুরি। সাহেব বেশধারী নিজের শৌর্যের প্রতি তাঁর বক্রকটাক্ষ অবিস্মরণীয়। ভাতের পরে রাগ করা বাঙালী যুবক ও দুরাত্মা বাঙালী প্রতিবেশীর প্রতি তাঁর সহাস্য পরিহাসে অপমানের তীব্র চাবুক আস্ফালিত হয় না।

যে অন্তরদৃষ্টি প্রাকৃত চক্ষুকে শৈল্পিক রসদৃষ্টির অধিকারী করে তোলে

সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে সেই সমস্ত গুণই ছিল এবং ছিল বলেই পালামৌ ভ্রমণস্মৃতি গ্রন্থে সেই শিল্পদৃষ্টির অজস্র নিদর্শন চোখে পড়ে। যা কিছু বা নগণ্য, রসস্রষ্টার অন্তরদৃষ্টিতে তাই অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে।

ছয়

জ্ঞানের দীনতা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই ভ্রমণকাহিনী রচিত এবং পাঠক তাঁদের জ্ঞানের দীনতা পূর্ণ করে নেবার উৎসাহে তা পাঠ করেন। সত্যিই ভ্রমণসাহিত্য পাঠ করে আমরা মুগ্ধ হই এবং আমাদের অভিজ্ঞতার অপূর্ণতা পূর্ণ করি। বিচিত্র সমাজ ও মানুষের আচার-আচরণ, লোকধারা ও সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করে পরিতৃপ্তি ও আনন্দলাভ করি। আসল কথা—'মানুষ মাত্রই সুদূরের পিয়াসী। সংসারের সংকীর্ণ জীবনযাত্রা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। বাইরের পৃথিবী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুখদুঃখ জর্জরিত গৃহবন্দী মানুষের মণিকোঠায় বাহির বিশ্বের অফুরন্ত সৌন্দর্যের রসভাণ্ডার পৌছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই প্রধানত ভ্রমণ সাহিত্যের প্রকৃত সার্থকতা।

মানুষ মাত্রই যাযাবর। এই যাযাবরী মনোবৃত্তি মানুষের আদিমকাল হতে চলে আসছে। ভ্রমণের নেশার মধ্যে মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছে প্রবল থাকে। মানুষের মানসিক বিস্তৃতি ও উদারতার জন্য একান্ত প্রয়োজন স্থানিক পরিবর্তন। এই স্থান পরিবর্তনের মধ্যে থাকে মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ ও রোমাঞ্চ। মানুষ নিরন্তর চলতে চায়—তার এই চলার মধ্যে যে আনন্দ, তা অনবদ্য। দূরদূরান্তের পথের যাত্রী যাঁরা, তাঁরা পথচলা জীবনের নিটোল দিনগুলি তাঁদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ভ্রমণসাহিত্যের ডালিতে সাজিয়ে রাখেন। আর, গৃহবন্দী মানুষ তা পাঠ করে পায় দুর্গমতার স্পর্শ।

মানুষের ভ্রমণপিপাসা যেমন আদিম তেমনি ভ্রমণসাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে নেশাও অতি প্রাচীন। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' বা কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে ভ্রমণসাহিত্যের অফুরন্ত উৎস দেখা যায়। তবে, এগুলি একটিও ভ্রমণ সাহিত্য নয়। কিন্তু ভ্রমণসাহিত্যের অনাবিল আস্বাদ পাওয়া যায়। বাংলাসাহিত্যের নবযুগে ভ্রমণসাহিত্যের সৃষ্টি-উৎস পাশ্চত্য-সাহিত্যের সংস্পর্শে। ইংরাজী সাহিত্যে ডিফো (Daniel Defoc-১৬৬১-১৭৩১) তাঁর 'রবিনশন ক্রুশো' (Rabinson Crusoe) লিখে পৃথিবীতে

চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠেন। নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপে একটি মানুষের (আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক) পরিত্যক্ত বন্দী জীবনের কাহিনী অবিস্মরণীয়। ডিফোর পর্যবেক্ষণ-শক্তি ছিল অসাধারণ। ফলে তিনি কল্পিত বস্তুতেও বাস্তবতার ছাপ দিয়ে তাকে জীবন্ত করতে পারতেন। গোল্ডস্মিথের (Oliver Goldsmith 1728-1770) The Travreller গ্রন্থে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় আন্তরিক আবেগময়তায় রূপায়িত। স্টার্ন (Lawrence Stern 1717-1768)-এর A Sentinental journey কাহিনীতে ভ্রমণের আনন্দধারা ধরা পড়েছে। রোমান্টিক যুগের কবি বায়রণের (১৭৮৮-১৮২৪) শ্রেষ্ঠ কাব্য Child Harold pilgrimage কাব্যে স্পেন, পর্তুগাল ও গ্রীস ভ্রমণের অভিজ্ঞতার অনবদ্য কাহিনী যেমন একদিকে বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে আল্পস পর্বতের সৌন্দর্যরূপ ও ভেনিস ফ্লোরেন্সের রহস্যের উদ্ঘাটনে কবি তৎপর হয়েছেন। Child Harold বায়রণের ভ্রমণকাহিনীর অপরূপ আলেখ্য।

বাংলাসাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের পূর্বে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাংক্ষের বৃথা ভ্রমণ' গ্রন্থটির নাম মনে হয়। এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। ভ্রমণের প্রত্যক্ষ আনন্দলাভ তাতে পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতে ভ্রমণসাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছিল। বস্তুত, বাংলাসাহিত্যে ভ্রমণসাহিত্য আধুনিককালের নতুনতর সংযোজন। প্রবন্ধের মত ভ্রমণসাহিত্য সাধারণত দু'শ্রেণীর। (১) বিবরণাত্মক ইতিহাসধর্মী—এই জাতীয় ভ্রমণকাহিনী সাধারণতঃ তথ্যপ্রধান। যেমন মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ, চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ ও আলবেরুনীর ভারতকথা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের ইতিহাস ও বিবরণধর্মী তথ্যপ্রধান ভ্রমণসাহিত্য প্রভূত পরিমাণে রচিত হয়েছে। লেখক আপন ব্যক্তিসত্তাকে দূরে ঠেলে শুধুমাত্র নতুন দেশ ও অঞ্চলের ভূগোল বিবরণ ও দেশজাতির ধর্মসংস্কার ও আচারঐতিহ্য ও ইতিহাস বর্ণনায় ব্যস্ত হন। অন্যপক্ষে আরেক প্রকার ভ্রমণসাহিত্য তত্ত্বপ্রধান ও আত্ম-ভাবনায় উদ্ভাসিত। যা চোখে দেখা যায় তার সঙ্গে চিন্তার ও তত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেশ-দেশান্তর ও প্রকৃতির অন্তঃশীল জীবনের পরিচয় উদঘাটন করা। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' এমন একটি ভ্রমণকাহিনী, যার তুলনা দুর্লভ। পালামৌ জাতীয় গ্রন্থের সরসতা একমাত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'তে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'আত্মজীবনী'তে হিমালয় মুখ্য স্থান লাভ করে আছে।

হিমালয় ভারতআত্মার বিস্ময়কর রহস্যবিগ্রহ ও চিরসৌন্দর্যের নিকেতন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে প্রথম হিমালয়ের সেই রহস্যনিকেতনের দরজা খুলে দিয়েছেন। হিমালয় ভ্রমণ ধ্যানরসিক ঈশ্বরপ্রেমিক সদাপ্রসন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল সৌন্দর্যপ্রেমিক দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে খুব ভালো করে স্পর্শ করে যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌর মতো মহর্ষির 'আত্মজীবনী'তে কবির রূপমুগ্ধতা ও দার্শনিক নির্লিপ্ততা ভ্রমণ সাহিত্যের অনাবিল আস্বাদ এনে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় দেবেন্দ্রনাথের লেখনী অতিশয় সংযত, কোথাও আবেগ-উচ্ছ্বাস-অতিভাষণের চিহ্ন নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ভ্রমণসাহিত্য পত্রের আকারে লেখা, যা বাংলাদেশের চিরকালের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সুদূরের পিয়াসী। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের জগৎ ছিল বহুধাবিস্তৃত। তাঁর বিশিষ্ট ভ্রমণসাহিত্য—(১) য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (২) য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী (৩) জাপান যাত্রী (৪) রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক পত্রসংকলনে সর্বত্র ছড়ানো আছে আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার সুর। ভ্রাম্যমান কবি পথ চলার ফাঁকে ফাঁকে জগৎ ও জীবনের যে সত্য উদ্ঘাটিত করেছেন তা গভীর প্রসারী। ইউরোপ, জাপান, পারস্য, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সমস্তই জীবনরসিক রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু নিজের 'জারক রসে' তাকে রসান্বিত করে তুলেছেন। আত্মভাবনায়, দার্শনিকসুলভ জিজ্ঞাসায় 'জাপানযাত্রী' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী। জাপানকে অবলম্বন করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন লেখক। 'জাভাযাত্রী'র পত্রের প্রথম চিঠিতে লেখক বলেছেন—'ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্য আমরা তীর্থযাত্রা করছি।' 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থের দুটি মূল সুর উদ্ভাসিত—ভারত সংস্কৃতির ব্যাখ্যা আর নৃত্য সঙ্গীত অভিনয়কলা প্রসঙ্গ আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ভ্রমন কাহিনীতে আত্মনিষ্ঠার ছাপ আছে, বিষয়ের বিচিত্রমুখী আবেদন অন্তরসত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রবন্ধধর্মী। বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা ও প্রকাশের স্পষ্টোচ্চারণে রাশিয়ার চিঠি দীপ্তিময়। অতিকথন এখানে পরিত্যক্ত। 'জাপানযাত্রী' বা 'জাভাযাত্রী' ভ্রমণকথা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। 'রাশিয়ার চিঠি' ভ্রমণকাহিনীতে লেখকের অন্তর্ভেদী মানবতা লক্ষ্য করার মতো।

'পালামৌ' পাঠ করলে আমরা সহজেই লক্ষ্য করি লেখকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও গুরুগম্ভীর আলোচনা—ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় ঐ সমস্ত বস্তু শিল্পগত সুষমায় সংহত ও গভীর প্রসারী। একটি দেশ, জাতি ও কালের কথা হয়েও তার আবেদন সর্বজনীন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে লেখকের চিন্তাশীল মনের প্রকাশ ঘটেছে। বিবেকানন্দের পৃথিবীর নানা স্থানে পর্যটনের বহুতর অভিজ্ঞতা বাণীবদ্ধ হয়েছে। প্রথমে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' হিসাবে 'পরিব্রাজক'-এর চিঠিগুলি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভ্রমণ রস অপেক্ষা দেশ-জাতি-সমাজ সম্পর্কিত প্রশ্ন সমধিক লক্ষ্য করা যায় তাঁর ভ্রমণ কথায়। পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করে বিবেকানন্দ তাঁর অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন। বিবেকানন্দ কখনো অভিজ্ঞতা থেকে সরে গিয়ে অনুচিন্তায় মগ্ন হন নি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলাসাহিত্যে ভ্রমণসাহিত্যের দিগন্ত উদ্ভাসিত। বিশেষত, হিমালয়কে নিয়ে কেবলমাত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ভ্রমণসাহিত্য রচনা করেননি, প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে হিমালয় ভ্রমণের অনাবিল সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। দুর্গম হিমালয়ের গুহান্বিত রহস্য তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। প্রবোধ-কুমারের নিজের কথায় হল—'নিজের ভিতরকার তাড়না আমাকে বারবার ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ভারত-পরিক্রমায়।…কিছু আমার চাই, কিন্তু তার সত্যস্বরূপ আমার জানা নেই।'[২২] বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পর ভ্রমণকাহিনীকে রসসাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। বর্তমানকালে ভ্রমণসাহিত্যের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক তিনি। মনে হয় প্রবোধকুমার সান্যাল 'ভ্রনকাহিনী' রচনায় বহু লেখককে আকৃষ্ট করেছিলেন। একদা জলধর সেনের 'হিমালয়' ভ্রমণ কাহিনী পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করেছিল। অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'—দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথ্য সম্পৃক্ত চিন্তাসমৃদ্ধ ভ্রমণকাহিনী অন্নদাশংকর রায়ের 'পথেপ্রবাসে' ও 'জাপানে'। লেখকের 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১) যখন বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমকালের দেশ ও সমাজের সমস্যা সম্পর্কে তিনি যেমন সচেতন

ছিলেন, তেমনি দেশান্তরের জীবনধারা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। তাঁর ভ্রমণসাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাখীবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পথচলতি' খুবই উল্লেখযোগ্য ভ্রমণগ্রন্থ। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে সুবোধ চক্রবর্তীর বহু-পূর্বে প্রকাশিত 'রম্যানিবীক্ষ্য' ও শঙ্কু মহারাজের—'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' কালকূটের 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' ও রানীচন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'ভূস্বর্গ কাশ্মীরে' প্রভৃতি অসংখ্য ভ্রমণকাহিনীর পরিচয় মেলে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মণি মহেশ' 'পঞ্চ কেদার' প্রভৃতি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে অনবদ্য গ্রন্থ।

যাত্রাপথের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে অভিযান জাতীয় ভ্রমণ কাহিনী গৌরকিশোর ঘোষের 'নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি' এবং বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড'।

বাংলা সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে পথিকের একতারায় নিঃসঙ্গতার সুরে বেজে উঠেছিল বন-বনান্তর, গিরি-পর্বত ও নদী নির্ঝরের গান। আর তাঁর নিজের একতারায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে—'পালামৌ' স্মৃতি। রসপিপাসু হৃদয় নিয়ে প্রকৃত শিল্পীর মতো তিনি সৃষ্টি করলেন যে ভ্রমণসাহিত্য, তারই ধারায় আজ বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভ্রমণসাহিত্যের রসের পাত্র উপচিয়ে পড়েছে।

নির্দেশিকা

১। 'পালামৌ' 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৫ পৌষ, ফাল্গুন—১২৮৮ আষাঢ়-শ্রাবণ-এবং শেষ কিস্তি ১২৮৯ ফাল্গুন প্রকাশিত।

২। "পালামৌ বঙ্গদেশে লোহারডাগা জিলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণ ৪২৪১ বর্গমাইল, পালামৌতে ২৮৫৯ খানি গ্রাম আছে। পালামৌ বিভাগে মাল জাতি সর্ব্বপ্রথম স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহারাই পালামৌ নগর নির্ম্মাণ করে বলিয়া প্রবাদ আছে। মালজাতি এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায়। সরগুজা ও উদয়পুর প্রভৃতি করদ রাজ্যে মালজাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। মালজাতির পর বাক্রেল রাজপুতেরা পালামৌ অধিকার করে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়াছে।

এখানে ২টি ফোজদারী ও ২ টি দেওয়ানী বিচারলেয় আছে।

—বিশ্বকোষ, ১৩০৭।

৩। সঞ্জীবনী সুধা। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৭৩)

৪। ঐ

৫। "পালামৌ : গ্রন্থ পরিচিতি'—বনফুল। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা।

৬। সঞ্জীবচন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ।

৭। পালামৌ রচনার সময় সঞ্জীবচন্দ্রের বয়স ৪৭-৪৮। তিনি আদৌ বৃদ্ধ ছিলেন না। অনুজ বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র ৩৮ বছর বয়সে কমলাকান্তের দপ্তরে 'বুড়ো বয়সের কথা' লিখেছিলেন, তাই বলে তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না।

৮। সঞ্জীবচন্দ্র : আধুনিক সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ।

৯। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (প্রথম খণ্ড) : কবিশেখর কালিদাস রায়।

১০। চন্দ্রনাথ বসু 'সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনায় লিখেছিলেন—'উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের মিষ্ট বোধ হয়। 'পালামৌ'র ন্যায় ভ্রমণকাহিনী বাঙ্গলা সাহিত্যে আর নাই। আমি জানি, উহার সকল কথাই প্রকৃত, কোন কল্পিত নয়, কিন্তু মিষ্টতা মনোহারিত্বে উহা স্বরচিত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।

১১। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২। "দূরবিস্তৃত বনভূমির স্থাবর-জঙ্গমকে, অপরিচিত হলেও, পাঠকের ভালোবাসার পাত্র করে তোলাই সঞ্জীবচন্দ্রের বড়ো গুণ। যে মেয়েটি সায়াহ্নে নদী কিনারে জল আনতে যেতে পারল না, তার বিষণ্ণ বেদনা, যে বালকটি 'সাহেব, একটি পয়সা', 'সাহেব একটি পয়সা' বলে হাত পেতে পয়সা নিয়ে তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়াল, যে ব্যাঘটি গুহার প্রান্তে থাবাখান মুখের কাছে দর্পণের মতো ধরে ঘুম দিচ্ছিল, কিংবা কোল-স্ত্রী-পুরুষের নৈশ নৃত্যসভায় উপস্থিত থাকার মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লেখকের সঙ্গে পাঠকও লাভ করেছেন॥ আমাদের প্রতিদিনের ইন্দ্রিয়ময় বোধ তাঁর রচনায় অপূর্ব আনন্দময় উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। সেদিক থেকে 'পালামৌ' একটি তুলনাহীন ভ্রমণস্মৃতি।"
—সঞ্জীব রচনাবলী : ভূমিকা ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। 'সঞ্জীবচন্দ্র'। আধুনিক সাহিত্য। ১৩০১।

১৪। 'সাধনা' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৌষ ১৩০১

১৫। Willam Blake-'America'

১৬। David Hume, 'Essay of Tragedy'.

১৭। Nicol-'The Theory of Drama, Edn· 1974, F. 210.

১৮। "সেকালের বিখ্যাত কথক ধরণীর কথকতা জনসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ীতে নানা উপলক্ষে ধরণী কথকের কথকতার অনুষ্ঠান হত।"

'সঞ্জীবরচনাবলী'—ভূমিকা। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯। "তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার মুখে গল্প শুনিতে আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আয়ত্ত কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।"—জীবনস্মৃতি; বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক অধ্যায়, পৃঃ ২৬৫

২০। সঞ্জীব সাহিত্য আলোচনা—চন্দ্রনাথ বসু

২১। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন লেখকদের উদ্দেশ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা' (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড) প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র তা মনে রেখেছিলেন। তাই তাঁর লেখার মধ্যে আরবী, ফারসী, গ্রাম্য, বন্য—সমস্ত শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

২২। কথাসাহিত্য। বৈশাখ—১৩৫৯

সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র ও ভ্রমর

১২৮১ বৈশাখ-১২৮২ আষাঢ় । নতুন পর্যায় ১২৮৫ ভাদ্র-আশ্বিন ।

এক

বঙ্কিমের অনুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর'[১] নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক। ১২৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'ভ্রমরের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১২৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৮২-র আষাঢ় পর্যন্ত একটানা মোট ১৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তারপর নতুন পর্যায়ে ১২৮৫ ভাদ্র ও আশ্বিনে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেন সঞ্জীবচন্দ্র। মোট ১৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রই ভ্রমরের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তৎকালীন (১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) 'বঙ্গদর্শন' এর কার্যাধ্যক্ষ অনুজ শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে 'ভ্রমর' পত্রিকার বিজ্ঞাপন[২] দিয়ে ভ্রমরের নিয়মাবলী, গ্রাহক মূল্য, 'ভ্রমর' প্রকাশের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু কি থাকবে—তা জানিয়ে দেন। উপন্যাস ও কবিতা ছাড়া ভ্রমরে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ, দেশের সামাজিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লেখা প্রকাশিত হত। জ্ঞানী-গুণীদের উপযোগী যেমন লেখা থাকত, অনুরূপ স্বল্প-জ্ঞানী মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা স্থান পেত। সঞ্জীবচন্দ্র এই সময় Special Sub-Register ছিলেন। 'ভ্রমর' সম্পাদনাকালে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখনীশক্তির বিকাশ প্রশংসনীয়। তিনি নাকি 'ভ্রমরে'র সমস্ত প্রবন্ধই লিখতেন। তিনি নিষ্ঠাবান, যত্নশীল ও পরিশ্রমী সম্পাদক ছিলেন। 'ভ্রমরে' সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১২৮১ বৈশাখ), 'কণ্ঠমালা' (১২৮১ আষাঢ়, ১ম-৫ম পরিচ্ছেদ, শ্রাবণ-৬ষ্ঠ-৯ম পরিচ্ছেদ, ভাদ্র ১৪-১৬ পরিচ্ছেদ, আশ্বিন ১৪শ-১৬ পরিচ্ছেদ), 'সৎকার', 'দামিনী', 'যাত্রা', 'কীর্তন', 'বাল্য-বিবাহ', 'আর্যজাতির চিত্রপাঠ', 'দুর্গাপূজা'. 'বাহুবল', 'স্ত্রীজাতির বর্ণনা', 'একঘরে', 'ভারত ভাণ্ডারী', 'অকাতর বিবাহ' প্রভৃতি লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। ভাবতে অবাক লাগে ১৫ মাসের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের এতগুলি লেখা ভ্রমরে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন—"এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন। আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না।"[৩]

নৈহাটিতে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায়' 'ভ্রমর' পত্রিকার ১৭টি সংখ্যা একটি খণ্ডে বাঁধানো আছে। সেই বইয়ের মধ্যে একটি পাতায় জ্যোতিশ্চন্দ্রের পুত্র শতজীবচন্দ্র (সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র) ভ্রমরে প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে কোনগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের, কোনগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের কোনগুলি জ্যোতিশ্চন্দ্রের তার একটি লেখক-সূচী লিখে রেখে গেছেন। সম্ভবত পিতা জ্যোতিশ্চন্দ্রের কাছ থেকে জেনেই এরূপ তালিকা করেছিলেন। তালিকাটি নিম্নরূপ :—"ভ্রমর" মাসিক পত্রিকা। ইহাতে পিতামহ সঞ্জীবচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তক আছে— ১। কণ্ঠমালা, ২। রামেশ্বরের অদৃষ্ট, ৩। দামিনী, ৪। একঘরে, ৫। ভারতভাণ্ডারী, ৬। বাহুবল, ৭। সৎকার, ৮। যাত্রা, ৯। কীর্তন, ১০। আর্যজাতির চিত্রপট, ১১। বাল্যবিবাহ, ১২। অকাতর বিবাহ, ১৩। আনার বন্দী, ১৪। দুর্গাপূজা, ১৫। স্ত্রীজাতি বর্ণনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত—বৃষ্টি—পৃঃ ৫৫, বঙ্গে দেবপূজা—পৃঃ ১৫৭

পিতা জ্যোতিশ্চন্দ্রের লিখিত—১। জলে ফুল
২। স্বপন
৩। প্রভাত যামিনী
৪। ভ্রমর
৫। বিধবা

'বঙ্গদর্শনে'র মত 'ভ্রমরে'ও লেখকের নাম থাকত না। তাই বঙ্কিমের ভ্রমরে প্রকাশিত 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটির নাম শতজীববাবুর তালিকায় বাদ পড়ে গেছে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র এই 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটি তাঁর 'বিজ্ঞান রহস্য' পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। এছাড়া ভ্রমর পত্রিকার 'ভ্রমর' রচনাটি (১২৮১র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত) ও 'ভ্রমরের আত্মকথা' রচনাটি (১২৮২র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত) সঞ্জীবচন্দ্রের। শতজীববাবু উক্ত রচনা দুটির লেখকের নাম তাঁর তালিকায় উল্লেখ করেননি।[৫] রচনাগুলি 'ভ্রমরের' সম্পাদকীয় লেখা বলেই হয়তো তা করেননি।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'ভ্রমরে' প্রকাশিত প্রবন্ধ ও উপন্যাসগুলি তাঁর জীবিতকালে জনপ্রিয় হয়। ভ্রমরে প্রকাশিত (১২৮২র বৈশাখ) 'যাত্রা সমালোচনা' প্রবন্ধের পুস্তকখানি ১৮৭৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সম্বন্ধে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' উপন্যাসখানি 'ভ্রমরে' প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমরে'র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-৩১। আসলে এটি

একটি বড়ো গল্প। মানবচরিত্র সম্পর্কে গভীর মমত্ববোধ লক্ষণীয়। উদ্দেশ্য—সহানুভূতিপূর্ণ। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত বিদ্যমান। কিছুটা অলৌকিক।

'কণ্ঠমালা' উপন্যাসখানি 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১র আষাঢ় সংখ্যা থেকে ১২৮২র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। মোট ৩৭ পরিচ্ছেদ ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। কণ্ঠমালা মাধবীলতার পরিশিষ্ট। 'ভ্রমরে' এটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হয়ে ১ম সংস্করণ প্রকাশ পায়। তাঁর জীবিতকালেই ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায়। 'কণ্ঠমালা'র 'ভ্রমরে' প্রকাশিত অংশ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে কিছু পার্থক্য আছে। শৈলের ভাবান্তরগুলি 'ভ্রমরে' আরও স্পষ্ট হয়েছে। লেখক গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'ভ্রমর' এ প্রকাশিত বহু অংশ বাদ দিয়েছেন বলে উপন্যাসে শৈল চরিত্রের সঙ্গতি বহুস্থলে ক্ষুন্ন হয়েছে।[৭]

সংকার ১২ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ। 'ভ্রমরে' (১২৮১-র পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধটি 'সংকারে'র মতো ১২ পৃষ্ঠায়। এটিও 'ভ্রমরে' (১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। দুটিই মৌলিক ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ। 'সংকার' ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ও 'বাল্যবিবাহ' ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ও 'বাল্যবিবাহ' ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

'দামিনী' 'ভ্রমরে' (১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী সুধা'য় (১৮৯৩) পরে 'দামিনী' অন্তর্ভুক্ত হয়। উপন্যাস না বলে বড়ো গল্প বলাই ভাল। 'দামিনীর কিশোরী বয়সের অকাল গাম্ভীর্যের বর্ণনায় লেখকের পূর্বশক্তির কথঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়।'[৮]

সঞ্জীবচন্দ্রের 'একঘরে' 'ভারতভাণ্ডারি' প্রবন্ধ দুটি 'ভ্রমরে' (১২৮১ শ্রাবন সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। 'স্ত্রীজাতি বন্দনা' প্রবন্ধটি 'ভ্রমরে' (১২৮১ বৈশাখ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল। 'একঘরে' প্রবন্ধটি চিন্তাগর্ভ। প্রতিবাসীদের আচার-আচরণের কথা উল্লেখ করে একঘরে জীবনের ভোগান্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর সহজাত ব্যঙ্গ, কৌতুক রস পরিবেশিত হয়েছে 'স্ত্রীজাতি বন্দনা' প্রবন্ধে। সঞ্জীবচন্দ্র যে রসিক ছিলেন, তিনি যে ভারতভাণ্ডারি'র মত চুটকি রচনা করবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নয়।

'কীর্তন' প্রবন্ধটি 'ভ্রমরে' (১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। গ্রামজীবনে সেই যুগে 'কীর্তনে'র প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই 'কীর্তনে'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রবন্ধটি লিখতে উদ্বুদ্ধ হন।

"অকাতর বিবাহ' রচনাটি ১২৮৫, আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।"

আর্যজাতির চিত্রপট (১২৮২র আষাঢ় সংখ্যায়) ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। লেখক হিসাবে নাম আছে—শ্রীলালমোহন শর্মা; কিন্তু শচীশবাবু উক্ত প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের বলে লিখে গেছেন। তাহলে সঞ্জীবচন্দ্র কি ছদ্মনামে বা বেনামে উক্ত প্রবন্ধটি রচনা করেন ?

সঞ্জীবের 'দুর্গাপূজা' রচনাটি (১২৮১ আশ্বিন) ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। 'আনারবক্সী, প্রবন্ধটি ভ্রমরে (নতুন পর্যায় আশ্বিন-২য় সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র ভ্রমরের (১২৮১র বৈশাখ, ১ম সংখ্যায়) 'ভ্রমর' প্রবন্ধে সম্পাদকীয় ভাষায় বলেন—"আমরা এক সুচতুর শিল্পকরকে ভ্রমরের একটি চিত্র খোদিত করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আমাদিগকে চিত্রের একটি আদর্শ দেখাইলেন। দেখিলাম যে এক পদ্ম, পদ্ম পত্রসহিত শোভিত, তাহার উপর বসিয়া এক মৌমাছি। আমরা শিল্পকরকে বলিলাম—এ যে মৌমাছি।

তিনি, বলিলেন—আজ্ঞে না, এই ভ্রমর।

আমরা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে আসিলাম। আমরাও বোধ করি শিল্পকরের অনুকারী। আমরা বলিয়াছিলাম, ভ্রমর প্রকাশ করিব—হয়ত, আমাদেরও ভ্রমর মৌমাছি হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, ভরসা করি পাঠক সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে যাইবেন।" এতো সম্পাদকেরই কথা। পরের বছরে, 'ভ্রমরের আত্মকথা' (১২৮২, বৈশাখ) প্রবন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন—"ভ্রমরের বয়ক্রম একবৎসর পরিপূর্ণ হইল। এই অল্পকাল মধ্যে ভ্রমর যেরূপ আদরিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যাশা করি নাই। ভ্রমর অতি নম্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, জন্মবার্তা কোন সংবাদপত্রে পাঠান হয় নাই, কুলা বাজাইতে কাহাকেও ডাকা যায় নাই; অথচ বাংলার পদ্ম মাত্রেই ভ্রমরের বার্তা পাইয়াছেন। একণে যেখানে পদ্ম সেইখানেই ভ্রমর। যে গৃহে ভ্রমর যায়না, আমরা শুনিয়াছি সে গৃহে পদ্ম নাই, কেবল শিমুল শর্মারা বাস করেন।"

'ভ্রমর' পত্রিকার অন্তর্ভুক্তে এই দুটি রচনা সম্পাদকের মুখবন্ধ বললে ভুল হবেনা। লেখা দুটিতে সঞ্জীবের ভ্রমরের সম্পাদক হিসাবে মানসিক প্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়।

'ভ্রমরের আত্মকথা'য় সম্পাদকেরই আত্মকথা প্রকাশ পেয়েছে।

'ভ্রমরে'র কিছু কিছু রচনা লেখককে আবিষ্কার করা এখনো যায়নি; তবে

যতদূর মনে হয়—'ভ্রমরে'র 'ভূতের সংসার' রচনাটি সঞ্জীবচন্দ্রের, কারণ লেখাটি স্ত্রীজাতির সম্পর্কিত লেখা। 'গৃহিনীদের' প্রতি সঞ্জীবের স্বভাবগত অনাস্থা ছিল। তাছাড়া 'ভূতের জাতি' নামে তিনি তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে এবং 'প্রচারে' (১২৯৩ অগ্রহায়ণ-পৌষ ৩য় বর্ষ ৫—৬ সংখ্যা) 'গৃহিনীদের বিবাহের ঘটকালি' নামে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

শচীশবাবু যে তালিকা তৈরী করেছেন,—তাতে 'বাহুবল' প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা বলা হয়েছে। রচনাটি প্রকাশিত হয় ভ্রমরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'ভ্রমর' (অধুনালুপ্ত) পত্রিকার একটি কালানুক্রমিক সূচীপত্র প্রদত্ত হল। 'বঙ্গদর্শনের' ন্যায় 'সাধারণতঃ লেখক-বর্গের নাম প্রকাশ হত না। প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমে কিছু হয়তো নাম থাকত। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রেরও নাম থাকত না ভ্রমরে। একশত বছর আগেকার পুরাতন 'ভ্রমর' (দুষ্প্রাপ্য) পত্রিকার লেখক-তালিকা উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছি। তালিকায় সঞ্জীবচন্দ্র ছাড়া আর অন্যান্য কোন্ কোন লেখকের রচনা প্রকাশ পেয়েছে, তারই পরিচয় দেওয়া হল। পত্রিকার প্রতি-সংখ্যার পৃষ্ঠা ও রচনার বিবরণ এই তালিকায় সূচিত হল।

'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'র সৌজন্যে প্রামাণিক তথ্য ও সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হল।

ভ্রমরের কালানুক্রমিক সূচীপত্র

প্রথম বর্ষ ॥

* প্রথম সংখ্যা, ১২৮১, বৈশাখ—পৃষ্ঠা ৩০

ভ্রমর (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রামেশ্বরের অদৃষ্ট (উপন্যাস) ঐ

নিদ্রা—(অজ্ঞাত)

জলে ফুল (কবিতা)—জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রীজাতি বন্দনা (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* (এই সংখ্যায় কোন লেখকের নাম ছিল না)

দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ, পৃষ্ঠা ৩০

দামিনী (উপন্যাস-১ম হতে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* জলজসুন্দরী (কবিতা)—শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ

নূতন হীরের সৃষ্টি (অজ্ঞাত)

ভারতভাণ্ডারী—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* (শুধু জলজসুন্দরী-র লেখকের নাম ছিল)

তৃতীয় সংখ্যা, ১২৮১, আষাঢ, পৃষ্ঠা ২৪

বৃষ্টি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কণ্ঠমালা (১ম-৫ম পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* জলে আলো (কবিতা)—শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ

* (শুধু 'জলে আলো'র লেখকের নাম ছিল)

* চতুর্থ সংখ্যা, ১২৮১, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা ২৪

কণ্ঠমালা (উপন্যাস-৬ষ্ঠ-৯ম পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একঘরে (প্রবন্ধ) ঐ

ভারতভাণ্ডারি (প্রবন্ধ) ঐ

* (চতুর্থ সংখ্যার সমস্ত রচনাই সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের)

পঞ্চম সংখ্যা, ১২৮১, ভাদ্র, পৃষ্ঠা ২৪

কণ্ঠমালা (উপন্যাস-১০ম-১৩শ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনন্ত (প্রবন্ধ)—অজ্ঞাত

* ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮১, আশ্বিন-পৃষ্ঠা ২৪

কণ্ঠমালা (উপন্যাস-১৪শ-১৭শ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপূজা (প্রবন্ধ) ঐ

প্রভাবে যামিনী—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
* (কোন লেখাতেই লেখকের নাম ছিল না।)

সপ্তম সংখ্যা, ১২৮১, কার্ত্তিক, পৃষ্ঠা ২৪

বঙ্গে দেবপূজা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কণ্ঠমালা (উপন্যাস ১৭শ-১৯শ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অষ্টম সংখ্যা, ১২৮১, অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা ২৪

বঙ্গে দেবপূজা (প্রতিবাদ প্রবন্ধ) (লেখার শেষে বঃ আছে)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্বপন (কবিতা)—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কণ্ঠমালা (২০শ-২২শ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম সংখ্যা, ১২৮১, পৌষ, পৃষ্ঠা ৩০

বঙ্গে দেবপূজো (প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সংকার (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কণ্ঠমালা (২৩শ-২৪শ পরিচ্ছেদ) ঐ

দশম সংখ্যা, ১২৮১, মাঘ, পৃষ্ঠা ২৪

খাদ্যাখাদ্য—অজ্ঞাত
কণ্ঠমালা (২৫শ-২৭ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একাদশ সংখ্যা, ১২৮১, ফাল্গুন, পৃঃ ২৪

কণ্ঠমালা (২৮শ-৩০ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাহুবল (প্রবন্ধ) ঐ

সংস্কার (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বাদশ সংখ্যা, ১২৮১, চৈত্র, পৃষ্ঠা-২৪

সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপস—
চন্দ্রলোক (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কণ্ঠমালা (৩১শ-৩২ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালার শূর বংশ—অজ্ঞাত

দ্বিতীয় বর্ষ

প্রথম সংখ্যা, ১২৮২, বৈশাখ, পৃষ্ঠা-২৪

ভ্রমরের আত্মকথা—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গে পাঠক সংখ্যা—(অজ্ঞাত)
কণ্ঠমালা (৩৩শ-৩৫শ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নক্ষত্রের প্রতি (কবিতা)—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যাত্রা (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৮২, জৈষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২৪

কীর্তন—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কণ্ঠমালা (৩৬শ-৩৭ পরিচ্ছেদ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কাতরা ময়ূরী (কবিতা)—শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র

তৃতীয় সংখ্যা, ১২৮২, আষাঢ়, পৃষ্ঠা-২৪

আমি—অজ্ঞাত
কীর্ত্তন (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
• আর্যজাতির চিত্রপট—শ্রীলালমোহন শর্মা

শরৎশশী (কবিতা)—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ

* (শতঞ্জীববাবু আর্যজাতির চিত্রপট প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের বলে তাঁর তালিকায় চিহ্নিত করেছেন)

নতুন পর্যায় ভ্রমর প্রকাশিত হয় ১২৮৫, ভাদ্রমাসে

প্রথম সংখ্যা, ১২৮৫, ভাদ্র; পৃষ্ঠা ২৪

ভ্রমর (কবিতা)—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাল্যবিবাহ (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভূতের সংসার (প্রবন্ধ) ঐ

দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৮৫, আশ্বিন, পৃষ্ঠা ২৪

অকাতরে বিবাহ (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হৃদয় উচ্ছ্বাস (কবিতা)—শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত
বিধবা (প্রবন্ধ)—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
* আনার বন্দী—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সঞ্জীবের কিনা সন্দেহ আছে)

নির্দেশিকা

১। "সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনে দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্র (সঞ্জীবনী সুধা—১৮৯৩)

২। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন। 'ভ্রমর'

ভ্রমর নামে একখানি অভিনব মাসিকপত্র বঙ্গদর্শন কার্যালয় হইতে বৈশাখ অবধি প্রকাশ হইতেছে।

যাহা যাহা সুখ পাঠ্য এবং যাহাতে বিশুদ্ধ আমোদ ও সুশিক্ষা একত্রে মিলিত করা যায়, তাহাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। উপন্যাস, পদ্য, কৌতুকাবহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, দেশীয় সামাজিক কথা ইত্যাদি বিষয় এই পত্রে লিখিত হইবে। যাহাতে কৃতবিদ্য এবং অল্পজ্ঞান—উভয়শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন হয় এমত যত্ন করা যাইবে।

ইহার মূল্য অতি অল্প। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১। টাকা ও ডাকমাশুল। মোট ১ ॥ । পশ্চাদ্দেয় মূল্য ১ ॥ ডাকমাশুল। মোট ২ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের গ্রাহক তাঁহারা ৫ টাকার একখানি নোট পাঠাইলে দুই পত্রই পাইতে পারিবেন।

ভ্রমরের আকার ১২ পেজি রয়েল ২৪ পৃষ্ঠা। ইহা প্রতিমাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশ হয়। গ্রাহকগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট নাম ও মূল্য পাঠাইবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গদর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ (১২৮১ জ্যৈষ্ঠ)

৩। সঞ্জীবনী সুধা (১৮৯৩)—বঙ্কিমচন্দ্র

৪। শতঞ্জীব কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা।

৫। 'শতঞ্জীববাবু তাঁর তালিকায় দুটি রচনাকে সঞ্জীবচন্দ্রের না বলে ভুল করেছেন। ঐ রচনা দুটি হল—ভ্রমরের প্রথম সংখ্যায় প্রথম রচনা 'ভ্রমর'। যেটি পত্রিকার মুখবন্ধে সম্পাদকের কথা। আর ভ্রমর এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ১২৮২-র বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম রচনা 'ভ্রমরের আত্মকথা'। এই লেখাদুটি যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই।" গোপালচন্দ্র রায়—সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য : দেশ, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৯।

৬। প্রথম সংস্করণ বিজ্ঞাপন—"ভ্রমর নামক মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসের সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। ভ্রমর পত্রিকা বন্ধ হওয়ায় গল্পটি শেষ হইতে পারে নাই, এক্ষণে শেষ করা গেল।" —সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থকারের বক্তব্য, কণ্ঠমালা।

৭। সঞ্জীবগ্রন্থাবলী—ভূমিকা—পৃঃ ২১, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। বাঙলাসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। "শতঞ্জীববাবুর তৈরী তালিকায় 'অকাতর বিবাহ' এবং 'কীর্ত্তন' প্রবন্ধ দুটিকে সঞ্জীবচন্দ্রের বলা হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই হিসাবে 'অকাতরে বিবাহ' প্রবন্ধটিও লেখা তাঁরই পক্ষে সম্ভব, আর তিনি যাত্রার উপর একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন বলে, কীর্ত্তন নিয়ে প্রবন্ধ লেখাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।"—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য। দেশ, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৯।

সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পর্ক একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম চার বৎসব বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক ছিলেন (১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে ১২৮৩-এর চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত)। একবছর বঙ্গদর্শন বন্ধ থাকার পর বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক হন —বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র। কিন্তু বঙ্গদর্শন-এর সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক সূচনা থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র তা স্বীকার করে বলেছেন—"১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শনে দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন।"[১]

অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল যথেষ্ট। তাই বঙ্গদর্শন এর সম্পাদনার দায়িত্ব সঞ্জীবকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বরং কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এর মাধ্যমে তৎকালীন সাহিত্য-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রজের খেয়ালী জীবন-ধারাকে শৃংখলিত করার জন্যে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক-এর মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। তাছাড়া, বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী লেখকসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—সেই সম্প্রদায়ের অন্যতম স্রষ্টা সঞ্জীবচন্দ্র। সঞ্জীবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় লক্ষ্য করেই বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রজকে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক নিযুক্ত করেন ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালেও বঙ্কিম লেখক তৈরীর কাজে তাঁর দায়িত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। ফলে বঙ্গদর্শনের পূর্বগৌরব অক্ষুন্ন ছিল। এ সম্পর্কে বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছেন—"বঙ্গদর্শন একবৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদনায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যত বঙ্গদর্শনের সর্বময় কর্তা ছিলেন।"[২] বঙ্কিম এই সময়ে লেখা নির্বাচন করতেন, সংশোধন করে দিতেন, পছন্দমতো লেখকদের লেখা তিনি চেয়ে নিতেন।

১২৮৪ থেকে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে যেমন প্রবন্ধ, উপন্যাস, গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশ হত, সঞ্জীবচন্দ্রের আমলে অনুরূপ উপন্যাস, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশ পেত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১২৮৪), 'রাজসিংহ' (১২৮৫), 'আনন্দমঠ' (১২৮৭-৮৯), 'দেবী চৌধুরাণী' (১২৮৯) সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের লেখা প্রবন্ধ, উপন্যাস, রহস্যরচনা নিয়মিত প্রকাশ পেয়েছে। 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ' (১২৮১) 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ' 'বৈজিকতত্ত্ব' (১২৮৪), 'মাধবীলতা' (১২৮৮), উপন্যাস, 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রকাশ পায়।

বঙ্কিম সম্পাদনাকালে 'বঙ্গদর্শনে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণামূলক ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'ভারত মহিলা' (১২৮২) যেমন প্রকাশিত হয় তেমনি সঞ্জীব সম্পাদনাকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'আমাদের গৌরবের দুই সময়' (১২৮৪, বৈশাখ), 'ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ' (প্রবন্ধ, ১২৮৪, শ্রাবণ), শংকরাচার্য কি ছিলেন (প্রবন্ধ, ১২৮৪, আশ্বিন), বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা (প্রবন্ধ, ১২৮৪, পৌষ), কালিদাস ও সেক্সপীয়র (১২৮৫, বৈশাখ), বাল্মীকির জয় (১২৮৭, পৌষ, মাঘ, চৈত্র), বাঙলার সাহিত্য (১২৮৭, ফাল্গুন), বাংলা ভাষা (১২৮৮, শ্রাবণ) প্রভৃতি নামকরা প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যাঁরা প্রথম থেকেই বঙ্গদর্শনে লিখতেন,তাঁরা সকলেই সঞ্জীবচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকালে লিখতেন। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনকে সমৃদ্ধ করতেন। বঙ্কিম নিজেই সঞ্জীবনী সুধা প্রবন্ধে তা স্বীকার করেছেন।[৩] অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের সময়ে বঙ্গদর্শন-এর গৌরব অক্ষুণ্ণ ও অম্লান ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হলেও, তাঁকে পরিচালনা করতেন—স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। সকল লেখকের ওপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল. অনুরূপ অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও তার কড়া নজর ছিল। 'বঙ্গদর্শন' এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও লেখার মান নিম্নস্তরের হলে তিনি দাদাকে সতর্ক করে দিতেন। যখন ১২৯০ সালে চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশ ঘটে, তখন কথাপ্রসঙ্গে বলেন বঙ্গদর্শনের মান খারাপ হলে গালাগালি খাবে। এবং বলেন—"মেজদাদাও খান। সে বারে দুই মাস বঙ্গদর্শনের টোন্ বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬/৭ মাস লিখি নাই।" অবশ্য শ্রীশচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ১২৯০-এর কার্তিক-মাঘ পর্যন্ত চলেই বন্ধ হয়ে যায়।[৪]

বঙ্গদর্শনের মধ্যে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিষয়ক প্রবন্ধই প্রধান। সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে তাঁর যেমন ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিতে সমাজমনস্কতা লক্ষণীয়। বস্তুত সঞ্জীবচন্দ্র রসজ্ঞ স্রষ্টা ছিলেন। তাঁর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্গদর্শন-এর প্রথম প্রবন্ধটির মধ্যে। রচনাটির নাম—'যাত্রা', 'বঙ্গদর্শন'-এর দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, প্রথম অংশটি প্রকাশিত হয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় ও শেষ অংশটি ১২৮০ কার্তিক সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ লাভ করে। প্রথমদিকে যাত্রা-সমালোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কবিত্ব ও দর্শকদের রসবোধের আলোচনা করেন, দ্বিতীয়ভাগে লেখক যাত্রার অভিনয় ও তার কলাকৌশল ও নৃত্যগীতের পর্যালোচনা করেন। রচনাটি তথ্যসমৃদ্ধ ও রসগর্ভ। লেখকের কৌতুক-রসসিক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়।[৫]

বঙ্গদর্শনে তাঁরই সম্পাদনাকালে বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনাটি ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ (নবম সংখ্যা), মাঘ (দশম সংখ্যা) ও ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১ম), আষাঢ় (৩য়), শ্রাবণ (৪র্থ) ও আশ্বিনে (৬ষ্ঠ সংখ্যা)। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে এই বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনীটি নিজের নামে প্রকাশিত হয়নি; প্র. না. ব.—এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। পালামৌ রচনাটির উৎকর্ষ লক্ষ্য করে অনেকেই সন্দেহ করেন যে লেখাটি আদৌ সঞ্জীবচন্দ্রের কিনা। কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের সন্দেহ নিরসন করে 'সঞ্জীবনী সুধায়' লিখেছেন—'প্রমথনাথ বসু ইতি কাল্পনিক নামের আক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি ঐগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁর রচনা, তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।'

সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত—'বৈজিকতত্ত্ব' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষের ৫টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁরই সম্পাদনাকালে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ (অষ্টম), পৌষ (নবম), চৈত্র (দ্বাদশ) সংখ্যায় ও ১২৮৫-র বৈশাখ (প্রথম) সংখ্যা ও ভাদ্র (পঞ্চম) সংখ্যায় বৈজিকতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর জ্ঞানগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। রচনাটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের তা বঙ্কিমচন্দ্র

সঞ্জীবনীসুধায় আমাদের পরিচয় দেন ; বঙ্গদর্শনে নাম না থাকায় কার লেখা অনেকদিন পর্যন্ত তা আমরা জানতে পারিনি। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন) কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্বকে অবলম্বন করে এরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বাংলার বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এটি দুর্লভ নজির। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে তাঁর 'সঞ্জীবনী সুধা'য় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে সুদীর্ঘ পরিশ্রমসাপেক্ষ প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের। সঞ্জীবপ্রতিভার আরেকটি দিক এই রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্রের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'মাধবীলতা' ও 'জাল প্রতাপচাঁদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'মাধবীলতা' ১২৮৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (৪র্থ সংখ্যা), কার্তিক (৭ম সংখ্যা), অগ্রহায়ন (অষ্টম সংখ্যা), মাঘ (১০ম সংখ্যা) ফাল্গুন (১১শ সংখ্যা) ও ১২৮৮-র বৈশাখ (১ম সংখ্যা), প্রকাশিত হয়। আর 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসখানি ১২৮৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (৪র্থ সংখ্যা) ভাদ্র (৫ম সংখ্যা), আশ্বিন (ষষ্ঠ সংখ্যা) ও কার্তিক (৭ম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। 'মাধবীলতা' উপন্যাসে লেখক যে কালসীমার চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা আমাদের কাছে রহস্যাবৃত ও অপরিচিত। উপন্যাসের কাঠামো শিথিল অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে ভারাক্রান্ত। উপন্যাসে সঞ্জীবচন্দ্রের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে না।[৭] অথচ 'কণ্ঠমালা (ভ্রমর-এ প্রকাশিত)-এর পরবর্তী কাহিনী বর্তমানকালের উপর রচিত।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসটি ঘটনাবহুল উপন্যাস। আদালতের পুরাতন পুঁথি ও নথিপত্রের তথ্যাদি সংগ্রহ করে বর্ধমানের রাজ-বাড়ির 'জাল প্রতাপচাঁদকে নায়ক করে তিনি উপন্যাসের প্লট পরিকল্পনা করেন। ঘটনাসংস্থানে ও কৌতূহলজনক কাহিনী উপস্থাপনে লেখকের কৃতিত্ব বিস্ময়কর হলেও—'জাল প্রতাপচাঁদ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে সার্থক সৃষ্টি নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 'জাল প্রতাপচাঁদ'কে বিপুল ক্ষমতার অপচয় বলে মনে করেন।[৮]

বস্তুতঃ 'জাল প্রতাপচাঁদ' সঞ্জীবচন্দ্রের পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থ। একমাত্র তার ইংরাজী গ্রন্থ Bengal Ryots their Rights and Liabilities গ্রন্থটি ছাড়া এমন গবেষণাসাপেক্ষ গ্রন্থ তিনি কমই লিখেছেন।

বঙ্গদর্শনে অনেক রচনাই নামহীন অবস্থায় ছাপা হত। তাই বঙ্গদর্শনের লেখক আবিষ্কার করা কষ্টকর ব্যাপার। তবু বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের

রচনা বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন—হেমচন্দ্রের 'বৃত্র সংহার' ২য় খণ্ডের সমালোচনা। সঞ্জীবচন্দ্রের উক্ত সমালোচনার প্রতি কটাক্ষপাত করে নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—'শুনিয়াছিলাম হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধেও বঙ্কিমবাবু 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করেন নাই। সঞ্জীববাবুই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' উহার এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন।" বৃত্রসংহার-এর সমালোচনাটি সঞ্জীব সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন (একাদশ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি বিশ্লেষণাত্মক কিন্তু 'বৃত্রসংহার' এর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা আবেগপূর্ণ। কবি নবীনচন্দ্র স্বভাবতঃ মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। সমালোচনাটি প্রথম থেকে শেষাবধি হেমচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। নবীনচন্দ্র লিখেছেন—"উহাতে 'বৃত্রসংহারে'র সাহিত্যিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্বশেষে 'বঙ্গদর্শনে'র ঘটকালিতে দর্শন-বিজ্ঞানের 'বৈবাহিক' কত প্রশংসাই ছিল।"

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধটি (১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১ম সংখ্যা) সঞ্জীবচন্দ্রের। 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধটির ছিন্ন পাণ্ডুলিপি কাঁঠালপাড়ায় অবস্থিত ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। পুত্র জ্যোতিষকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের একটি চিঠিতেও উক্ত প্রবন্ধটির উল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধটিতে চিন্তাশীল, দ্রষ্টা, প্রবক্তা সঞ্জীবচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা অনস্বীকার্য। সম্প্রতি 'দেশ' (১৩ অক্টোবর, ১৯৭৯) পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র রায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন প্রবন্ধটি প্রচুর পরিশ্রম করে সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছিলেন।[১] 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্মে'র পাণ্ডুলিপি, যা সঞ্জীবের নিজের হাতের লেখা তা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া পুত্র জ্যোতিষকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, যাতে 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম প্রবন্ধখানি বঙ্গদর্শনে পাঠিয়েছিলেন, সেই চিঠিখানির পাণ্ডুলিপি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই চিঠিতে সঞ্জীবচন্দ্রের হস্তাক্ষর ও বাংলায় সহি-কে অস্বীকার করা যায় না। চিঠিখানি ২১শে মার্চে লেখা।—

"প্রাণাধিকেষু, অনেক দিনের পর তোমার পত্র পাইলাম। আমি বাটী যাইয়া রাধানাথকে বঙ্গদর্শন কার্য হইতে একেবারে বিদায় দিব। আমি তাহাকে অদ্য পত্র লিখিলাম। তিনি....হিসাব বাটী আসিবেন। হিসাব দিতে পারিলেও তাঁহার হস্ত হইতে কার্যভার উঠাইয়া লইব। তোমার সেজকাকার ক....নহে।

রাধানাথকে তাড়া · তিনি বঙ্গদর্শন লিখি…নহে। তবে তাঁহার…বড় হইয়াছে। যে তাঁহার নিজের অনুগত না হইয়া অন্য ভ্রাতার অনুগত হইবে, সেই তাহার পরম শত্রু। তোমার nervousness গিয়াছে কিনা লেখ নাই। বোধহয় গিয়াছে। নতুবা এত বড় পত্র লিখিতে পারিতে না। আমি যে 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম'* বলিয়া আর্টিকেল পাঠাইয়াছি, ''তাহার গেলিপ্রুফ কি পৌছ…সম্বাদ কিছুই…না। ইতি ২১ মার্চ, সঞ্জীবচন্দ্র"

উপরিউক্ত চিঠিখানি থেকে কেবলমাত্র 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ-এর লেখককে পাওয়া গেল না, আমরা বুঝলাম সঞ্জীবচন্দ্র সেই সময় বঙ্গদর্শন-এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক। সুতরাং তাঁর মত ছাড়া অন্য কারো মতে তাঁর কর্মচারী ও প্রকাশক রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করলে সঞ্জীবচন্দ্র খুবই বিরক্ত হন। তাই রাধানাথকে পদচ্যুত করবেন,—সেই সতর্কবাণী এই চিঠির মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে। ১২৮৪ সাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'[১০] এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর করেন ও বিজ্ঞাপণ দিয়ে তা জানিয়ে দেন। সঞ্জীবের পুত্র জ্যোতিষ ১২৮৪ থেকে বঙ্গদর্শন-এর কার্য্যাধ্যক্ষ হন।[১১] তাঁরও দায়িত্ববোধ সচেতনতাপূর্ণ হওয়া উচিত—সঞ্জীব এই চিঠিতে তারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এর শুধু সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীই হননি, তিনি বঙ্গদর্শন-এর সমৃদ্ধিসাধনে ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

সঞ্জীব সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের একটি লেখক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল। খুব সাবধানে রচয়িতাদের খুঁজে বার করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন নিয়ে ইতিমধ্যে গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনা খুবই কম। এখানে কেবলমাত্র সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের কালানুক্রমিক রচয়িতার নাম সংকলিত হল। সঞ্জীবচন্দ্র পঞ্চম বর্ষ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৮৯ পর্যন্ত (চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত) বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন। কেবল ১২৮৬ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনের' কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।

পঞ্চম বর্ষ

বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা-১২৮৪

বঙ্গদর্শন (ভূমিকা)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্রবিপ্লব (প্রবন্ধ)

জৈনমত সমালোচনা (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

বুড়া বয়সের কথা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কেন ভালবাসি (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন।

আমাদের গৌরবের দুই সময় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—রায় দীনবন্ধু বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থাবলী।

জ্যৈষ্ঠ : দ্বিতীয় সংখ্যা-১২৮৪

ভারতে একতা (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

স্বপ্ন উন্মত্ততা (কবিতা)—নবীনচন্দ্র সেন

কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের গৌরবের দুই সময় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খদ্যোত (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—মালবিকা (লেখকের নাম নেই।)

বাংলা শিক্ষা—সিদ্ধেশ্বর রায়

সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীকৃষ্ণ দাস

সুধা—দ্বারকা অধিকারী।

আষাঢ় : তৃতীয় সংখ্যা-১২৮৪

সতীদাহ (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

বেদবিভাগ (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

ভুলোনা ও কুহুস্বর ভুলো না আমার (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যতা (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বোম্বাই ও বাঙ্গালা (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আমার মালা গাঁথা (রচনা)—ক্ব…… ।

শ্রাবণ : চতুর্থ সংখ্যা-১২৮৪

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (প্রবন্ধ)— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বঙ্গে ধর্মভাব (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
শান্তি ও সাহস শিক্ষা (প্রবন্ধ) ঐ
কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়
শৈশব সহচরী (ঐ)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালার সাহিত্য (সমালোচনা) ।

ভাদ্র : পঞ্চম সংখ্যা-১২৮৪

সর্পবিষ চিকিৎসা (সমালোচনা)
বোম্বাই ও বাঙ্গালা (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গে উন্নতি (প্রবন্ধ)
শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাহুবল ও বাক্যবল (প্রবন্ধ)—বঙ্কিকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিন : ষষ্ঠ সংখ্যা-১২৮৪

শংকরাচার্য কি ছিলেন ? (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নব বার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ (সমালোচনা)
পাঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায় (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
তর্কসংগ্রহ (প্রবন্ধ)
কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জন দফুয়াট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা (সমালোচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র

* মনুষ্যত্ব কি? বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ—২য় খণ্ড।

কার্ত্তিক : সপ্তম সংখ্যা-১২৮৪

কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব (প্রবন্ধ)
সতীদাহ প্রতিবাদ (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
আর্যগণের আচার ব্যবহার (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন
কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ডাহির সেনাপতি নাটক (সমালোচনা)

অগ্রহায়ণ : অষ্ঠম সংখ্যা-১২৮৪

বৈজিকতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তর্কসংগ্রহ—
কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব (প্রবন্ধ)
কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়

পৌষ : নবম সংখ্যা-১২৮৪

কমলাকান্তের পত্র (প্রবন্ধ)—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়
জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (মিল প্রদত্ত শিক্ষা) জীবনবৃত্তের সমালোচনা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বৈজিকতত্ত্ব (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(১) চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। (২) উপন্যাস মালা-শশিচন্দ্র দত্ত, (৩) ভারত উদ্ধার—রামদাস শর্মা।

মাঘ : দশম সংখ্যা-১২৮৪

মানব ও যৌন নির্বাচন (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
মণিপুরের বিবরণ (প্রবন্ধ)—কৈলাসচন্দ্র সিংহ
বৃত্রসংহার (২য় খণ্ড) (সমালোচনা)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ইউরোপে শকা সিংহের প্রজা (প্রবন্ধ)
তর্কতত্ত্ব (সমালোচনা)
কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফাল্গুন : একাদশ সংখ্যা-১২৮৪

জটাধারীর রোজনামচা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায় (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শংকরাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী (প্রবন্ধ)
শৈশব সহচরী (উপন্যাস)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কমলাকান্তের পত্র। পলিটিক্স—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বৃত্রসংহার (সমালোচনা)—সঞ্জীবচন্দ্র চন্দ্রোপাধ্যায়
কালবৃক্ষ (কবিতা)—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

চৈত্র : দ্বাদশ সংখ্যা-১২৮৪

সংযুক্ত (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তর্কসংগ্রহ
বৈদ্যিকতত্ত্ব (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ ॥

বৈশাখ : প্রথম সংখ্যা-১২৮৫

রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আকবর সাহেব (খাষোজ) (কবিতা)-ঐ
বৈজিকতত্ত্ব (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জটাধারীর রোজনামচা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালিদাস ও সেক্ষপীয়র (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
তর্কসংগ্রহ
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-(১) হেলানা কাব্য (২) আনন্দচন্দ্র মিত্র (৩) বীণা (মাসিক পত্রিকা)

জ্যৈষ্ঠ : দ্বিতীয় সংখ্যা-১২৮৫

রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তর্ক সংগ্রহ—
জটাধারীর রোজনামচা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
কুন্দনন্দিনী (সমালোচনা)—পূর্ণচন্দ্র বসু
বাঙ্গালা ভাষা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রাগ নির্ণয় (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(১) সুশিক্ষিত চরিত-মধুসূদন সরকার (২) নলিনী-অধরলাল সেন (৩) টকসিকো লজিকাল চার্ট-হরিশ্চন্দ্র শর্মা

আষাঢ় : তৃতীয় সংখ্যা-১২৮৫

রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তর্কসংগ্রহ
নানক (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত

জটাধারীর রোজনামচা—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাজের পরিবর্ত কর রূপ (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
রাগ নির্ণয়—রামদাস সেন
বন্ধুতা (কবিতা)—নবীন চন্দ্র সেন
একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(১) নিশিথ চিন্তা—রাজকৃষ্ণ রায়, (২) মানস-কুসুম—কেশবচন্দ্র ঘোষ, (৩) পরিচারিকা (মাসিক পত্র) (৪) হঠাৎ বাবু (লেখকের নাম নেই), (৫) প্রাইমারী গ্রামার—মথুরানাথ বর্মা (৬) কবিতা-যাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) পূরবালা সুরবালা—স্বর্ণলতা (৮) কুসুম কলিকা—প্রসন্নকুমার ঘোষ (৯) কুমারী কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী (১০) ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম-যোগেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রাবণ : চতুর্থ সংখ্যা-১২৮৫

রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বৈজিকতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জটাধারীর রোজনামচা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাচীন ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কমলাকান্তের পত্র (ঐ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙালীর মনুষ্যত্ব (প্রবন্ধ) ঐ
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(১) সার সংগ্রহ-আবদুল হামিদ খাঁ (২) ভগিনী বিলাপ-মহেন্দ্রনাথ দাঁ (৩) তত্ত্বদর্শন-পূর্ণচন্দ্র মিত্র।

ভাদ্র : পঞ্চম সংখ্যা-১২৮৫

জটাধারীর রোজনামচা—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গোৎসব (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙালীর বীরত্ব (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত
রাগ নির্ণয় (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

জুরীর বিচার—(প্রবন্ধ)
রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আশ্বিন ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা-১২৮৫

কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
জটাধারীর রোজনামচা—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
মণিপুরের বিবরণ (প্রবন্ধ)—কৈলাসচন্দ্র সিংহ
ভার্গব বিজয় (সমালোচচা)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
ইয়াং বাঙ্গালীর সামাজিক বুদ্ধি (প্রবন্ধ)
উৎকলের প্রকৃতাবস্থা (প্রবন্ধ)—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ত্তিক ঃ সপ্তম সংখ্যা-১২৮৫

সমাজ সংস্কার (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
উৎকলের প্রকৃতাবস্থা (প্রবন্ধ)—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জটাধারীর রোজনামচা—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতবর্ষের লোকবৃদ্ধির ফল (প্রবন্ধ)
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায়

অগ্রহায়ণ অষ্টম সংখ্যা-১২৮৫

রত্নরহস্য (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন
উৎকলের প্রকৃতাবস্থা (প্রবন্ধ)—দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জটাধারীর রোজনামচা—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
অশনি (কবিতা)—মনোরঞ্জন গুহ
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিত্ত মুকুর (সমালোচনা)
লোকশিক্ষা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(১) শরীর পালন-যদুনাথ মুখোপাধ্যায় জাতীয় উদ্দীপন-(লেখকের নাম নেই) (২) প্রকৃতিতত্ত্ব-শ্রীরাম পালিত (৩) দুঃখিনী-হরিশ্চন্দ্র সরকার (৪) ভুবনমোহিনী প্রতিভা-(লেখকের নাম নেই) (৫) কবিতানিকর-বসন্তকুমার ভট্টাচার্য (৬) কুসুম বিকাশ (লেখকের নাম নেই)।

পৌষ : নবম সংখ্যা-১২৮৫

মন্দর পর্বত (প্রবন্ধ)

রত্ন রহস্য (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তবু বুঝিল না মন (কবিতা)—ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার (প্রবন্ধ)

জটাধারীর রোজনামচা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাঘ : দশম সংখ্যা-১২৮৫

গুরুগোবিন্দ (প্রবন্ধ)

জটাধারীর রোজনামচা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার

মনুষ্যজাতির উন্নতি (প্রবন্ধ)

মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জেন্দ অবস্তা (প্রবন্ধ)

ফাল্গুন : একাদশ সংখ্যা-১২৮৫

বঙ্গোন্নয়ন (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জটাধারীর রোজনামচা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার

অশোক (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত

প্রত্যাখ্যান (কবিতা)
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-(১) বাল্য উদরাময়-গোবিন্দচন্দ্র দত্ত
(২) মানব সংস্কার—সেখ আব্দুল লতিফ

চৈত্র : দ্বাদশ সংখ্যা-১২৮৫

জটাধারীর রোজনামচা—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
এক্সচেঞ্জ (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
তৈল (রচনা) ঐ
চন্দ্রের বৃত্তান্ত (প্রবন্ধ)
বিবেক ও নৈরাশ্য (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গোন্নয়ন (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
পদোন্নতির পন্থা (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২৮৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা বেরোয় নি।

সপ্তম বর্ষ

বৈশাখ : প্রথম সংখ্যা-১২৮৭
ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সমাজ সংগঠন তত্ত্ব (প্রবন্ধ)
নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
স্বাধীন বাণিজ্য ও রত্নাকর (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
নৈষধ সমালোচক (প্রবন্ধ)

জ্যৈষ্ঠ : দ্বিতীয় সংখ্যা-১২৮৭

বঙ্গোন্নয়ন (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
তর্ক প্রণালী প্রবন্ধ (প্রবন্ধ)
খাজনা কেন দিই (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
অভিজ্ঞান শকুন্তলা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু

এত কাঁদি তবু কেন না জুড়ায় প্রাণ রে (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয়বার বিবাহ (প্রবন্ধ)
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-(১) হিন্দী ব্যাকরণ—হৃষীকেশ শাস্ত্রী

আষাঢ় : তৃতীয় সংখ্যা-১২৮৭

বঙ্গীয় শংকরাচার্যের নালিশ (প্রবন্ধ)—শংকরাচার্য বঙ্গদেশী
স্মৃতি কিংবা হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন (কবিতা)
বঙ্গ বৈজ্ঞানিক (প্রবন্ধ)
অভিজ্ঞান শকুন্তল (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
শিক্ষা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বাঙ্গালার জ্বর (সমালোচনা)
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রাবণ : চতুর্থ সংখ্যা-১২৮৭

মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মৎসদেশ (প্রবন্ধ)—হৃ. কি. ভ.
শংকরাচার্যের তিরস্কার (প্রবন্ধ)—শংকরাচার্য বঙ্গদেশী
ভূতের জাতি (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মাধবীলতা (উপন্যাস) ঐ
উপাসনা বিষয়ক তুলনা (প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র ঘোষ
হৃদয়-উদাস (রচনা)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-(১। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব—
রজনীকান্ত গুপ্ত। চিকিৎসক—শ্রীশচন্দ্র রায়

ভাদ্র : পঞ্চম সংখ্যা-১২৮৭

অভিজ্ঞান শকুন্তল—চন্দ্রনাথ বসু
কালেজি শিক্ষা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শশধর (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মালাচন্দন (প্রবন্ধ)।

আশ্বিন : ষষ্ঠ সংখ্যা-১২৮৭

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র
অভিজ্ঞান শকুন্তল—চন্দ্রনাথ বসু
রত্নতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন
পশ্চিমদেশে বাঙ্গালার জ্বর (সমালোচনা)

কার্ত্তিক : সপ্তম সংখ্যা-১২৮৭

নূতন খাজনার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউর মত (প্রবন্ধ)-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
অভিজ্ঞান শকুন্তল—চন্দ্রনাথ বসু
চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী (প্রবন্ধ)—সঃ স.
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ : অষ্টম সংখ্যা-১২৮৭

জোসেফ ম্যাটসিনি (প্রবন্ধ)—পূর্ণচন্দ্র বসু
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
* ভট্টাচার্য বিদায় প্রণালী (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঢাকা ও পূর্ববাঙ্গালা (প্রবন্ধ)

পৌষ : নবম সংখ্যা-১২৮৭

বঙ্গোন্নয়ন (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
চাকুরীর পরীক্ষা (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভিজ্ঞান শকুন্তল (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
পালামৌ (ভ্রমণবৃত্তান্ত)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র
বাল্মীকির জয় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
* যার কাজ সেই করুক (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মাঘ : দশম সংখ্যা-১২৮৭

বাঙ্গালার পাঠক পড়ান ব্রত (প্রবন্ধ)
রত্ন রহস্য (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাল্মীকির জয় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বাঙালীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জল (প্রবন্ধ)

ফাল্গুন : একাদশ সংখ্যা-১২৮৭

বাঙালীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালার সাহিত্য (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
পালামৌ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মাধবীলতা (উপন্যাস) ঐ

চৈত্র : দ্বাদশ সংখ্যা-১২৮৭

বাঙালীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আনন্দ মঠ (উপন্যাস) ঐ
গৃহ সন্ন্যাস (প্রবন্ধ)—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
বাল্মীকির জয় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
আমার পরাণ (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-(১) শম্ভুবংশ-চরিত—বনওয়ারিচন্দ্র

চৌধুরী, (২) ভারত মাহিনা-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৩) কৃষিশিক্ষা-কালীময় ঘটক (৪) কুসুমারিন্দম-ইন্দ্রনারায়ণ পাল ও সদানন্দ।

অষ্টম বর্ষ

বৈশাখ : প্রথম সংখ্যা-১২৮৮

আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচ চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ) ঐ
অলংকার শাস্ত্র (প্রবন্ধ)
মাধবীলতা (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যোগেশ—সমালোচনা

জ্যৈষ্ঠ : দ্বিতীয় সংখ্যা-১২৮৮

আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙালীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ) ঐ
বঙ্গোন্নয়ন (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
নূতন কথা গড়া (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (সমালোচনা)—পূর্ণচন্দ্র বসু
প্রলয়ের জলোপ্লাবন (প্রবন্ধ)
কল্পনা (মাসিক পত্রিকা সমালোচনা)

আষাঢ় : তৃতীয় সংখ্যা-১২৮৮

অভিজ্ঞান শকুন্তল (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি (কবিতা)
সাবেক মনুষ্যত্ব ও হালের 'সাইন করা' (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
রত্ন রহস্য (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালায় কলের (প্রবন্ধ)

শ্রাবণ : চতুর্থ সংখ্যা-১২৮৮

আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রঙ্গমতী কাব্য (সমালোচনা)
পালামৌ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রস (প্রবন্ধ)
বাঙ্গালা ভাষা (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
রত্ন রহস্য (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

ভাদ্র : পঞ্চম সংখ্যা-১২৮৮

বহুপতিত্ব (প্রবন্ধ)
ফুলের ভাষা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীঅঃ
* বঙ্গদেশের পরাধীনতা (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আহার বিবাহ (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কমলাকান্তের জবানবন্দী (রচনা) ঐ
কৃষিতত্ত্ব (মাসিক পত্রিকা সমালোচনা)

আশ্বিন : ষষ্ঠ সংখ্যা-১২৮৮

আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (সমালোচনা)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ফুলের ভাষা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
বাল্মীকির জয় (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
স্বভাবে কি অর্থ নাই (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগবল (প্রবন্ধ)

(১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত কোন সংখ্যা বেরোয়নি।)

নবম বর্ষ

বৈশাখ : প্রথম সংখ্যা-১২৮৯

বস্ত্র রহস্য (প্রবন্ধ)
আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
* কোজাগর পূর্ণিমা (কবিতা)
অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য (প্রবন্ধ)—শ্রী যো
ফুলের ভাষা (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
ঢেঁকি (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ : দ্বিতীয় সংখ্যা-১২৮৯

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য—যোগেশচন্দ্র রায়
আনন্দমঠ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
একটি প্রিয় জলাশয় (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা ইতিহাসের ভগ্নাংশ (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বহু পত্নীত্ব (প্রবন্ধ)
প্রকৃতি (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-(১) সভার কার্যনির্বাহবিষয়ক বিধি (২) বন-প্রসূন-মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (৩) দুই শিকারী (লেখকের নাম নাই)

আষাঢ় : তৃতীয় সংখ্যা-১২৮৯

বাঙ্গালীদিগের পৌরুষ (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বিষ্ণুপুর হইতে মহারাষ্ট্রদিগের প্রস্থান (প্রাচীন কবিতা)
অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য—যোগেশচন্দ্র ঘোষ
মহারাজ নন্দকুমার (প্রবন্ধ)
কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সেইদিন (কবিতা)—মোহিনী মোহন দত্ত
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-(১) মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র—রাধানাথ মৈত্র।
২) প্রবাহ (মাসিক সান্দর্ভ), (৩)রাজ উদাসীন-শাক্যসিংহ ও রামমোহন রায় (৪) যাবনিক পরাক্রম—নীলরতন রায়চৌধুরী।

শ্রাবণ : চতুর্থ সংখ্যা-১২৮৯

কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
জাল প্রতাপচাঁদ (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অদৃষ্ট (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচনা

ভাদ্র : পঞ্চম সংখ্যা-১২৮৯

কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)—হরপ্রসাদ.শাস্ত্রী
অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য—যোগেশচন্দ্র ঘোষ
কোকিল (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
জাল প্রতাপচাঁদ (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিন : ষষ্ঠ সংখ্যা-১২৮৯

মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয় (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জাল প্রতাপচাঁদ (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কার্ত্তিক : সপ্তম সংখ্যা-১২৮৯

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য—যোগেশচন্দ্র রায়
কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
কাকাতুয়া (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জাল প্রতাপচাঁদ (উপন্যাস)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গে বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)

অগ্রহায়ণ : অষ্টম সংখ্যা-১২৮৯

রজনীর মৃত্যু (কবিতা)—অক্ষয়কুমার বড়াল
অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য—যোগেশচন্দ্র ঘোষ
রত্ন রহস্য—রামদাস সেন
জগৎ শেঠ (প্রবন্ধ)—রজনীকান্ত গুপ্ত
কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ইহলোক ও পরলোক (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
মেঘদূত (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : (১) উদাহরণ বা অপূর্ব মিলন—রাধানাথ মিত্র, (২) মায়াবতা—রাধানাথ মিত্র (৩) সতী বাসনা—ঈশানচন্দ্র সেন (৪) বসন্তোপহার (সংগ্রহ)।

পৌষ : নবম সংখ্যা-১২৮৯

জীবন্ত মানুষের ভূত (প্রবন্ধ)
কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
জীবন ও পরলোক (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু
রাজা সিতার রায় (প্রবন্ধ)
মেঘদূত (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
পঞ্চভূত (প্রবন্ধ)
দেবী চৌধুরানী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র

মাঘ : দশম সংখ্যা-১২৮৯

দেবী চৌধুরানী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুপত্নী (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু

হুহুমদ্বারু সংবাদ (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(১) শরীর রক্ষণ—অন্নদাচরণ খাস্তগির (২) কুসুম—কানন-অধরলাল সেন, (৩) হৃদয়-প্রতিধ্বনি-পুলিনবিহারী দত্ত (৪) তৃণপুঞ্জ-জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, (৫) পদ্য-ব্যাকরণ (লেখকের নামোল্লেখ নেই, (৬) কবিতা-কল্প-লতিকা-রাজকৃষ্ণ দত্ত, (৭) ফুলের সাজি—কুঞ্জবিহারী বসু।

ফাল্গুন : একাদশ সংখ্যা-১২৮৯

দেবী চৌধুরানী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোথা রাখি প্রাণ (কবিতা)—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘদূত (প্রবন্ধ)-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(রচনা)-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোরাধ্যায়

যাত্রার ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)—প্রবন্ধ

কোথায় (প্রবন্ধ)—চন্দ্রনাথ বসু

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : (১) বিনোদ মালা (লেখকের নাম নেই), (২) বনফুল (লেখকের নাম নেই), যাদবনন্দিনী কাব্য (লেখকের নাম নেই), (৪) সুখধামবিনাম-মহিমচন্দ্র গুপ্ত, (৫) পদ্য-কুসুমাবলী (লেখকের নাম নেই), (৬) দুঃখসঙ্গিনী (লেখকের নাম নেই)।

চৈত্র : দ্বাদশ সংখ্যা-১২৮৯

রত্নালংকার (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন

দেবী চৌধুরানী—বঙ্কিমচন্দ্র

সিরাজউদ্দৌল্লা (প্রবন্ধ),—বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (১) রাজস্থান—যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যো (২) গ্রন্থাবলী : গদ্য ও পদ্য—রাজকৃষ্ণ রায়।

নির্দেশিকা

১। 'সঞ্জীবনীসুধা', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৮৬৮

২। হরপ্রসাদ রচনাবলী। ১ ম খণ্ড।

৩। সঞ্জীবের সাহিত্যানুরাগ বাল্যকাল থেকেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনীসুধা' প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর ৪ বৎসর পর লিখেছিলেন —"আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন একবৎসর বন্ধ থাকিলে পর তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন।'

৪। সঞ্জীবচন্দ্রকে চিঠি দিয়ে (২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪) জানিয়ে দেন, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন হবার পর আর যেন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত না হয়।

৫। 'সঞ্জীবচন্দ্র' 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর'-এর সম্পাদক না হলে সাহিত্যক্ষেত্রে কোনোওদিন অবতীর্ণ হতেন কিনা সন্দেহ। কারণ ঐ দুটি পত্রিকাতেই তাঁর যাবতীয় রচনা প্রকাশিত হয়। বোধ করি কনিষ্ঠের উৎসাহে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে থাকবেন বলে মনে হয়।' ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সঞ্জীব রচনাবলী, ভূমিকা-পৃঃ ৪৩)।

"তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) তাঁর তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া "ভাল প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।" (সঞ্জীবনী সুধা। বঙ্কিমচন্দ্র)।

৬। "এতদিন 'বৈজিকতত্ত্ব' বঙ্গদর্শনের বিবর্ণপত্রের আশ্রয়ে বন্দিজীবন যাপন করছিল। এখন মুদ্রিত হওয়াতে পাঠকগণ এর থেকে সঞ্জীব প্রতিভার আর একটি বিচিত্র দিকের পরিচয় পাবেন।...আমাদের বিশ্বাস সাহিত্যরসিক সঞ্জীবচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাগ্রাহ্য অন্যান্য রচনাগুলির গুণগত উৎকর্ষে তাঁর কথা শিল্পের চেয়ে কোন দিক

দিয়েই নূতন নয়। এ বিষয়ে 'বৈজ্ঞিকতত্ত্ব' একটি দুর্লভ প্রবন্ধ।"
—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সঞ্জীব রচনাবলী। ভূমিকা-পৃঃ ৪৫-৪৬)

৭। "মাধবীলতা উপন্যাসটি যে অতীতের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহা আমাদের নিকট অপরিচয়ের রহস্যে আবৃত রহিয়া গিয়াছে। সেটা যে কোন যুগ, কতদিন পূর্বের সমাজচিত্র, তাহা আমাদের নিকট অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত থাকিয়া যায়—লেখকের কালজ্ঞাপক ইঙ্গিতগুলি অঙ্গুলিনির্দেশও সে বিষয়ে আমাদিগকে নিঃসংশয় করিতে পারে।… মুসলমান ইংরেজ প্রভাবের ক্ষীণতম ইঙ্গিতও গ্রন্থে অনুপস্থিত।" ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)।

৮। "জাল প্রতাপচাঁদ নামক গ্রন্থ সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান, প্রমাণ বিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতুহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকেনা—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন, তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য প্রস্তরের উপর খোদিত করা উচিত তাহা বালুকার উপরে অংকিত করিলে আক্ষেপের উদয় হয়।"—রবীন্দ্রনাথ (সঞ্জীবচন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য। পৃঃ ৪৭)।

৮। নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী (আমার জীবনে, পৃঃ ৪৬৬), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৯। "এই প্রবন্ধটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজেরই লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ ছিন্ন অবস্থায় আজও ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় আছে। আর ঐ পাণ্ডুলিপি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা"। (গোপালচন্দ্র রায়ঃ সাপ্তাহিক দেশ। অক্টোবর ১৯৭৯)

* চিঠিখানি ঋষি বঙ্কিচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

১০। "বঙ্গদর্শন একবৎসর বন্ধ থাকিলে পর তিনি আমার নিকট ইহার

স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন।" (সঞ্জীবনী সুধা)।

১১। "১২৮৪ বঙ্গাব্দে বৈশাখে বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেন—"বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে কেহ আমাকে পত্র লিখিবেন না। আমি বঙ্গদর্শন সম্পাদক নহি। এরূপ পত্রের আমি কোন উত্তর দিই না। আমার পুস্তকাদি সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে আমার নিজ কার্যকারক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বঙ্গদর্শন কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিবেন। আমাকে লিখিলে উত্তর পাইবেন না।"

কার্যাধ্যক্ষ জ্যোতিষ কর্তক বঙ্গদর্শনের নিয়মাবলী যেরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

বঙ্গদর্শনের নিয়মাবলী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩	ডাকমাশুল।	মোট ৩।
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৪ ॥	" ।	",৪৮

১। ডাকের টিকিট পাঠাইলে স্বতন্ত্র এক আনা কমিশন টাকা প্রতি দিতে হইবে। ডাকের টিকিট অর্ধ আনা মূল্যের অধিক পাঠাইবার আবশ্যক নাই।

২। যাঁহারা মণিঅর্ডার পাঠাইবেন, তাঁহারা হুগলীর কালেক্টরীতে আমার নামে পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন না।

৩। বেয়ারি বা ইনসফিসেণ্ট পত্রাদি আমরা লইব না।

৪। আমরা পূর্বমত আর মূল্যপ্রাপ্তি বঙ্গদর্শনে স্বীকার করি না, মূল্য পাইলেই গ্রাহকদিগের নিকট স্বতন্ত্র রসিদ দুই সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছে, তবে বুঝিতে হইবে যে মূল্য আমাদের হস্তগত হয় না।

৫। বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দিবার খরচা নিম্নলিখিত মত পাওয়া যাইবে প্রতি পংক্তি—প্রতি কলম ৩ ॥ প্রতি পৃষ্ঠা-৬, আর্ট পেজ-৪৫। তিনবারের অধিক হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।

বঙ্গদর্শন কার্যালয়। কাঁটালপাড়া। নৈহাটী পোষ্ট অফিস।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চট্টো
কর্মাধ্যক্ষ
১১৭৪ অগ্রহায়ণ।

সঞ্জীবচন্দ্রের সহস্তে লিখিত 'ভবিষ্যৎ হিন্দু ধর্ম' ও 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধটির ছিন্ন পাণ্ডুলিপি এখনো নৈহাটি বঙ্কিম গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

সমকালীন লেখক ও সমালোচকদের বিচারে সঞ্জীবচন্দ্র

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সমকালের চোখে এক বিচিত্র ব্যক্তি। তাঁর জীবনযাত্রা, সামাজিকতা বোধ, ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে বিচিত্র বিস্ময়ের বীজ সুপ্ত ছিল। সাহিত্যচর্চার সূত্রেই সঞ্জীবচন্দ্র সমকালীন লেখক ও সাহিত্যরসিক মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রধান পুরোহিত তেমনি সঞ্জীবচন্দ্র স্বভাবগুণে হয়ে ওঠেন সাহিত্যবাসরের প্রাণপুরুষ। শুধু কাহিনীপাগল পাঠক সমাজে নয়, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে তৎকালীন বাংলার সারস্বত সমাজে।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর চারবৎসর পর কনিষ্ঠভ্রাতা বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা'য় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐ একই সংকলনে সঞ্জীব-সুহৃদ ও সাহিত্য-সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য সমালোচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ', 'কণ্ঠমালা', 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে সঞ্জীব-সাহিত্যের সমালোচনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক অংশে স্মৃতিচারণা উপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে তাঁর স্বভাববৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য-বৈচিত্র সহজেই উপলব্ধি করা যায়:

"আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত, আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম, সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের

দেখিতে পাওয়া যায়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে একটি ব্যাপার সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সমকালীন সারস্বত সমাজে সঞ্জীবচন্দ্র খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। বস্তুত, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার সরকার, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণের নিকট সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে যিনি অতি নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন তিনি হলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। সঞ্জীবচন্দ্র সমাজদরদী শিল্পী ছিলেন। আজীবন লোকহিতের জন্য কলম ধারণ করেছিলেন। যাঁরা তাঁর প্রবন্ধগুলি পাঠ করবেন, তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন—সঞ্জীবচন্দ্রের বিচিত্রমুখী প্রতিভা। কারণ তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' পত্রিকায় লেখকের নাম না থাকায় পাঠকসমাজ তাঁর রসসিক্ত প্রবন্ধগুলির পরিচয় জানতে পারত না, ফলে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত সত্যিই প্রণিধানযোগ্য:

"কোন কারণে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার জীবিতকালে বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পাবেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্যন্ত বাঙ্গালাসাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনি তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্বক পাঠক করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন।"

সমালোচক বঙ্কিমের উপরিউক্ত মন্তব্য আমরা যথার্থই বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আরেকটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য: "কালে সে-আসন প্রাপ্ত হইবেন।.. কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর।"

বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় সাবধানে অগ্রজের জীবনী ও সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় লেখনী ধারণ করেছিলেন। পাছে ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর পড়ে না যায় সেইজন্য প্রবন্ধকার বঙ্কিমকে লেখনী সংযত করতে হয়েছিল। প্রবন্ধকার স্বভাবত সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটু সঙ্কুচিত ভাবেই লিখেছিলেন—'সকল মানুষেরই দোষগুণ দুই-ই থাকে; গুণকীর্ত্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে; কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানেনা; সুতরাং

১। জীবনস্মৃতি (চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬৮)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমিই লিখিতে বাধ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র যথাসম্ভব লেখনী সংযত করে লেখকের ভালমন্দ, দোষ-ক্রটিবিচ্যুতি সুখদুঃখপূর্ণ জীবনের যে বিচিত্র দিকের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন, তারই ভেতর দিয়ে সঞ্জীবপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবসাহিত্য বিশ্লেষণ না করলেও সমকালে লিখিত সমালোচনা হিসাবে প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সমালোচক লিখেছিলেন—

"ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ-ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরম সুহৃদ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছে।"

কিন্তু প্রবন্ধকার সঞ্জীবজীবনী লিখতে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে যে কটি মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন তাতে সমালোচক বঙ্কিমের আত্মপ্রকাশ অতি সহজেই লক্ষণীয়। 'Bengal Ryots' বা 'বেঙ্গল রায়ত' গ্রন্থটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা। 'বেঙ্গল রায়ত' রচনার সূত্র ও গোপন কথাটি সমকালের বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তা উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে: "কাঁটাল পাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্যপ্রিয়, সুখপ্রিয়, সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় অভিপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—'Bengal Ryots.

প্রবন্ধকারের বক্তব্য থেকে পাঠক সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন যে, সঞ্জীবচন্দ্র সৌন্দর্যরসের রসিক ছিলেন এবং যখনই তাঁর সৌন্দর্যরস সম্ভোগে ব্যাঘাত এসেছে, তখনই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে বলে প্রবন্ধকার মনে করেন।

'পালামৌ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তাতে সঞ্জীবসাহিত্যের মৌল গুণটি ও আত্মিক দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে।

"পালামৌ তখন ব্যাঘ্রভল্লুকের আবাসভূমি, বন্যপ্রদেশ মাত্র। সুহৃদপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। ...আর পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল

অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। 'পালামৌ' শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সংকলিত হইয়াছে তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল।"

শুধু 'পালামৌর নয়, সমালোচক সঞ্জীবচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সমকালীন যুগের বাঙালী ইতিহাস সম্পর্কিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণালব্ধ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বৈজিকতত্ত্ব লেখকের অসামান্য সৃষ্টিপ্রতিভার সাক্ষর। সমালোচকের মতে—

"তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া 'জাল প্রতাপচাঁদ' 'পালামৌ' 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।"

পত্রিকা সম্পাদনায় সঞ্জীবচন্দ্রের অনায়সসিদ্ধ। তিনি 'ভ্রমর' পত্রিকাটি একাই পরিচালনা করতেন এবং পত্রিকাটির অধিকাংশ প্রবন্ধই সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা, প্রমাণিত সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্য তথ্যকে পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছিলেন অনেক আগেই। প্রবন্ধকার লিখেছেন—

"যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিকপত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি 'ভ্রমর' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলে। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখতেন, আর কাহার সাহায্য গ্রহণ করিতেন না।"

সম্পাদক-সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে সমকালে এই মন্তব্যটি নিশ্চয় মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই সঞ্জীবসাহিত্য প্রতিভার বিচিত্র দিকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা কালে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হিসাবে কতখানি সার্থকতা বা ব্যর্থতালাভ করেছিলেন, তা সমালোচক নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন:

"১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত; এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।...."

"কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ ইহা কখন সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগ কার্যাধ্যক্ষের কার্যের বিশৃঙ্খলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না।"

লক্ষণীয় যে, সমালোচক লেখকের প্রতি সহানুভূতিবশত কোন ক্ষেত্রেই অযথা প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করেননি, আবার বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন হয়ে বক্তব্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেননি—বরং সমালোচকের স্বচ্ছদৃষ্টির আলোয় লেখকের আত্মার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে। আদর্শ সমালোচকের মতো বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সঞ্জীবসাহিত্য-সুধা আস্বাদনে পাঠকমনে আগ্রহের সৃষ্টি করেন। লেখকের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও রচনার বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই সমালোচক সঞ্জীবসাহিত্য সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ঢিলেঢালা, সঙ্গলোভী, আমোদপ্রিয় ও সরল সহজ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকেই জানা যায় এবং বলা বাহুল্য, লেখকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার প্রভাব তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়।

চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব সাহিত্য সমালোচনা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সমকালীন লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু সঞ্জীবপ্রতিভার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুর রচনা সমকালে বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সঞ্জীব-সাহিত্য আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় পক্ষপাতহীন পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সতর্ক ছিলেন না। সমালোচক তাঁর প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা', 'পালামৌ', 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনীর'র আলোচনায় সৃষ্টিকর্মের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান অপেক্ষা আস্বাদন (appreciation) পথটি বেছে নিয়েছিলেন। কোন পুস্তকের সামগ্রিকের মূল্য নিরূপণ ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিল্পীসত্তার সাযুজ্য খুঁজেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের মৌল প্রবণতা সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর অভিমত হল: "সঞ্জীববাবু তেমন করিয়া পথে চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান, একটা গাছ দেখিবার জন্য, একটা লতা দেখিবার জন্য, একটা পাতা দেখিবার জন্য, একটা ফুল দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, প্রায়ই দাঁড়ান। কখনওবা পথ ছাড়িয়া একটু এদিকে একটু ওদিকেও যান। এইরূপে

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক করিয়া এটি সেটি দেখিতে দেখিতে যাইতে তিনি বড় ভালবাসেন"।

লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সমালোচকের অভিমত হল :

"এ প্রণালীর দোষগুণ দুই আছে। কিন্তু দোষেগুণে এই যে একটি প্রণালী, বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা এক সঞ্জীববাবুরই প্রণালী, আর কাহার নয়।"

'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'য় কাহিনীবিন্যাসে লেখকের শিল্প-চেতনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয় না। বিশেষত চরিত্র ও প্লট নির্মাণে উপন্যাসের সমূহকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে পালামৌ-র তিনি প্রশংসা করেছেন। সমালোচক মনে করেন :

"'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'তে এ দোষের পরিমাণ যতই থাকুক, পালামৌতে উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্টবোধ হয়। পালামৌ-এর ন্যায় ভ্রমণ বাংলাসাহিত্যে আর নাই।"

'পালামৌ' সৃষ্টি লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সমালোচক। গল্প-উপন্যাসের মতো পালামৌ কাহিনী বারংবার পাঠে পাঠকমনে ক্লান্তি আসে না। নতুন নতুন বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হয়—লেখকের সেই সৌন্দর্যমুগ্ধতার প্রতি সমালোচক তারিফ করে বলেছেন :

"'পালামৌ'তে যে নববিবাহিতা মেয়েটির কথা আছে—যাহার কথা অতি সামান্য হইলেও পড়িতে পড়িতে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে—বোধহয়, সঞ্জীববাবু না লিখিলে সে মেয়েটিকে আমরা পাইতাম না। এইরূপ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সঞ্জীববাবু লিখিয়া গিয়াছেন।..."

"এমন করিয়া দেখায় যে ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি স্ফূর্তি হয়, সঞ্জীববাবুতে তাহা যত দেখি, অন্য কোন বাঙ্গালা লেখকে দেখি না।"

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার ভাষা সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য অবশ্যই স্বীকার্য :

"এমনি করিয়া দেখাও যেমন সঞ্জীববাবুর ধাত, সঞ্জীববাবুর ভাষাও তেমনি সঞ্জীববাবুর ধাত। তাঁহার ন্যায় সফল ভাষা অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।"

প্রকৃতিচিত্রণে সঞ্জীবচন্দ্রের অনায়াস দক্ষতা সমালোচকের দৃষ্টি বহির্ভূত ছিল না। কিন্তু পালামৌ-গ্রন্থে কোলনারীদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখকের মানবীয় সত্তা কিভাবে প্রকৃতিসত্তার সঙ্গে একাত্মীয়তা লাভ করেছিল—তারও ইঙ্গিত দিয়াছেন সমালোচক। বিশ্বব্যাপী ভালোবাসাই প্রকৃত ধর্ম। এই বোধে সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকাশিত। সমালোচকের মতে—

"সঞ্জীববাবুর সৌন্দর্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।"

'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গ্রন্থ দুটির সঙ্গে 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা' গঠনপ্রণালীর পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গল্প দুটি প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য হল :

"এই দুটি ক্ষুদ্র গল্পে সঞ্জীববাবুর বেশ ত্বরিতগতি দেখা যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুতার পরিবর্তে আবেগ ও উদ্দামভাবও পরিলক্ষিত হয়।"

প্রবন্ধকারের মতে, "সঞ্জীববাবু পাগল পাগলী গড়িতে বড় ভালবাসিতেন।" —নায়ক বা নায়িকাকে পাগল ও পাগলিনী করে চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের বিশিষ্ট মানসিকতা লক্ষণীয়। আসল কথা, সঞ্জীবচন্দ্র পাগল-পাগলিনী চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে মনোবিকলন তত্ত্বের প্রসার ঘটাতে প্রয়াসী হন। যদিও সমালোচক এবিষয়ে কোন ব্যাখ্যা করেননি।

অনেক সময় সমালোচকের নিকট যা আশা করা যায় তা সব সময় পূর্ণ হয় না। চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীবসাহিত্য সমালোচনায় আমাদের প্রত্যাশিত আশা পূর্ণ হয়নি।

৩

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীব সমকালের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক। 'সঞ্জীবচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেভাবে সঞ্জীবসাহিত্যের মৌল গুণটি নির্ণয় করেছেন, তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কেউ এরূপ স্বচ্ছ আলোচনা করতে পারেননি। সমালোচক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ সর্বজনস্বীকৃত। ক্ষেত্রবিশেষে কবিত্বের উচ্ছ্বাস থাকলেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনেকাংশে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' সমালোচনায় সমালোচকের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অভিমত অবশ্যই স্বীকার্য। লেখকের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি শিল্পতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। লেখকের জীবনের ঘটনাবলী ও জীবনেতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর প্রতিভা কীভাবে জীবনসত্যকে আত্মস্থ করেছে, সমালোচক সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সঞ্জীবসাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন। তাছাড়া পালামৌ গ্রন্থের ঢিলেঢালা ভাব অবান্তর প্রসঙ্গ ও এলোমেলো কাঠামো প্রভৃতি ত্রুটিগুলি লেখকের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শেরই প্রতিফলন বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। লেখকের সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রতি

সমালোচকের শ্রদ্ধা থাকলেও সমালোচক ভিন্ন মত পোষণ করতেন। চন্দ্রনাথ বসু সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্যতত্ত্বের সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উক্ত সমালোচনায় কোন কোন অংশে তীব্র প্রতিবাদ করেন তাঁর 'সঞ্জীবচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'সঞ্জীবনী সুধা' প্রকাশের প্রায় দুবছর পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই অনবদ্য প্রবন্ধটি আধুনিক সাহিত্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সঞ্জীব-প্রতিভা বিচারে এই প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে একমাত্র টীকাভাষ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্যম ও ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে যে মন্তব্য পোষণ করেছেন তা হল :

"তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজে দেখাইয়াছেন তাহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে-পরিমাণে ক্ষমতা ছিল, সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।"

সমালোচক সঞ্জীবপ্রতিভার মূল-তাৎপর্য অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে পাঠককে অবহিত করিয়েছেন।

প্রবন্ধকার বলেছেন—"তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিনীপনা ছিল না। ভাল গৃহিনীপনা স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে.........তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা, ধনী কিন্তু গৃহিনী নহে।"...

'পালামৌ'র সমালোচনায় লেখকের ভালমন্দের—দুটি দিকই উদ্ভাসিত হয়েছে। সমালোচকের অভিমত হল :

" 'পালামৌ' সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু, পড়িতে পড়িতে প্রতি পদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্ন-সহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে, এবং তাহা রচয়িতারও অগোচর ছিল না।..."

'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা। বাংলাসাহিত্যে ভ্রমণসাহিত্যের সূচনা হিসাবে 'পালামৌ'র অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু বর্ণনার মধ্যে মাঝে

মাঝে যে সমস্ত প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে, সমালোচক তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধকারের মতে, সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিভাবান ও শক্তিমান লেখক কিন্তু তাঁর লেখায় পারিপাট্যের চেয়ে আলস্য ও অবহেলা বড়ো বেশী অনুভূত হয়।

সঞ্জীবচন্দ্রের সৃষ্টি যে একটি নতুন জগৎ ছিল, এবং তাঁর হৃদয়ে যে জরার রাজত্ব ছিল না, সমালোচক তা স্বীকার করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের সেই মহত্তর দিকটি প্রবন্ধকার উন্মোচন করেছেন :

"পালামৌ" ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞ বার্ধক্যের লক্ষণ আছে…কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে, সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতন সৃষ্ট জগতের মধ্যে একজোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিয়েছেন।"

পালামৌ আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। সমালোচক 'জাল প্রতাপচাঁদ'কে লেখকের বিপুল ক্ষমতার অপচয় মনে করেন। লেখক কোম্পানীর আমলে বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে পাঠকের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। লেখকের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু তাঁর শিল্পনৈপুণ্য যথাযথ রচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেনি। হয়তো লেখকের গুণে কাহিনীর বিষয়বস্তু উপন্যাসের মতো উপভোগ্য, কিন্তু পদবাচ্য নয় বলে সমালোচক কঠোর মন্তব্য করেন :

'জাল প্রতাপচাঁদ' নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান, প্রমাণ বিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে-একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র"।

কিন্তু 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, ইতিহাসবোধ ও বাঙালীপ্রীতি গল্পরসে নিষিক্ত হয়ে চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি।

যাই হোক পালামৌ গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ একটি 'রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত' বলে মনে করলেও এর মধ্যে আঙ্গিকগত ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, তা সমস্তই বিশ্লেষণ

করেছেন।

১। তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিনীপনা ছিল না।

২। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল, সে পরিমাণে উত্তম ছিল না।

৩। 'পালামৌ গ্রন্থে যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে, কিন্তু পড়তে পড়তে মনে হয় লেখক যত্নসহকারে লেখেননি।

৪। পালামৌ রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে এবং তা রচয়িতার অগোচর ছিল না।

৫। 'পালামৌ'-এর মধ্যে অনেক বক্তৃতা এসেছে যা পাশ কাটাবার যোগ্য, যাতে রসের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

৬। সঞ্জীবচন্দ্রের নতুন চিন্তা বা পর্যবেক্ষণ করবার নতুন কোন প্রণালী নেই।

৭। ঠিক যেন সেই স্তরটি 'শব্দ-কণ্ডক্টর'—এরূপ ভ্রান্ত বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা নেই।

৮। সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সায় ছিলনা।

৯। সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ কৌতূহলের সহিত দেখতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তার প্রধান অংশগুলি বেছে নিয়ে চিত্রকে পরিস্ফুট করতেন।

১০। ভাবুকের মতো সকল জিনিষের মধ্যে তার নিজের হৃদয়াংশ যোগ করে দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের দুয়েকটি বর্ণনাভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ' সমালোচনা ঠিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলে মনে হয় না, সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'র সাহিত্য মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পালামৌ-সমালোচনা বিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব সাহিত্য সমালোচনার আলোচনা-মাত্র। তবে রবীন্দ্রনাথের কথা সকলেই স্বীকার করবেন—"তাহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিলনা, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।"

কিন্তু 'পালামৌ'-এর আগে যেসমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বিশেষত প্রবন্ধ জাতীয়, তা নীরস তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ; পালামৌর মত মধুরতম রচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথ এসম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা করেননি।

বালকের ন্যায় সঞ্জীবের কৌতূহল ছিল,—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কিন্তু তিনি বালকের ন্যায় সরল ও সৎ ছিলেন, তাঁর মনে কোন খাদ ছিল না এবং সেই নিখাদ হৃদয় সংসারে বা সাহিত্যে তেমন কাজে লাগল না। কিন্তু গ্রন্থের পাতায় পাতায় সততার যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তা খুবই দুর্লভ।

সঞ্জীবের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার ফসল 'পালামৌ'। রসোত্তীর্ণ অথচ সেই স্বতন্ত্র রসের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সঞ্জীব-সমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমূল্য মন্তব্য স্মর্তব্য বলে মনে করি: "রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রসঙ্গেই বলি, সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য সুগৃহিনীর প্রয়োজন যে সর্বাধিক তাতে সন্দেহ নেই। ঘরের গৃহিনী না থাকলে গৃহও অরণ্য হয়ে ওঠে। ভালো 'গৃহিনীপনায়' স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে।"—রবীন্দ্রনাথের একথা অতি সত্য। কিন্তু গৃহিনীতে সংসার সুষ্ঠুভাবে চললেও 'মর্মের গৃহিনী না হলে হিসাবী সংসারও নীরস ও আনন্দহীন হয়ে পড়ে। যেখানে 'গৃহিনী-সচিব-সখী' এক হয়ে যায় সেখানে গৃহস্বামী পূণ্যবান সন্দেহ নেই। সঞ্জীব-চন্দ্রের 'পালামৌ'-তে স্থানে স্থানে গৃহলক্ষ্মীর করস্পর্শের কিছু ঘাটতি থাকলেও এ বর্ণনার সর্বত্র প্রেয়সীর প্রেমমাধুর্য উপভোগ করা যায়। সেটাই পাঠকের পরম লাভ।" (সঞ্জীব রচনাবলী—ভূমিকা)

বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সমকালে আরো কেউ কেউ সঞ্জীব সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি নামমাত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় কুমার সরকার, নবীনচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৪

সঞ্জীবসাহিত্য সম্পর্কে আধুনিক কালও নীরব নয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় কবি কালিদাস রায়, ডঃ সুকুমার সেন, বনফুল, সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রমুখ সমালোচক-গণ সঞ্জীব-প্রতিভার মূল্য নির্ধারণে যে অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৌলিকতা ও বাংলা সাহিত্যে স্থান

ইংরাজ রাজত্বে ভারতীয় সমাজ জীবনে যখন চলেছে ভাঙাগড়ার পালা, তখনই সঞ্জীবচন্দ্রের আবির্ভাব। একদিকে সমাজসংকটের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের তিরোভাব, অন্যদিকে নতুন একটি যুগের সূচনা। জীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলি যদিও দ্রুত অপসৃয়মান কিন্তু সমাজজীবনে নতুন কোন মূল্যবোধ তখনও জমাট বাঁধতে পারে নি। সেই টানাপোড়েনের যুগে সনাতন ভাবধারা ও নতুন চিন্তাধারার সংঘাতে ব্যক্তিসত্তা ও সংস্কৃতির রূপান্তর সূচিত হয়। সমকালীন ভারতের নবতর সমাজবিন্যাস ও ব্যক্তিজীবনে তার প্রতিক্রিয়া সঞ্জীবপ্রতিভায় প্রতিফলিত হয়। সঞ্জীবসাহিত্যে যেমন সমকালের প্রভাব পরিলক্ষিত, তেমনি পূর্ববর্তী কালের ধারা ও ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত হয় ভবিষ্যতের দিকে। তাঁর সাহিত্যে শুধুমাত্র সমকালীন যুগের স্বধর্মই বিদ্যমান নয়—ভবিষ্যতের স্বরূপও উৎসারিত।

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন কাহিনী থেকে কয়েকটি উপাদান লক্ষ্য করা যায় তাঁর পারিপাট্যহীন বিড়ম্বিত জীবনযাত্রা ও দুঃখকষ্টপূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত: তাঁর সমবেদনাবোধ ও পরোপচিকীর্ষা, তৃতীয়ত: সনাতন ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও আদর্শবাদ। একদিকে মানুষ, প্রকৃতি, পশুপক্ষীর প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ অপরদিকে সাংসারিক অভাব অনটন ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের উপকরণ। আবার সমকালীন যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান, তাঁর দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল; অধিকন্তু প্রচলিত সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী সঞ্জীবচন্দ্র নীতিধর্মবোধের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ধর্মীয় সত্যের সঙ্গে সাহিত্য সত্যের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রয়াসী হন। তিনি কর্মময় জীবনের ভিতর দিয়ে তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এছাড়াও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সঞ্জীবচন্দ্র ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনাকে জীবনীর সঙ্গে মিশিয়ে দেখলে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে ব্যক্তি-সঞ্জীবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে। তাঁর সমগ্র সাহিত্যে, বিশেষত প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে সংস্কারমুক্ত মনন ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাই তাঁকে বাংলাসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী আসন দিয়েছে।

সঞ্জীবসাহিত্যে লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি, বর্ণনাক্ষমতা, হাস্যরস, কল্পনা-প্রবণতা ও সৌন্দর্যদৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অনায়াস স্বীকার্য। শুধুমাত্র 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনীতেই সঞ্জীবচন্দ্রের কল্পনাশক্তি ও সৌন্দর্যদৃষ্টি প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠেনি, তাঁর সুদূরপ্রসারী কল্পনার বিস্তার লাভ ঘটেছে সমগ্র সাহিত্যে। তবে, লেখকের কল্পনার জগৎ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। একটি ফুল, লতা, পাখি, মানব-শিশু ও ছাগশিশু, যুবতীর ভ্রূ, কোকিলের ডাক ও ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্যে তিনি যে সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে তাঁর কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্য অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁর সৌন্দর্যচেতনা সম্ভবত বা সর্ব্বে-শ্বরবাদ থেকে উৎসারিত। বিশ্ব লীলা-নিকেতনে লেখকের নিত্য যাতায়াত—, লেখকের প্রাণে নিখিল বিশ্বের লীলা চলে—"তাই যুতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও নেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ; সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ।" আবার যুবতীর ভ্রূ যেন—"ঊর্ধ্ব নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষবিস্তার করিয়া ভাসিতেছে"—লেখকের এরূপ কত উক্তি পাঠকের চিত্তে কল্পনালোকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আবার 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'য় মাতৃস্নেহ ও শিশুচরিত্রাঙ্কনে, প্রকৃতিচিত্র ও নৈসর্গিকতার বর্ণনায় লেখকের তুলির নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম', 'পরকাল' ও 'গৃহসন্ন্যাস' প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলিতে সঞ্জীবচন্দ্রের ধর্মবোধ প্রকাশিত হলেও আসলে তাঁর কল্পনাশক্তির বিকাশলাভ ঘটেছে। সঞ্জীব মনে করতেন যে ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তু মাত্রই সুন্দর। তাই 'পরকাল' প্রবন্ধে তিনি পরকাল-বাদ নিয়ে অত্যুৎসাহ দেখান নি। মানবসেবাই প্রকৃত ধর্ম, বিশ্বব্যাপী সুন্দর ও মঙ্গলকে দেখেছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রও সমগ্র জগৎ-সংসারের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অনন্ত ও ও অসীম সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

প্রকৃতির দৃশ্যবর্ণনায় সমকালীন লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের অনন্যতা অনস্বীকার্য। মনোধর্মের দিক থেকে সঞ্জীবচন্দ্র এতই স্বতন্ত্র যে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তাঁর এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গী ও রচনারীতির স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে কালজয়ী করেছে। 'পালামৌ'র অবিস্মরণীয় পঙক্তিগুলি সৌন্দর্যবোধে পাঠকের হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে:—পর্বতের উপর 'মেষদেহের কুঞ্চিত লোমরাজির ন্যায় অরণ্যানি', 'মুখের নিকট সুন্দর সুন্দর নখর সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া' বাঘের নিদ্রা, 'সহস্র সহস্র মাছি ও মৌমাছির গুঞ্জরণ'—ইত্যাদি ইত্যাদি। জাগতিক সত্তামাত্রই

তাঁর কাছে—'all existing things are sacred' অর্থাৎ বস্তুমাত্রই সুন্দর ও পবিত্র। সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে একটি মানব-শিশু যেমন সুন্দর, ছাগশিশুও অনুরূপ সুন্দর। 'ভূতের সংসার' ও 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধদুটি রচনায় লেখকের উদ্ভাবনী শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জীবচন্দ্র রূপকের আবরণে সমকালীন সমাজের বাঙালী জাতির অসঙ্গত আচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন। ভূতের কাহিনী অবতারণা করে চমৎকারভাবে মনুষ্যপ্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে রূপদান করেছেন। 'গৃহসন্ন্যাস' প্রবন্ধটি তাঁর নিজস্ব কল্পনাশক্তির অসামান্য ফসল। তিনি মনে করেন—"যে স্বাধীন নিশ্চয় সে সন্ন্যাসী।"

সঞ্জীবচন্দ্র সমকালীন যুগের বাল্যবিবাহ, সৎকার, নারীস্বাতন্ত্র্য, প্রণয়, সতীত্ব, কৌলিন্যপ্রথা, বিধবা বিবাহ ও যৌথ পরিবার প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়গুলি তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'য় বিবাহিতা নারীর প্রেমিকের জন্য স্বামীত্যাগ ও পুনঃপ্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ইংরাজ ভাবপ্রসূত। বলা বাহুল্য প্রণয়ের সঙ্গে সতীত্বের সম্পর্ক গভীর বলেই সঞ্জীবচন্দ্র ধর্মনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবোধকে অবলম্বন করেই স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার উদ্দীপন ঘটে। 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে লেখকের হিন্দুত্ববোধ পরিস্ফুট হয়েছে। বাঙালী জাতিকে অতীত-ঐশ্বর্যে উদ্বুদ্ধ করতে সম্ভবত লেখক সমকালীন ঘটনার সূত্র ধরে, ইতিহাস ও কল্পনার পথ ধরে 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থটি রচনা করেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে তাঁর ধর্মবোধ উৎসারিত—"ধর্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম মিথ্যা।"

স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতিই হল তাঁর রচনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শুধু দেখার চোখই নয়—সঞ্জীবচন্দ্র শিল্পীও বটে। যা দেখেছেন পাঠককে তা আরো চমৎকার করে দেখিয়েছেন। তাঁর হৃদয়ের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ভাষারীতিকে এক অপূর্ব প্রসাদগুণে মণ্ডিত করেছে। সমকালীন যুগে তাঁর মতো এমন সহজ-স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ ভাষারীতির অধিকারী কেউ ছিলেন বলে মনে হয়না। ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যঙ্গ-রসিকতা অবিস্মরণীয়। তাঁর সহজ সরল ও আত্মভোলা ব্যক্তিত্ব তাঁর গদ্যে একটি "বিশেষ বাক্‌ভঙ্গী সৃষ্টি করেছে, যার তুলনা দুর্লভ। অন্তত একটি কারণে সঞ্জীবচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তা হলো তাঁর ভাষা। সে ভাষায় তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন তার মূল্যও

অনস্বীকার্য। তাঁর ভাষারীতি প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত, প্রাণবন্ত, ও রঙ্গরসিকতাপূর্ণ; এমনকি সংলাপের ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি এবং মুদ্রাদোষগুলিও পরিত্যক্ত নয় বলেই তাঁর ভাষা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বলাভ করেছে। তিনি কাব্য রচনা করেননি ঠিকই, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা কাব্যমণ্ডিত। খোলামেলা বৈঠকী রসিকতার প্রাচুর্য তাঁর সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্ঘাটিত করেছে। ভাষা যে তাঁর হৃদয়ের দর্পণ, তা উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়—

১. "যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক-একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।" (পালামৌ)

পক্ষান্তরে 'মাধবীলতা' উপন্যাসে পিতম চরিত্রের সংলাপে সঞ্জীব-ব্যক্তিত্বের আলাপচারী ভাষা লক্ষণীয়—"মালা গাঁথা বড় ভাল, মনস্থির করিবার এমন উপায় আর নাই, মাথা নামাইলে জগতের আর কিছু দেখা যায় না, পুষ্পের গন্ধ ভিন্ন আর কোন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। তখন দেহের সকল কপাট বন্ধ, কেবল মন খোলা, মনকেও তখন একা পাওয়া যায়। তাহাতেই যুবতী বেটীরা মালা গাঁথে। যোগীর ধ্যান আর যুবতীর মালা গাঁথা একই জিনিষ।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা ছোটো কোন নদীর মতো হাস্যরসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হয়ে যায়, যে হাস্যরস লেখকের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ প্রসন্নতা থেকে উৎসারিত। ইংরাজীতে যাকে Sweetness and light বলা হয়—চিত্তের সেই শান্ত, সহজ ও প্রশান্তিই সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। 'কণ্ঠমালা'র নায়ক বিনোদ মন্তব্য করে—"ভারতচন্দ্র গাঁজাখোর ছিলেন, তাই লেখক প্রেমের বীজ করেছে", কিংবা 'পর্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটি কালীয়দমনের কালীয়, কাজেই যে পর্বতের উপর কালীয় উঠিয়াছে, সে পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে, ইহার আর আশ্চর্য কি?" (পালামৌ)-প্রভৃতি এমন প্রচুর হাস্যরসের দৃষ্টান্ত তার সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উন্নত হাস্য-পরিহাসের প্রাচুর্য, তির্যক মন্তব্যের ছড়াছড়িতে তাঁর পরিবেশিত হাস্যরস বাংলাসাহিত্যের সম্পদরূপে চিহ্নিত।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের বীজ প্রথম সূচিত হয় 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও

'দামিনী, গল্পে। 'বৈজিকতত্ত্ব' লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তার মৌলিক ফসল। বিজ্ঞান ও জীবন একই সূত্রে সম্পৃক্ত বলে সঞ্জীবচন্দ্র মনে করতেন। বৈজিকতত্ত্বে তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়েছে। যদিও তিনি উপন্যাস রচনায় উপন্যাসের কোন টেকনিক ব্যবহার করেননি। কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক—উপন্যাস রচনায় কলাকৌশল তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল, কিন্তু কলাকৌশল বর্জিত বিষয়-বৈচিত্র্যকে তিনি অনেক সময় মর্মের গভীরে প্রবেশ করাতে জানতেন। বাস্তবিক, তাঁর কৌতূহলী মন বিষয়ের মর্যাদাকে কখনো লঘু করে দেখেনি। নব্য ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য সমালোচনা ও ভারতীয় দর্শন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের উপরই তাঁর সৃজনশীল মনের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সঞ্জীবের রচনাবৈচিত্র কম নয়। ইংরাজীতে লেখা 'বেঙ্গল রায়ত' তাঁর শ্রমনিষ্ঠ গবেষণালব্ধ ফসল। সমকালীন যুগে বিষয়নিষ্ঠা ও মননশীলতা ছিল প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় তাঁর বক্তব্য রচনারীতির লাবণ্য ও রমনীয়তায় সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। শিল্পীর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে সমকালীন সমাজ ও জীবন সত্যের রূপায়ণে সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সত্যদৃষ্টি ও রসদৃষ্টির যুগল সমন্বয়ে সৃষ্ট তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ।

সঞ্জীবচন্দ্র জীবনপঞ্জী

১৮৩৪ (১৭৫৬ শকাব্দ, বৈশাখ, ১২৪১ বঙ্গাব্দ) জন্ম।

জন্মস্থান : ২৪ পরগণার কাঁটালপাড়া গ্রাম। বর্তমান নৈহাটি।

পরিচয় : পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা—দুর্গাদেবী। যাদবচন্দ্র[১] সংস্কৃতিসম্পন্ন স্থিতধী পুরুষ ছিলেন। অল্পবয়সে উড়িষ্যার নিমকমহলে দারোগার কাজে যোগদান করেন ও পরে ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিজের চেষ্টায় উন্নীত হয়ে মেদিনীপুরে বদলী হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭। তাঁর চার পুত্র। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর মধ্যম পুত্র, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী লিখতে গিয়ে বলেন—"অবসায়ী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল, হুগলীজেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।"[২] সেই কাঁটালপাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি ও তিনি সেই সম্রান্ত বংশীয় রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র।

১৮৩৮ (১২৪৫, আষাঢ়) সাহিত্যসম্রাট অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।

১৮৩৮ ? সততার জন্যে পিতা যাদবচন্দ্রের ডেপুটি কালেক্টারের পদে উন্নীত ও মেদিনীপুরে বদলী হন।

১৮৩৯ কাঁটালপাড়া গ্রামের পাঠশালায় গুরুমশায়ের দ্বারা সঞ্জীবচন্দ্রের শিক্ষা শুরু।

১৮৩২ ? পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরের স্কুলে সঞ্জীবচন্দ্র ভর্তি হন।

১৮৪৩ সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কলেজে প্রেরণ। ৮।১০ মাস কাল গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক রামপ্রাণ সরকারের[৩] হস্তে শিক্ষার জন্য সমর্পণ।

১৮৪৪ পুনরায় সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মেদিনীপুরে গমন। ইংরেজি স্কুলে পাঠ।

Junior Scholarship পর্যন্ত পড়াশুনা। তিন-চার বছর পড়াশুনা করেন।

১৮৪৬ ১২ বছর বয়সে হালিসহরে বিবাহ হয়। পাত্রীর নাম নবকুমারী।

১৮৪৮-৫৫ ? আবার কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাগমন। হুগলী কলেজে ভর্তি হন। গ্রামে সংসর্গদোষে পড়াশুনা নষ্ট। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ তাঁকে ব্যারাকপুরে District Government স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি (এখনকার দশম শ্রেণী) করেন।[৪] অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেননি। আর সঞ্জীবচন্দ্র স্কুলে যান না। গৃহেই ইংরেজি সাহিত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

১৮৫৬-৫৭ পিতা যাদবচন্দ্র এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্ধমানে কমিশনের অফিসে একটি কেরানীর চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন। কেরানীর চাকরী ছেড়ে Law class-এ ভর্তি হন বঙ্কিমের পরামর্শ মত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও 'ল ক্লাসে' ভর্তি হন।[৫]

১৮৫৮ দু'বছর আইন ক্লাস করে পরীক্ষা দেন, কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারেননি।

১৮৫৯ এই সময় কাঁটালপাড়ায় পুষ্পোদ্যান রচনায় নিমগ্ন হন। 'দশ-আইন' বিল এই সময়েই গৃহীত হয়।

১৮৬০ উইলসন সাহেব এই সময় Income Tax বসিয়েছেন। জেলায় জেলায় আসেসর (assessor) নিয়োগ করা হচ্ছে।

১৮৬১ পিতা যাদবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর জাহানাবাদে[৬] (বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগে) আসেসরের[৭] কাজে নিযুক্ত হন।

১৮৬২ এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র জাহানাবাদে আসেসর[৮] পদে আসীন ছিলেন।

১৮৬৩ আসেসর পদ উঠে যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরী যায়। মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর সাধের পুষ্পোদ্যান ভেঙে দেন এবং পিতৃদেব কর্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অপূর্ণতার দুঃখে পূর্ণতার উন্মেষ ঘটে। প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি 'Bengal Ryots' নামে বিখ্যাত আইন পুস্তকখানি রচনার দুঃসাহসিক কাজে হাত লাগান।

১৮৬৪ এপ্রিল মাসে সঞ্জীবচন্দ্রের বিখ্যাত 'Bengal Ryots—Their Rights and Liabilities'.[৯] (Being An Elementary treatise on the Law of Landlord and Tenant) বইখানি

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বইখানির প্রকাশক : ডি. রোজারিও এ্যাণ্ড কোঃ, ৮ ট্র্যাংক স্কোয়ার কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৮৬৪ সেপ্টেম্বর : গ্রন্থখানি পড়ে তখনকার লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি 'ম্যাজিষ্ট্রেট পদ' উপহার দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরে এইসময়ে তিনি Deputy পদে অলংকৃত হন।

১৮৬৫ কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায় ও সাহিত্যসাধনায় অনুরাগী হন। যাদবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ী সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণচন্দ্রকে উইল করে দেন।

১৮৬৬ নদীয়া থেকে ছোটনাগপুরে (পালামৌ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বদলী হন। বেশীদিন থাকতে পারেননি, বিনা ছুটিতে চলে আসেন। 'পালামৌ' যাত্রার স্মৃতি তাঁকে অমর করেছে। সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসখানি উৎসর্গ করেন।

১৮৬৭ যশোরে Deputy Magistrate হিসাবে কাজে যোগদান করেন। সপরিবারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আলিপুরে বদলী হন। খুবই টানাপোড়েন চলে।

১৮৬৮ আলিপুর থেকে পাবনায় আবার বদলী হন। এই বছরেই বিখ্যাত 'District Towns' Act' পাশ হয়। রাস্তার নামকরণ সংক্রান্ত সভায় সঞ্জীবচন্দ্র রসিকতা করায় জজসাহেব ক্ষুব্ধ হন। জজ সাহেবের প্রচ্ছন্নপ্রচেষ্টার ফলে সঞ্জীবচন্দ্র Deputy Magistrate-এর চাকরী রাখার পরীক্ষায় কৃতকার্য হননি। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের[১০] চাকরী যায় ৫ই জুলাই।

১৮৬৯ এই সময় সেন্‌সসের জন্য লোক নিয়োগ হয়। সেন্‌সসের জন্য নিযুক্ত প্রায় একহাজার কেরানীর কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ১৮ই অক্‌টোবর সঞ্জীবচন্দ্র 'Officiating Sub-Registrar'[১১] নিযুক্ত হন বারাসতে।

১৮৬৯ 'বঙ্কিম জীবনী' রচয়িতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণের পুত্র শচীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৭০ সঞ্জীবচন্দ্রের মাতা দুর্গাদেবীর পরলোকগমন। ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে ঐ Special Sub-Registrar-এর স্থায়ীপদে নিয়োগ করা হয়। বাঙলা সরকারের কার্যরত সচিব এইচ. এস. বিভন সাহেব[১২] তাঁকে

appointment দেন উক্ত পদে। ১৯শে জানুয়ারী বড়লাটের কাছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে পুনর্বহালের জন্য আবেদন করেন।

১৮৭১ জুন পর্যন্ত তিনি বারাসতে ছিলেন। ১লা জুলাই বারাসত থেকে হুগলীতে বদলী হন।[১৩] কাঁটালপাড়ায় বসবাস করতেন। সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন।

১৮৭২ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯ বৈশাখ) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়িতে 'বঙ্গদর্শন প্রেস' স্থাপন করেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকা উক্ত প্রেস থেকেই মুদ্রিত হতে থাকে। সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা প্রবন্ধটির প্রথমাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ 'বঙ্গদর্শন'-এ (১২৮০) প্রকাশিত হয়। সঞ্জীব ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়।

১৮৭৪ সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর' (১২৮১ বৈশাখ) মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 'ভ্রমর'-এ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাসগুলি এই সময়েই প্রকাশিত হয়। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'দামিনী', 'কণ্ঠমালা' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসগুলি ও 'সৎকার', 'স্ত্রীজাতি-বন্দনা', 'একঘরে', 'ভারত-ভাণ্ডারি', 'বাহুবল', 'দুর্গাপূজা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৫ সঞ্জীব সম্পাদিত 'ভ্রমর' (১২৮২-র বৈশাখ-আষাঢ়)-এর ৩টি সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। 'ভ্রমর'-এর তিনমাসের সংখ্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের 'ভ্রমরের আত্মকথা,' 'যাত্রা', 'কীর্তন', প্রভৃতি লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। 'যাত্রা সমালোচনা,[১৪] প্রবন্ধ পুস্তিকাটি পৃঃ ৩৬, ১০ই জুলাই প্রকাশিত হয়।

১৮৭৬ বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১২৮৩) বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৭৭ (১২৮৪, বৈশাখ) সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (২০ জানুয়ারী) পৃঃ ৩১, পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। কণ্ঠমালা পৃঃ ১৮৪ (৯ই সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়।

'বৈজ্ঞিকতত্ত্ব' প্রবন্ধখানির ১ম পর্ব বঙ্গদর্শন-এ (অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয়।

১৮৭৮ সঞ্জীব সম্পাদিত 'ভ্রমর' নতুন পর্যায়ে ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশিত

হয়। এই সময়েই তিনি 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন-এ লেখেন। 'বৃত্রসংহারে'র (২য় খণ্ড) সমালোচনা প্রকাশ করেন। 'বৈজ্ঞিকতত্ত্ব' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায়। বর্ধমানে Special Sub-Registrar ছিলেন, বদলী হন। এখানে বর্ধমানের Registrar দিয়ে পুনরায় ডেপুটি[১৫] পদে পুনর্বহালের জন্য ডিপার্ট-মেন্টের ইনসপেক্টার জেনারেলকে দিয়ে একটি চিঠি লেখান নভেম্বর।

১৮৭৯ এই সময়েই তিনি বর্ধমানের Special Sub-Registrar ছিলেন। ১২৮৬ সালের বঙ্গদর্শন সঞ্জীবচন্দ্র প্রকাশ করতে পারেননি।

১৮৮০ সঞ্জীবচন্দ্র যশোরে আবার বদলী হন ঐ একই চাকরী নিয়ে। বঙ্গদর্শনে 'ভবিষ্যৎ হিন্দু ধর্ম' (প্রবন্ধ), 'মাধবীলতা' (উপন্যাস), 'পালামৌ' (ভ্রমণকাহিনী) ও 'চাকরীর পরীক্ষা', 'গৃহসন্ন্যাস' প্রভৃতি রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। যশোরে থাকাকালীন বার্টন নামে একজন ইংরেজ কালেক্টার নিযুক্ত হন। তিনি Native officer দের অপদস্থ করতেন। অপমানের ভয়ে তিনি বাড়ী চলে আসেন।

১৮৮০ সঞ্জীবচন্দ্র যশোরের একজন দক্ষ Sub-Registrar[১৬] ছিলেন।

১৮৮১ জানুয়ারী মাসে পিতা যাদবচন্দ্র ৮৭ বছর বয়সে মারা যান। ১৫ই এপ্রিল সঞ্জীবচন্দ্র Special Sub-Registrar[১৭]পদ পরিত্যাগ করেন। 'সংকার' (পৃঃ ১২ প্রবন্ধ) পুস্তিকাটি 'বঙ্গদর্শন' প্রেস, কাঁটালপাড়া থেকে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এ 'মাধবীলতা', 'পালামৌ' (ভ্রমণকাহিনী), 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রকাশিত হয়।

১৮৮২ সঞ্জীবচন্দ্রের বাল্যবিবাহ' (পৃঃ ১২, প্রবন্ধ) জনসন প্রেস, কলকাতা থেকে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে তাঁর অমর উপন্যাস—'জাল প্রতাপচাঁদ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' (সঞ্জীব সম্পাদিত) ১২৮৯-র চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়।

১৮৮৩ 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসখানি, কলকাতা থেকে রাধানাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[১৮] 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ সঞ্জীবচন্দ্র বন্ধ করে দেন। বঙ্কিমের নির্দেশে শ্রীশচন্দ্র ১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৮৪ বঙ্কিম-জামাতা 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৮৮৫ সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা' (পৃঃ ১৮৭) উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। 'প্রচার'-এ সঞ্জীবের 'পরকাল' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঋণগ্রস্ত সঞ্জীবচন্দ্র পাওনাদারের ভয়ে ভাগলপুর ও বাঁকিপুর যাত্রা করেন।

১৮৮৬ 'প্রচার'-এ 'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধটি বের হয়।

১৮৮৭ সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র নদীয়া জেলায় মেহেরপুরে পুলিশ ইনস্পেক্টরের চাকরী পান। বঙ্গদর্শনের লেখক ও সঞ্জীব-বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামদাস সেন মারা যান। সংসারে অভাব-অনটনের কারণে তিনি এলাহাবাদে সন্ন্যাস গ্রহণে মনস্থ করেন।

১৮৮৯ জ্বরবিকার রোগে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে মারা যান। ১৮ই এপ্রিল বাংলা ১২৯৬, ৫ই বৈশাখ *

নির্দেশিকা

১। পিতা যাদবচন্দ্র আত্মকথনে কৃতি পুত্রগণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—'এক্ষণে (অর্থাৎ) ১২৭৯, ১৫ বৈশাখ) আমার চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ—শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডিপুটি কালেক্টার, মধ্যম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র—ডিপুটি কালেকটার, —পরে রেজিষ্টার; তৃতীয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র—ডিপুটি কালেটর; চতুর্থ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত আছেন।" —বঙ্কিম জীবনী, পৃঃ ২২, ১৩৩৮—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২। সঞ্জীবনী সুধা (১৮৯৩)—বঙ্কিমচন্দ্র।

৩। "কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন, কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আটদশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদেনীপুরে গেলাম।" (সঞ্জীবনী সুধা—বঙ্কিমচন্দ্র)।

৪। "এই সময়ে আমাদিগের সর্বাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরী করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটি উত্তম ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন; ...

এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।"—(সঞ্জীবনী সুধা—বঙ্কিমচন্দ্র)।

৫। ১৮৫৭ খ্রীঃ বঙ্কিম এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। সেই সময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে 'Law class'-এর ছাত্র। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়ে 'Law class'-এ ভর্তি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ব্যাপারে বলেছেন—"তখন নতুন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল, তাহার 'Law class' তখন নতুন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরানীগিরীটি পরিত্যাগ করাইয়া ল-ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম।" ('সঞ্জীবনী সুধা—১৮৯৩'—বঙ্কিমচন্দ্র)।

৬। জাহানাবাদে সঞ্জীবচন্দ্র ৬০।৬১ (১৮৬০-৬১) সালে যে 'assessor'—এর কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তা 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—"৬০।৬১ (১৮৬০।৬১) সালে পিতা (রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার) যখন জাহানাবাদে যাব রেজিষ্ট্রার হইয়া গেলেন। "কিন্তু তখন তিনি 'অ্যাসেসর' ছিলেন।

৭। "তখন উইলসন সাহেব নতুন ইনকাম ট্যাক্স্ বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনে একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।"—সঞ্জীবনী সুধা (১৮৯৩) বঙ্কিমচন্দ্র।

৮। সঞ্জীবচন্দ্র এই ১৮৬১।৬২ সালে যে জাহানাবাদে assessor পদে নিযুক্ত ছিলেন, তা তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়—যাতে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর উপরওয়ালা কালেক্টর A. V. Palmer মন্তব্যগুলি লিখে রেখেছিলেন।

"entracts from the remarks made by the Collector Mr. A. V. Palmer of Hooghly on the revised abstract of the increase of the Income Tax establishment and in the annual Business statement for 1861-62,—

I strongly recommend that the native assessor Baboo Sanjib Chauder Chatterjee now entertained be continued

on his present salary or if that is impossible that he be allowed 400 Rs. pr. me seum.

Baboo Sanjib Chunder Chatterjee assessor have acquitted himself creditably

Sd A. V. Palmer
Collector

Extract from the Diary of the collector Mr, A. V. Palmer into his annual tour into the interior of the Distrsct in February, 1862—

I visited the assessor's office at Jahenabad Found he had not very much work to do, but sufficient to occupy him. His office was clear, neat and orderly".

Sd A. V. palmer, Collector

'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় এই কপিটি আজও রক্ষিত আছে।

৯। Bengal Ryot বইখানি প্রকাশিত হলে সঞ্জীবচন্দ্র কোলকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে এক কপি পাঠান। বইখানি পেয়ে প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে সচিব সঞ্জীবচন্দ্রকে অভিনন্দন পত্র লেখেন :

"The officiating Chief Justice begs to thank Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee for the copy of his book Bengal Ryots which the Baboo has been kind enough to send him".

Illegible
June 13, 1864

(ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় অভিনন্দন পত্রটি সংরক্ষিত আছে)

১০। ১৮৬৪-১৮৮৯ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের Deputy Magistrate হিসাবে চাকরীজীবনের Report

১১। Special Sub-Registrar হিসাবে তাঁর appointment letter-এর

প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হল। (ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।)

No. R/1372

From—illegible

Secretary to the Government of Bengal.

To Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee

Barasat

Fort William
the 18th Oct., 1869

Appt. Dept.

Sir

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to officiate as Special Sub-Regr. of assurances of Barasat during the absence on deputation of Baboo Uma Charan Gangooly or until further order, subject to any rules that may hereafter be passed in regard to the examination of officers of the Registration Department.

2. You are requested to report yourself in person or by letter to the Registrar General from whome you will receive further instruction.

I have the honour to be,

Sir, Your most obedient servant

১২। বাঙ্গালা সরকারের সচিব এইচ. এস. বিডন যে নিয়োগপত্রটি সঞ্জীবচন্দ্রকে ১৮৭০ সালে ৫ই ডিসেম্বর দিয়েছিলেন, তার অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হল।

No—G/369

From : H. S. Beadon Esq.

Oftg. Under-Secretary to the Government of Bengal

To Babu Sunjeeb Chunder Chatterjee

Oftg. Sub. Registrar of Barasat

Fort William

Appt. Dept. the 15th Dec. 1870

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be special Sub-Registrar of Assurances of Barasat.

I have the honour to be

Sir,

Yours most obedient Servant

H. S. Beadon

Offg. Under-Secretary to the Govere-ment of Bengal.

১৩। হুগলীতে বদলীর চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হল। চিঠিখানি ১৮৭১, ২৬শে জুন লেখা। তখন বাঙ্গালা সরকারের সচিব ছিলেন—আর. এস. উইলসন।

No/G/619

From R. H. Wilson Esq.

Oftg. Under-Secretary to the Government

To Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee

Special Sub-Registrar at Barasat

Dated Fort William

Appointment Dept. the 29th Jund, 1871

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be special Sub-Resis-trar of Hooghly, with effect from 1st July 1871.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant

Sd/R. H. Wilson

Offg. Under-Secretary to the Government
of Bengal

১৪। 'যাত্রা সমালোচনা' (বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' হইতে উদ্ধৃত), কাঁঠালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৫। Deputy Magistrate হিসাবে তার যোগ্যতার বিবরণ সহ তিনি একবার বড়লাটকে (১৮৭০, ১৯শে জানুয়ারী) একবার বাঙ্গালা সরকারের সচিবকে (১৮৭০, ২৭শে জানুয়ারী) শেষবার ডিপার্টমেণ্টের ইনস্পেকটার জেনারেল, বর্ধমানের সাহায্যে ডেপুটি পদে পুনর্বহালের আবেদন করেন। কিন্তু কোন ফল হয়না। উপরওয়ালার মন্তব্যগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :—Extract from annual reports by the Magistrate, collectors and Commissioner relating to the official character of Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee.

Mr. Gray, Magistrate, of Nuddea, in his Police Report for 1964 "A very good officer. He is painstaking and intelligent, his natural self-reliance and independence of character aught in make him a valuable Judicial officer."

Lord Ullicke Browne, Magistrate of Nuddea, Police Report for 1865—

"He is very willing and quick and it will be, send that there were no appeals from his decisions. He promises to turn out a very good officer."

Lord Ullicks Browne, Collector of Nudder, Revenue Report for 1865-1866.

"An officer of good ability and acquirements." Mr. H. L. Dampier, Commissioner of Presidency Divisioa report, same year.

"Very able".

Mr. H. L. Dimpier, Police report for 1865
(In allusion to my transfer from Nuddea)

"His loss is very much regretted in the District

Colonel Dalton, Commissioner of Chota Nagpure, Revenue Report, 1865-66.

"Zealous and intelligent officer."

Mr. T. Monro, Collector of Jessor, Reveuue Report 1867-68.

"an officer of ability and promise, intelligent and willing."

Mr. P. A Humphrey, Magistrate of Pubna Police Report for 1868

"Very intelligent, works hard and does his work satisfactionally."

Ms. P. A. Humphrey, Collector of Pubna, Revenue Report, 1868-69.

"An excellent executive officer and an efficient Deputy Collector. his decision also have been good. and he takes pains in his work".

১৬। Administration Report-এ সঞ্জীবচন্দ্রের কর্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। শুধু মাত্র যশোরে থাকাকালীন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে'র রিপোর্ট এখানে উদ্ধৃত করছি।

Extract from the Administration Report of the District of Jessore No. 1287 dated I8th May 1880.

"The Special Sub Registrar Babu Sanjeeb Chunder Chatterjee has been of the most material assistance to me, He takes a throughly intelligent interest in the work.

১৭]। সঞ্জীবচন্দ্রের পদত্যাগের তারিখ ও পদত্যাগপত্র উদ্ধৃত করা হল, যা এখনো 'বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায়' রক্ষিত আছে।

15th Aprill 1881

"From this date I am no longer in the service. My leave expired yesterday and I sent my resignation on that day." সঞ্জীবচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে ১৮৬৯ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত চাকরী করেন।

১৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থখানি পড়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই-এর একটি চিঠিতে লেখেন—

'My dear Sunjeeb Babu, I have read your very interesting account of Jal Pratap Chand with pleasure. It contains a good deal of information which is entirely new to me. As illustrative of the judicial procedure of the age—more than a hundred people clamped into jail without rhyme of reason····the book has a peculiar value independently of the other merits".

১৯। মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা'য়—'দামিনী', 'পালামৌ, 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী' সংকলিত হয়।

সঞ্জীবচন্দ্রের বংশ পরিচয়

সঞ্জীবচন্দ্রের ২৫তম উর্দ্ধতন পুরুষের ও পরবর্তী ৬-পুরুষের বংশ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল। ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর বঙ্কিম-জীবনী থেকে উর্দ্ধতন বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুলোচন

বাসুদেব

গায়ি

বারো (মতান্তরে কৃষ্ণদেব)

বরাহ

শ্রীকর অধ্বর্য্য (মতান্তরে শ্রীধর)

বহুরূপ
গাহী
অবসাথী সর্বেশ্বর
তেকড়ি
সিদ্ধেশ্বর
লক্ষ্মীধর
দিগম্বর
(শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন)
জগন্নাথ
ভগবান
অবসায়ী গঙ্গানন্দ
কৃষ্ণবল্লভ
নন্দগোপাল বা নন্দকিশোর
রামকান্ত
রামজীবন
রামহরি
শিবনারায়ণ
যাদবচন্দ্র
যাদবচন্দ্র
শ্যামাচরণ
নন্দরাণী
সঞ্জীবচন্দ্র
বঙ্কিমচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
স্ত্রী নবকুমারী
জ্যোতিষচন্দ্র
চিরঞ্জীব
অনিলসুন্দরী (কন্যা)
উর্ম্মিলাসুন্দরী
শতঞ্জীব
জীবঞ্জীবচন্দ্র

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাপঞ্জী

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে সঞ্জীবচন্দ্রের স্মরণীয় আবির্ভাব। তিনি তৎকালীন যুগের পটভূমিকায় যে সমস্ত উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তার কোন পূর্ণাঙ্গ রচনাবলীর তালিকা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। যা প্রকাশিত হয়েছে, তা আংশিক বা খণ্ডিত মাত্র। সেই যুগের সামাজিক অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনযাত্রা ও সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিচয় নিরূপণ করতে হলে তাঁর সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি একত্রিত করা জাতীয় কর্তব্য মনে করি। এই জাতীয় কর্তব্য এতদিন পর্যন্ত অবহেলিত ছিল। তাই তাঁর সমস্ত রচনাপঞ্জী অতি সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করে একত্রে সন্নিবেশিত করা হল। শুধু তাই নয়; কোন কোন পত্রিকায়, কোন কোন সাল ও মাসে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়, তারও ধারাবাহিক বিবরণ নিয়ে দেওয়া হলো।

সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী

রচনার নাম	সাময়িক পত্র	প্রকাশ	গ্রন্থ
যাত্রা	বঙ্গদর্শন	১২৭৯ পৌষ	যাত্রা সমালোচনা ১০ই জুলাই, ১৮৭৫
যাত্রা	ঐ	১২৮০ কার্ত্তিক	ঐ
ভ্রমর	ভ্রমর	১২৮১ বৈশাখ	×
রামেশ্বরের অদৃষ্ট	ঐ	১২৮১ বৈশাখ	রামেশ্বরের অদৃষ্ট ২০শে জানুয়ারী, ১৮৭৭
স্ত্রীজাতি বন্দনা	ঐ	ঐ	×
দামিনী	ঐ	১২৮১ জ্যৈষ্ঠ	সঞ্জীবনী সুধা মে, ১৮৯৩
ভারত ভাণ্ডারী	ঐ	ঐ	×

কণ্ঠমালা (১-৫)	ঐ	১২৮১ আষাঢ়	কণ্ঠমালা ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭
কণ্ঠমালা (৬-৯)	ঐ	১২৮১ শ্রাবণ	ঐ
একঘরে	ঐ	ঐ	×
ভারত ভাণ্ডারি	ঐ	ঐ	×
কণ্ঠমালা (১০ ম-১৩ শ)	ঐ	১২৮১ ভাদ্র	কণ্ঠমালা
কণ্ঠমালা (১৪শ-১৬শ)	ঐ	১২৮১ আশ্বিন	ঐ
দুর্গাপূজা	ঐ	ঐ	×
কণ্ঠমালা (১৬শ-১৯শ)	ঐ	১২৮১ কার্ত্তিক	ঐ
কণ্ঠমালা (১৯শ-২২শ)	ঐ	১২৮১ অগ্রহায়ণ	ঐ
সৎকার	ঐ	১২৮১ পৌষ	সৎকার (১৮৮১)
কণ্ঠমালা (২৩-২৪শ)	ঐ	ঐ	কণ্ঠমালা
কণ্ঠমালা (২৫শ-২৭শ)	ভ্রমর	১২৮১ মাঘ	কণ্ঠমালা
কণ্ঠমালা (২৮-৩০শ)	ঐ	১২৮১ ফাল্গুন	ঐ
বাহুবল	ঐ	ঐ	×
সৎকার	ঐ	ঐ	সৎকার
কণ্ঠমালা (৩১-৩২শ)	ঐ	১২৮১ চৈত্র	কণ্ঠমালা
ভ্রমরের আত্মকথা	ঐ	১২৮২ বৈশাখ	×
কণ্ঠমালা (৩৩-৩৫)	ঐ	ঐ	কণ্ঠমালা
যাত্রা *	ঐ	ঐ	যাত্রা সমালোচনা
কীর্তন	ঐ	১২৮২ জ্যৈষ্ঠ	×
কণ্ঠমালা (৩৩শ-৩৭শ)	ঐ	ঐ	কণ্ঠমালা
কীর্তন	ঐ	১২৮২ আষাঢ়	×
বৈজ্ঞিক তত্ত্ব	বঙ্গদর্শন	১২৮৪ অগ্রহায়ণ	×
বৈজ্ঞিক তত্ত্ব	ঐ	১২৮৪ পৌষ	×
বৈজ্ঞিক তত্ত্ব	ঐ	১২৮৪ চৈত্র	×
বৈজ্ঞিক তত্ত্ব	বঙ্গদর্শন	১১৮৫ বৈশাখ	×
বাল্যবিবাহ	ভ্রমর	১২৮৫ ভাদ্র	বাল্যবিবাহ
ভূতের সংসার	ঐ	ঐ	×
অকাতরে বিবাহ	ঐ	১২৮৫ আশ্বিন	×

আনার বল্লী	ঐ	ঐ	×
বৃত্রসংহার	বঙ্গদর্শন	১২৮৪ ফাল্গুন	×
বৈজ্ঞিক তত্ত্ব	বঙ্গদর্শন	১২৮৫ শ্রাবণ	×
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৫ কার্ত্তিক	মাধবীলতা
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৫ অগ্রহায়ণ	ঐ
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৫ মাঘ	ঐ
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৫ ফাল্গুন	ঐ
১* পদোন্নতির পন্থা	ঐ	১২৮৫ চৈত্র	×
* ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম	বঙ্গদর্শন	১২৮৭ বৈশাখ	×
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৭ আষাঢ়	মাধবীলতা
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৭ শ্রাবণ	ঐ
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৭ ভাদ্র	ঐ
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৭ কার্ত্তিক	ঐ
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৭ অগ্রহায়ণ	ঐ
* চাকুরীর পরীক্ষা	ঐ	১২৮৭ পৌষ	×
পালামৌ (১ম পরিচ্ছদ)	ঐ	ঐ	পালামৌ
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৭ মাঘ	মাধবীলতা
পালামৌ (২য় পরিচ্ছদ)	ঐ	১২৮৭ ফাল্গুন	পালামৌ
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৭ ফাল্গুন	মাধবীলতা
* গৃহসন্ন্যাস	ঐ	১২৮৭ চৈত্র	×
মাধবীলতা	ঐ	১২৮৮ বৈশাখ	মাধবীলতা
পালামৌ (৩য় পরিচ্ছেদ)	ঐ	১২৮৮ আষাঢ়	পালামৌ
পালামৌ (৪র্থ পরিচ্ছেদ)	ঐ	১২৮৮ শ্রাবণ	পালামৌ
বঙ্গদেশের পরাধীনতা	ঐ	১২৮৮ ভাদ্র	×
পালামৌ (৫ম পরিচ্ছেদ)	ঐ	১২৮৮ আশ্বিন	পালামৌ
জাল প্রতাপচাঁদ	ঐ	১২৮৯ শ্রাবণ	জাল প্রতাপচাঁদ
জাল প্রতাপচাঁদ	ঐ	১২৮৯ ভাদ্র	জাল প্রতাপচাঁদ
জাল প্রতাপচাঁদ	ঐ	১৩৮৯ আশ্বিন	
জাল প্রতাপচাঁদ	ঐ	১২৮৯ কার্ত্তিক	

পালামৌ	ঐ	১২৮৯ ফাল্গুন	পালা
পরকাল	প্রচার	১২৯২ মাঘ	×
বিবাহের ঘটকালি	ঐ	১২৯৩ অগ্রহায়ণ	×
* একটি ঘরের কথা	ঐ	১২৯৩ ফাল্গুন	×
একটি পরের কথা	ঐ	১২৯৩ ফাল্গুন	×

টীকাটিপ্পনী

১। সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ শৈশবেই জেগেছিল। এসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য স্মর্তব্য :—"বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্য রচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর' নামক পত্রে তিনি দুই-একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিত হইয়াছিল।"

২। পদোন্নতির পন্থার পাণ্ডুলিপি নৈহাটির বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

৩। "১২৯৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রচারে' 'একটি ঘরের কথা' ও একটি পরের কথা' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধ দুটিরই শেষে লেখকের নাম হিসাবে শুধু ছিল 'শ্রীস:'—এই 'স' যে সঞ্জীবচন্দ্রের নামের আদ্যক্ষর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"—গোপালচন্দ্র রায় (সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য)

॥ সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী ও সম্পাদিত পত্রিকা ॥

১। যাত্রা সমালোচনা। প্রবন্ধ (১০ই জুলাই ১৮৭৫)। পৃষ্ঠা ৭৬

২। রামেশ্বরের অদৃষ্ট। উপন্যাস। ১২৮৩ সাল (২০শে জানুয়ারী ১৮৭৭) পৃষ্ঠা ৩১

৩। কণ্ঠমালা। উপন্যাস (৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭)। পৃষ্ঠা ১৮৪

৪। সংকার। প্রবন্ধ। ইং ১৮৯১। পৃষ্ঠা ১২

৫। বাল্যবিবাহ। প্রবন্ধ। ইং ১৮৮২। পৃষ্ঠা ১২

৬। জাল প্রতাপচাঁদ। ইং ১৮৮৩। পৃষ্ঠা ১৩৮

৭। মাধবীলতা। উপন্যাস। ১২৯১ সাল (২৯শে এপ্রিল, ১৮৮৫)। পৃষ্ঠা ১৮৭

৮। দামিনী। উপন্যাস। (ইং মে, ১৮৯৩)

৯। পালামৌ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। (ফাল্গুন ১২৮৯ সাল)

১০। সঞ্জীবগ্রন্থাবলী (মাধবীলতা। কণ্ঠমালা। জাল প্রতাপচাঁদ। রামেশ্বরের অদৃষ্ট। দামিনী। পালামৌ) বসুমতী সাহিত্য মন্দির। আষাঢ় ১৮৮৩, ১ম সংস্করণ।

১১। সঞ্জীব রচনাবলী (রামেশ্বরের অদৃষ্ট, কণ্ঠমালা, জাল প্রতাপচাঁদ, মাধবীলতা, দামিনী, পালামৌ, যাত্রা, বৃত্রসংহার, বৈজ্ঞিকতত্ত্ব, সংস্কার বাল্যবিবাহ)। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রথম সংস্করণ। ১৮৮৩ (মণ্ডল বুক এ্যাণ্ড সন্স)

ইংরাজী গ্রন্থ ঃ

১। Bengal Ryots : Their Rights & Liabilities (1864)

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শনের নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়

৫ম খণ্ড ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (বৈশাখ-চৈত্র)—মোট ১২ সংখ্যা

৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৮৫ বঙ্গাব্দ (ঐ)—মোট ১২ সংখ্যা

৭ম খণ্ড ১২৮৭ বঙ্গাব্দ (ঐ)—মোট ১২ সংখ্যা

৮ম খণ্ড ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (বৈশাখ-আশ্বিন)—মোট ৬ সংখ্যা

৯ম খণ্ড ১২৮৯ বঙ্গাব্দ (বৈশাখ-চৈত্র)—মোট ১২ সংখ্যা

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভ্রমর' পত্রিকার সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয়

১ম বর্ষ ১২৮১ বঙ্গাব্দ (বৈশাখ-চৈত্র)—মোট ১২ সংখ্যা

২য় বর্ষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ (বৈশাখ-আষাঢ়)—মোট ৩ সংখ্যা

৩য় বর্ষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ (ভাদ্র-আশ্বিন)—মোট ২ সংখ্যা